# শিক্ষা-বিচিত্রা

[ দ্বিতীয় ভাগ ]

শ্রী ফণিভূষণ দে বিশ্বাস

ও

অধ্যক্ষ দাশগুপ্ত

—ঃ প্রা প্তি স্থা ন ঃ—

টিচার্স বুক স্টল

৬/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলকাতা ঃ ৯

প্রকাশক : শ্রীকমলেশ বেরা
৬/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা : ৯

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৭৪

মুদ্রণে : শ্রীবিমল বেরা
ঊষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৯ সি, বিধান সরণী
কলকাতা : ৬

# ভূমিকা

গায়ে পড়ে আলাপ করাটা ইংরেজী-সহবতে নেই। এখনও তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। নতুন কেতাবের বেলাতেও তাই। ভূমিষ্ঠ হয়েই, তার একটা ভূমিকা চায়। কেননা, পরিচয়-পত্রই তাকে সনাক্ত করে। তাই প্রকাশ মুহূর্তেই প্রকাশকের অনুরোধে এই ভূমিকা লিখতে হলো।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বদিক দিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনে কার্যকরী করে তোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ একটি কৃত্য-মুখী বিশদ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করেছেন। পাঠ্যসূচীটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকটি যেন কাজে-কল্পনায়, ভাবে-ভাবনায় একটি ভাবী প্রত্যাশার স্বপ্নে-ঘেরা। সেই ভাব-মূর্তিটিকে কর্মে রূপায়িত করে তোলার মত এক কার্যকরী পন্থা নিরূপনের জন্য আমরা নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য "শিক্ষা-বিচিত্রা" রচনা করেছি। পুস্তকখানিতে 'কর্মশিক্ষা', 'শারীর শিক্ষা', 'সমাজসেবা' এবং বিদ্যালয়ের প্রাত্যাহিক কৃত্যাদির বিষয়ও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এক কথায় সমগ্র কর্ম-শিক্ষার যাবতীয় তথ্য কৃত্যের ১০০ নম্বরের উত্তর করা যাবে এই বইখানি থেকে। অথাৎ Complcte work Education-এর সম্যক আলোচনা করা হয়েছে এখানে।

কৃত্যমুখী শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে ভাবী-শিক্ষণ-সম্ভাবনার যে বীজ নিহিত আছে, তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ আছে কেতাবটির মধ্যে। কি পরিমাণ শ্রম ও যত্নে পুস্তকখানি লেখা হয়েছে, একবার বইটার পাতা উল্টে গেলেই তা' টের পাওয়া যাবে।

শিক্ষা-বিচিত্রা বইটিকে সমস্ত দিক থেকে যতখানি সম্ভব পূর্ণাঙ্গ করে তালো হয়েছে। ফলে এই পুস্তকখানি থেকে শিক্ষকেরাও অবগত হবেন এই কৃত্যমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাটিকে। শিক্ষার্থীরাও অনুসরণ করতে পারবে বিশেষ করে এই কর্মকেন্দ্রিক ধারাটিকে। সেটাই তাদের পক্ষে সব চাইতে বেশী প্রয়োজনীয়।

বড্ড তাড়া হুড়ার মধ্যে গ্রন্থটি লেখা হ'লো। তাই সাধ থাকলেও দশম শ্রেণীর অংশটুকু লেখা হয়ে উঠলো না। খেলাধুলার অধ্যায়ে দশম শ্রেণীর কিয়দংশ বাকী থেকে গেল। এই গ্রন্থের সমাজসেবা, বিদ্যালয়ের কৃত্যালি, উচ্চাঙ্গ নৃত্য, লোকনৃত্য ও সংগীতের অধ্যায়গুলি রচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অনুজপ্রতিম শিশু সাহিত্যিক শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম ও শ্রীদেবাশীষ গৌতম। তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

শেষ কথা, বইখানি যাদের জন্য লেখা, তাদের কাজে লাগলে, আর যাঁরা তালিম দেবেন, তাঁদের সকলের সাহায্যে এলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

পরের সংস্করণে পুস্তকটিকে ত্রুটি মুক্ত করে সর্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা নেওয়া হবে। আর একটা কথা, আমাদের পরিবেশিত এই তথ্য ও তত্ত্বাদির প্রয়োগাদি ব্যাপারে যদি কোন বিষয়ে কারুর মনে এতটুকু খট্‌কা লাগে, অবিলম্বে তা' জানালে, পরবর্তী সংস্করণে নিশ্চয় তার সংস্কার করা হ'বে। সেই সঙ্গে তাঁদের নামোল্লেখও করবো।

ইতি
বিনীত
লেখকদ্বয়

# সূচীপত্র

## কর্ম্মশিক্ষা

## শারীর-শিক্ষা



## জাতীয় সংগীত, শিবির, নৃত্য ও ব্রতচারী



## সমাজ-সেবা



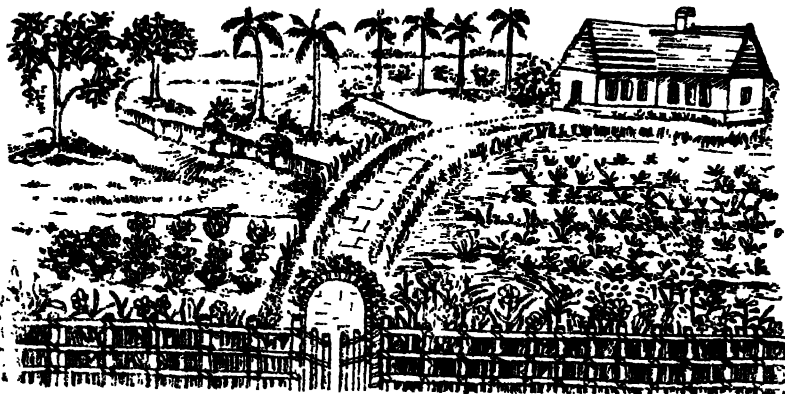
* শহরাঞ্চলের জন্য।

## বিদ্যালয়ের কৃত্যালী

## বিদ্যালয়ের কৃষিখামার







# শিক্ষা বিচিত্রা

## প্রথম অধ্যায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

## বিদ্যালয়ের কৃষিখামার

**ভূমিকা:** কৃষি-খামার-ব্যবস্থাপনা সভ্যতার সমবয়সী। কবে কিভাবে যে, কৃষি-খামার পরিচালন ব্যবস্থা এমন একটা শিল্পরূপ নিয়েছে, তার ইতিহাস জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে, অনেক ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতাই—যাদের হলকর্ষণ ও পশুপালন পারদর্শিতা ছিল—এই ব্যবস্থাপনার নেপথ্যে কাজ করেছে। এই সব পারদর্শিতার অভিজ্ঞতা এক শতাব্দীর মানুষ পূর্ববর্তী কালের মানুষের কাছ থেকে পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষি-উৎপাদন, পশুপালন এবং সর্বোপরি সংরক্ষণ ব্যবস্থা একত্রীভূত হয়ে কৃষি-খামারের এই বাহ্যিক রূপ নিয়েছে। সুপ্রাচীন ভারতবর্ষে গো-ধন সম্পদরূপে বিবেচিত হতো। রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, রাজর্ষি জনক স্বহস্তে হলকর্ষণ করেছিলেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তখন কৃষি-কর্ম লক্ষ্মীরূপে কত মর্যাদা লাভ করেছিল। ওল্ড টেষ্টামেন্ট্ বাইবেল থেকে জানা যায় যে, জ্যাকব তার ভাবী শ্বশুরের মেষপাল রক্ষণাবেক্ষণের কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এর পরবর্তী যুগে খামার মালিকদের মধ্যে রোমের ক্যাটোই ছিলেন সমধিক বিচক্ষণ। এগুলি অবশ্য ইতিহাস সম্মত তথ্য নয়, পৌরাণিক উপকথা মাত্র। প্রথম বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-খামার গড়ে উঠে ১৯১০ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে।

**ভূমি গবেষণাগার:** কৃষি-খামার-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, বৃত্তিমূলক-কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে খামার-শিল্পের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। তাঁরা মনে করেন যে, কৃষিবৃত্তিকে ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হ'লে শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে কাজ করতে হ'বে। মাটির স্পর্শ না হ'লে কৃষিগত অভিজ্ঞতা খাঁটি হয় না। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এ সুযোগ করে দিতে পারে বিদ্যালয়ের কৃষি-খামার। ব্যাপক

অর্থে কৃষি-খামার বলতে কৃষিবিশেষজ্ঞরা ভূমি-গবেষণার বা স্কুলফার্মের নামোল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, The land laboratory or school farm offers an opportunity to provide or supplement such experience. অর্থাৎ কৃষি-কর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরিপূরক জ্ঞান-অভিজ্ঞতা দিতে পারে ভূমি-গবেষণাগার বা বিদ্যালয়ের কৃষি-খামারগুলি।

বস্তুতঃপক্ষে, **ক্ষেত ও খামারের** মধ্যে যে পার্থক্য, সেটা হলো আয়তন ও আকারগত। একটি ভূমি-গবেষণাগার হয় তো এক ফালি জমি নিয়েই গড়ে উঠতে পারে। পক্ষান্তরে বিদ্যালয়ের কৃষি-খামারের আয়তন হ'বে সেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজের প্রয়োজনের আনুপাতিক। আর এই আনুপাতিক হারে ছোট ভূমি-গবেষণাগারের চেয়ে অনেক গুণ বেশী, শ্রম-যন্ত্রপাতি এবং কৃষি-হাতিয়ারের প্রয়োজন হ'বে যে কোন বিদ্যালয়ের কৃষি-খামারের জন্য। তা'ছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি-খামারের চৌহদ্দি কেবল হলকর্ষণেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে আছে আনুষঙ্গিক পশুপালন, উদ্যানকর্ষণ-বিদ্যা ( Horticulture ), শব্জী চাষ আর মুরগী ও মৌমাছি পালন প্রভৃতি। সেই সঙ্গে থাকবে উন্নত চাষাবাদের বৈজ্ঞানিক পন্থা ও যন্ত্রের ব্যবস্থা। এই সঙ্গে থাকবে **কৃষি সমবায় বিপণি**, ফল-ফসল চয়নের বিশেষ ব্যবস্থা আর সংরক্ষণ ও মজুত রাখার উপযোগী গোলা বা কৃষি ভাণ্ডার। আর থাকবে ক্রয় বিক্রয়ের বিশেষ বাজারের ব্যবস্থা।

**বিকল্প কৃষি-খামারের ব্যবস্থা :** কৃষি-খামার গড়ে উঠার সম্ভাবনা বেশী গ্রামীণ পরিবেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে, যেখানে কৃষি-খামারের উপযোগী দুই তিন একর জমি অনুদান হিসাবে পাওয়া যেতে পারে। তবে কলিকাতার বাইরের শহর অঞ্চলের কিছু কিছু বিদ্যালয়ে—যেখানে চাষযোগ্য জমি পাওয়া যাবে না—সেখানে ঐ সব ভূমি-গবেষণাগার ( land laboratory ) গুলিকে কিভাবে বিকল্প কৃষি-খামারে পরিণত করা যায়, তার জন্য একটি সুপরিকল্পিত কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। এখানে সম্ভাব্য একটা পূর্ব-পরিকল্পিত কার্যসূচী নিম্নে উপস্থাপন করা গেল। কার্যসূচীটি নিম্নরূপ :—

(১) সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-প্রকল্প গ্রহণ
(২) ফলের ফলন বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন
(৩) খামার-পরিচালন দক্ষতা ও বৈশেষিক জ্ঞান পরিবেশনা
(৪) সার ব্যবহারের অভিপ্রদর্শন ( Demonstration )
(৫) জমির উন্নতি বা উৎপাদনক্ষম করার অভিপ্রদর্শন

(৬) গো-মহিষাদির প্রদর্শনীর আয়োজন
(৭) কৃষি প্লটের উন্নতিসাধন, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা
(৮) বিদ্যালয়ের জন্য ফুল ও পাতাবাহার গাছের চাষ
(৯) খোঁয়াড়ে উন্নত প্রজনন ব্যবস্থা

## ভূমি গবেষণা কেন্দ্রের জন্য পরিকল্পনা ঃ

এই ভূমি-গবেষণাগারের কাজগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়, সেজন্য প্রয়োজন একটি সঠিক পরিকল্পনা। আমরা কি জন্মাতে চাই, উৎপন্ন ফসলাদির কি ব্যবস্থা হবে,—এই সব ব্যবস্থাপনার পরিচালনার জন্য যে টাকা পয়সার প্রয়োজন, তা কিভাবে কোথা থেকে পাওয়া যাবে, সে কথা ভেবে চিন্তে স্থির করে নিতে হবে।

নিম্নলিখিত বিষয়-ভাবনার উপরই নির্ভর করবে জমি-পরীক্ষাগারের চাষ আবাদের ব্যাপারটা। যথা—

(১) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি চান, তাঁহাদের লক্ষ্য কি ?
(২) কি পরিমাণে, কি ধরণের কৃষি সরঞ্জাম বা হাতিয়ার পাওয়া যাবে ?
(৩) মাটির গুণাগুণগত অবস্থা কিরূপ ?
(৪) কি কি উৎপন্ন শস্যাদি আবহাওয়া, উপযোগী হবে ?
(৫) উৎপন্ন শস্য বা পশু-সম্পদের বাজারমূল্য কত হবে ?
(৬) কৃষিজ উপাদানকে কি কি কাজে লাগানো যাবে ?
(৭) খামারের কেন্দ্রস্থলে ফলন-প্রজনন-কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

## পরীক্ষাগারের উপযোগী উপকরণ :

আবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ বা চাষের সরঞ্জাম দু'ভাবে সংগৃহীত হ'তে পারে। যথা—ভাড়া করে আনা, অথবা ক্রয় করা। বিদ্যালয় যদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনে নিতে পারেন তো খুবই ভালো হয়। কারণ যখন যে কাজে হাত দেওয়া যাবে, তার উপযোগী যাবতীয় যন্ত্রাদির একান্তভাবেই দরকার।

তবে কখন কি ধরণের কৃষি-উপকরণের প্রয়োজন, তা নির্ভর করবে কর্ম-পরিকল্পনা ও শিক্ষক মহাশয়ের উপর। যেমন ফুল বাগানের কাজ ও আলুচাষের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের যন্ত্রপাতির দরকার হবে। তবে চাষের প্রাথমিক কাজ করার জন্য একটি ছোট বাগান-ট্র্যাকটর ( garden-tractor )-এর বিশেষ প্রয়োজন। তা'ছাড়া দরকার নানা ধরণের হস্তচালিত উপকরণাদি। কৃষি

পরীক্ষাগারে কাজ করতে গেলে কি কি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হ'তে পারে, এখানে সেই সব যন্ত্রাদির তালিকা দেওয়া গেল :—

| | | |
|---|---|---|
| কোদাল | হাতে ঠেলা লাঙ্গল, | ষ্টীল স্কয়ার |
| খনন যন্ত্র-শাবল | ষ্টীল টেপ, | স্প্রে-যন্ত্র |
| হুইল ব্যারো | হাত-করাত | ডাষ্টিং গান |
| হোস পাইপ | হাতুড়ি | ফুলদানি |

বীজ বপন করিবার জন্য বীজ বপন যন্ত্র ( seed drill ), নিড়ানি ও শস্য মাড়াই যন্ত্র প্রভৃতি।

এই যন্ত্রপাতিগুলিকে **'কোষাখানার'** ( tool house ) নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখতে হ'বে, যাতে দরকারের সময় সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। এই ঘরটি আকারে একটু বড় হওয়া দরকার, কারণ এখানে সার, সরঞ্জাম থেকে 'স্প্রে', হোসপাইপ মায় বীজ ও শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

### ভূমি-গবেষণাগার বা পরীক্ষাগারে শ্রমদান ঃ

ভূমি-গবেষণাগারে শিক্ষার্থী ছাত্ররাই নিজ হাতে কাজ করবে। এই কাজে ছাত্ররা যখন দেখবে তারা কৃষিকাজে কেবল দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়েই উঠছে না, নূতন নূতন অনেক কিছুই শিখতে পারছে, তখন তারা সানন্দে শ্রমদান করবে। দরকার হ'লে—বিশেষ করে বর্ষাকালে বীজ বপনের সময়, তাদের অতিরিক্ত সময়েও খামারে কাজ করতে হ'বে।

যেখানে গবাদি পশু আছে, সেখানে পালাক্রমে ছাত্রদের এক একজন এক একদিন গরুর সাহায্যে জমি চাষ করবে। এই পালার কাজ থাকবে সারা বছরের মত ভাগ করা। আর যেখানে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ট্র্যাকটর যোগান দিতে পারবেন, সেখানে ছাত্রদের দ্বারা ঐ যন্ত্র চালানো সম্ভবপর না হ'লে, পেশাদার ট্র্যাকটর চালকের সাহায্য নিতে হ'বে। নিকটবর্তী কোন দক্ষ চাষীর সাহায্য নিতে পারলেই ভালো হয়।

**ভূমি-গবেষণাগারের খাতে অর্থ বরাদ্দ ব্যবস্থা ঃ** এই বাবদে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা দু'ভাবে হ'তে পারে। প্রথমতঃ যদি পুরোপুরি শিক্ষণ-উদ্দেশ্যে কৃষি-গবেষণাগারগুলি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে, তবে এই পর্বের যাবতীয় ব্যয়-ভার বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি বা কর্মকর্তাদের গ্রহণ করতে হ'বে। দ্বিতীয়তঃ কৃষি-প্রকল্প হিসাবে এক এক দলের ছাত্রদের মধ্যে কিছু জমি ভাগ করে দিয়ে পাশ্চাত্য

দেশের মত এই শর্তাধীনে কৃষি-কর্ম সম্পন্ন হ'তে পারে। যথা—বিদ্যালয় জমি ও যন্ত্রপাতি দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, ছাত্ররা সার-বীজ কেনা ও ফসল উৎপাদনের যাবতীয় ভারই গ্রহণ করবে। বিনিময়ে তারা উৎপন্ন শস্যের লভ্যাংশ গ্রহণ করবে। এইজন্য কৃষি-প্রকল্পের বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে, তা' বিভিন্ন বাজেট-খাতে ধরতে হবে। যেমন—যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ এত……টাকা, শ্রম ও সরবরাহ বাবদ এত……টাকা বরাদ্দ করতে হ'বে। শস্য বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় অর্থ Land Laboratory fund-এ জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট কার্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমি-গবেষণাগারগুলি পরিচালিত হ'বে। সেই সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পাকা জমা-খরচের খাতা রাখতে হ'বে। এই হিসাব নিকাশের দায়দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে ভার-প্রাপ্ত শিক্ষকের উপর।

**বিদ্যালয়-খামার:** পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়-খামার খোলার যেমন অনেক সুবিধা আছে, তেমনি আছে আনুষঙ্গিক বহু সমস্যাবলী। শিক্ষক মহাশয়দেরই বিশেষ করে এই সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। যে দায়িত্ব ভূমি-গবেষণাগারে অথবা পর্যবেক্ষণ-কৃষি-ক্ষেত্রে ছিল না, এমন অনেক কাজ বিদ্যালয়-খামারে শিক্ষকদের করতে হবে। এহেন অসুবিধা ছাড়া যে যে সুযোগ সুবিধা শিক্ষক মহাশয়রা ভোগ করে থাকেন, নিম্নে তা' বর্ণিত হ'লো :—

(১) প্রথম সুবিধা এই যে, দীর্ঘ-মেয়াদী-প্রকল্প নিয়ে শিক্ষক মহাশয়রা সারা বছর কাজ করে নানা অভিপ্রদর্শনীর (demonstration) ব্যবস্থা করতে পারেন।

(২) ছাত্ররাও নানা-খামার পরিস্থিতির অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, যা' পরবর্তীকালে কৃষি-খামার পরিচালনা ব্যাপারে এই পরিপূরক জ্ঞানই তাদের সাহায্য করতে পারে।

(৩) যাদের খামার তদারকীর অভিজ্ঞতা (Supervised farming experience) নেই, তারা সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে শুধু ঘরে ফিরে যাবে না, তারা কৃষি-প্রকল্পের কাজ করার সুযোগ ও পশুপালনের উপযোগী ভূমিও পেতে পারে; অথবা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেও এ সম্পর্কে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়াদি জানতে পারে।

(৪) শিক্ষকমহাশয়রা কাজে কথায় এক হ'য়ে তাঁদের পঠনপাঠনের বিষয়কে সঠিকভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন।*

(৫) উপদেষ্টা সমিতির অভিভাবনাকে কাজে লাগানোর উপযোগী আদর্শ পরিবেশ রচনা করার সুযোগ পাওয়া যায়।

(৬) এই স্কুলফার্ম প্রজাত খাঁটি পশু-প্রাণী, মুরগী, পাতা বাহারের গাছ, বিভিন্ন জাতের ভালো বীজ কৃষক সমাজকে সরবরাহ করতে পারে।

**বিদ্যালয়-খামারের গঠনাকৃতি ( Size of the school Farm ) :**

প্রশিক্ষণ-কল্পেই এই বিদ্যালয়-খামারের প্রবর্তন। এই ধরনের খামারের আয়তন ও ব্যবস্থাপনা কেমন হ'বে, তা' বহুলাংশেই নির্ভর করছে বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্গতির উপর। তবে মনে রাখতে হ'বে যে, স্বল্প খরচে এবং কম লোকের দ্বারা গোটা খামারের তত্ত্বাবধান, পরিচালন ও পঠন পাঠনেরও ব্যবস্থা করা যায়, তার চেয়ে বেশী বিভাগ বা পরিসর বাড়ানো উচিত নয়। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কতকগুলি ফসলের চাষ ও পোলট্রি স্থাপনের জন্য আনুমানিক ১০ থেকে ১৫ একর জমির দরকার। আর গবাদি পশুপালন ও ধান-গম-ভুট্টার চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জমির প্রয়োজন আনুপাতিক হারে আরও বেশী হ'বে।

**খামার গৃহ ও উপকরণাদি ( Buildings and Equipment for the school farm ) :** খামারের আকার আয়তন কেমন হবে, সেই অনুসারে প্রয়োজন হ'বে খামার গৃহের। যদি গবাদি পশুপালন ও হাঁসমুরগী রাখার ব্যবস্থা থাকে, তা' হ'লে ওদের জন্যই উপযুক্ত গৃহাদি নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন হ'বে। আর যদি মরশুমী ফুলের চাষ, সবুজঘর ( তরুলতাদি সংরক্ষণের জন্য ) ব্যবস্থা করতে হয়, তার জন্য উপযুক্ত গৃহাদি নির্মাণের দরকার হবে। অধিকাংশ বিদ্যালয় খামারের নানাবিধ জিনিসপত্রাদি রাখার জন্য মুক্তাঙ্গন ভাঁড়ারের ( uncovered storage space ) দরকার হ'বে। সেখানে বীজ রাখা, সার প্রস্তুত করা, কীট-বিনাশক ঔষধ মজুত করা ও পশুচারণ ভূমিরও ব্যবস্থা হ'বে। তা' ছাড়া রাখা যাবে খামারের কৃষি-যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি। এরজন্য গৃহ নির্মাণ-পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সে ব্যয়ভার বহনে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সমর্থ হবেন কিনা সেটাই প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়।

**উপকরণ :** একজন দক্ষ কৃষক বা কৃষি-খামারের মালিক যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন, অন্ততঃ পক্ষে সেই সব হাতিয়ার ও কৃষি উপকরণ যে কোন বিদ্যালয়-খামারের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হ'বে। যত দূর সম্ভব আধুনিক ও উন্নত ধরণের যন্ত্রাদি সংগ্রহ করাই সমীচীন। এই যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ঠিক জায়গায় রাখা, মেরামত করানো, তেল দিয়ে ঠিক রাখা প্রভৃতি কাজগুলো নিয়মিত হ'চ্ছে কিনা, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়াই হবে কৃষি-শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য।

## বিদ্যালয়-খামারের ব্যবহার ( uses of the School-Farm )

সাধারণতঃ তিনভাবে বিদ্যালয় কৃষি-খামারের ব্যবহার হ'তে পারে। যেমন একজন কৃষি-শিক্ষক যে উদ্দেশ্যে কৃষি-ফার্মকে কাজে লাগাবেন, অন্য শিক্ষক তাকে ব্যবহার করবেন ভূমি-গবেষণাগার হিসাবে অথবা পর্যবেক্ষণ প্লট হিসাবে ( observation plot )। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত প্রয়োজন সাধনেই বিদ্যালয়-খামারের একান্ত.দরকার :—

(১) কৃষি-শিক্ষার্থীদের পঠন-শিক্ষণ পরিবেশ ( teaching-learning situations ) সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য।

(২) ছাত্র ও আগ্রহী কৃষকদের সামনে বাঞ্ছিত খামারগত কৃত্যের অভিপ্রদর্শন-এর ( demonstration of desirable farm practices ) জন্য।

(৩) খামারে আয় বাড়ানোর জন্য বিশুদ্ধ পশু-প্রজনন এবং উন্নত ধরণের এমন গাছ-গাছালীর উৎপাদন করা, যাকে সমাজ সম্পদ রূপে গ্রহণ করবে।

(৪) কৃষি গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে প্রয়োগ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা,—এগুলি অবশ্য সম্পাদিত হ'বে ঐ সব গবেষণাকেন্দ্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে।

(৫) বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্ন ভোজনে টাটকা শাক সব্জী, ফলমূল, এবং খাঁটি দুগ্ধ যোগান দেওয়ার জন্য।

(৬) ছাত্রদের উন্নত প্রজননের গবাদি পশু সরবরাহ করা, যাতে তারা তাদের গবাদি পশুর ক্রমোন্নতি সাধন করতে পারে।

(৭) ছাত্রদের খামার পত্তনের জন্য যখন স্থান উপকরণের প্রয়োজন হবে, তখন তাদের এই সব ব্যবস্থা করে নেওয়া।

**স্কুল-খামারের অর্থ সংস্থান :**—বিদ্যালয়ের সাজসরঞ্জাম, শিক্ষোপকরণ প্রভৃতি কেনার জন্য যেমন স্কুল-ফাণ্ড থেকেই অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে, তেমনি বিদ্যালয়ের কৃষি-খামারের জন্যও অর্থ বরাদ্দ করতে হ'বে। ইওরোপের কোন কোন অঞ্চলে—যেখানে বিদ্যালয়ের কৃষি-খামারগুলোও বিশেষ সমৃদ্ধ—নানা খরচ বাবদে যে বিশেষ শুল্ক আদায় করা হয়, কৃষি-খামার সম্বলিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ঐ টাকা অনুদান হিসাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়। যেমন করেই হোক বিদ্যালয় কৃষিখামার ফাণ্ডে বেশ কিছু টাকা রাখার ব্যবস্থা করতে হ'বে। কেননা, বিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিল থেকে খামার পরিচালনার অর্থ যোগালেও, ফার্মের যন্ত্রপাতি চালনোর জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তা' বিদ্যালয়-পরিচালকরা

দিতে চান না। এইজন্য সম্ভব হ'লে ফার্ম চালানোর জন্য বিকল্প আয়ের সংস্থান করতে পারলে ভালো হয়।

**হিসাব-নিকাশ ব্যবস্থা:** বিদ্যালয়-খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ করতে হ'বে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে। অর্থাৎ খামারের জন্য যা কিছু কেনাকাটা হ'বে, তা' ঐ হিসাবের খাতেই দেখাতে হ'বে। আবার উৎপাদিত শস্য বিক্রয় লব্ধ অর্থও ঐ ফাণ্ডে জমা করতে হ'বে। সমস্ত খরচ-খরচাই বৎসরে একবার হিসাব পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হ'বে।

## ধানচাষ

**ভূমিকা:** আবাদী শস্যের মধ্যে ধানই এদেশের সর্বপ্রধান ফসল। এর আবাদ সমগ্র ভারতবর্ষের বিস্তৃততর অঞ্চল জুড়ে। সেই খেনো জমির পরিমাণ আনুমানিক ২৮ মিলিয়ান হেক্টর। এই জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ প্রায় ৩০ মিলিয়ান টন।

**চাষোপযোগী জলবায়ু:**—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আবহাওয়াই ধান চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। তাপমাত্রার পরিমাণ যেখানে ২২° সেণ্টিগ্রেড, সেই সব অঞ্চল ধান উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

গড়পড়তা তাপমাত্রা যেখানে ৩৫° থেকে ৪৫° সেণ্টিগ্রেড, সেখানে জল-সরবরাহ অপ্রতুল হলে,—সেই তাপ সহ্য করে ধান গাছ বাঁচতে পারে না। তা' ছাড়া ধান গাছ এমন একটি উদ্ভিদ, যা' নিস্তরঙ্গ বদ্ধ জলের যোগান ভিন্ন বাঁচতে পারে না। এই কারণে মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেতে জলের সেচ দিতে হয়। আমাদের দেশে যেখানে জল দাঁড়ায়, এমন পলি-পড়া এঁটেল মাটির নিচু জমিতে ধান চাষ ভালো হয়। এই কারণে ধান বপনের সময় থেকে পরিপক্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কম পক্ষে ১০০ থেকে ১২০ সেণ্টিমিটার জল সরবরাহের প্রয়োজন হয়।

যদি সম্পূর্ণ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করতে হয়, তবে বর্ষাকালে ধান জন্মানোর মরশুমের সময়। একটানা দিন দশেকের বৃষ্টির মধ্যে ১০ থেকে ১৫ সেণ্টিমিটার জল ধান ক্ষেতে দাঁড়ানো দরকার। এটা অবশ্য ধান বপন ও কর্ষণের পূর্বেই হওয়া চাই। যেহেতু আবদ্ধ জলেই ধান ভালো জন্মায়, সেজন্য বেশ কয়েকবার ধানের ক্ষেতে জলসেচ দিতে হয়। এই কারণে সেচ-ব্যবস্থা ধান চাষের অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

নরম গুচ্ছমূল থাকার দরুণ ধান গাছের সহজ স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে কর্দমাক্ত নরম মাটিতে। আর অনেক দিন জলটাকে ধরে রাখতে পারে এমন এঁটেল মাটির

প্রয়োজন। জমির উপর স্তরের ভিজে ভারী সারযুক্ত মাটিই ধান চাষের পক্ষে প্রশস্ত। এই কারণে আমাদের দেশের চাষীরা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতেই আমন ধানের চাষ করে থাকেন।

**জমি নির্বাচন:** আমন ধান চাষের জমি নির্বাচনের সময় যে কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হ'বে, সেটা হলো এই যে, স্থায়িভাবে সেই জমিতে আমনের চারা রোয়া যাবে কিনা। উৎপাদনের লটারীতে যে জমিতে দু' একবার মাত্র গোলাভরা ফসল পাওয়া যাবে, সে জমি কিন্তু আদৌ আমন চাষের উপযোগী নয়। উঁচু আলের বেষ্টনে ঘেরা নিচু বিস্তৃত সমতল ক্ষেতই আমন-চাষের পক্ষে উপযুক্ত এবং প্রশস্ত জমি। এই কারণে গঙ্গা অববাহিকার নিম্ন পলল মৃত্তিকা অঞ্চল, বিশেষকরে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যেখানে বৎসরে ১০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়, আমন চাষের পক্ষে সেই সব অঞ্চলের জমিই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম এবং কেরালা প্রভৃতি রাজ্যের উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধানই সর্বপ্রধান। উত্তর প্রদেশের ফসলের তালিকায় ধানের স্থান গমের পরে, মহারাষ্ট্রে ভুলোর পরে, গুজরাটে জনারের পরে ধান্য শস্যের স্থান। আজকাল অবশ্য পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে, হিমাচল প্রদেশে ও জম্মু-কাশ্মীরের উপত্যকায় ধান চাষ শুরু হ'য়েছে।

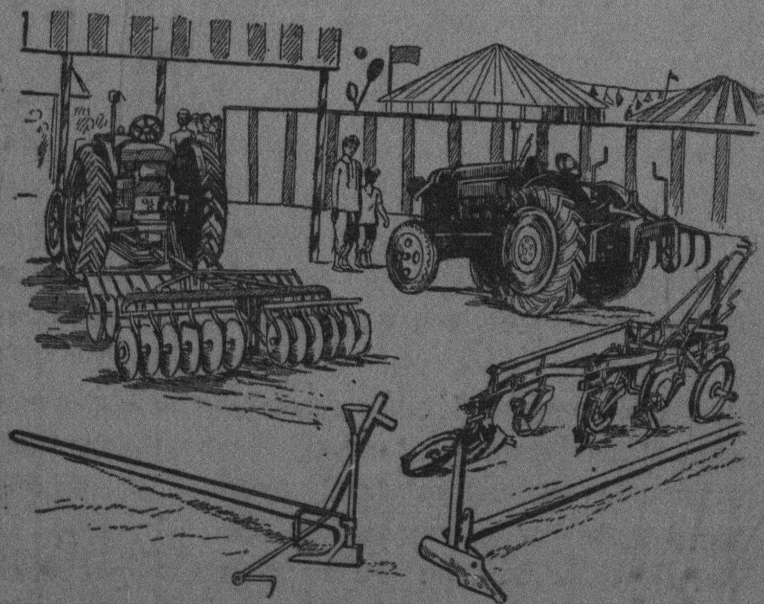
**আবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য: ( Special characteristic ):** আমন ধান চাষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, আমন ধানের চারাগাছগুলোকে বীজতলা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জল-কাদাময় সারযুক্ত নরম-চষা জমিতে সারিবদ্ধভাবে ১৫-২০ সেঃ মিটার অন্তর রোপণ করতে হয়। শিশুধান-চারাগুলি বেশ কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে উঠলে, সেগুলিকে বীজতলা থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে লোক দিয়ে অন্য তৈরি জমিতে রোপণ করতে হ'বে। এই রোপণ করার ব্যাপারটা শ্রম ও সময় সাপেক্ষ হলেও, বেশী ফলনশীল বলেই এই হস্ত-রোপণকেই কৃষি-বিশেষজ্ঞরা আদর্শ পন্থা বলে মনে করেন।

আমাদের দেশে শতকরা ৫০% রোয়া-ধানের চাষ হয়ে থাকে। চীন-জাপানের সর্বত্রই রোয়া-ধানের আবাদ হ'চ্ছে। সেখানে এদেশের মত কোথাও আউশ ধানের চাষ নেই। বপন প্রথাতেও ভারতবর্ষে চাষ হয়। এই প্রথায় জমিতে একেবারেই চাষ দিয়ে ধান বুনে দেওয়া হয়।

**এদেশে ধানের উৎপাদন:** ভারতবর্ষে ধানের ফলন তেমন আশাপ্রদ নয়। এ দেশে হেক্টর প্রতি ( ৮০৭ পা: একর প্রতি ) ১০০ কেজি ধান পাওয়া



জমিতে ধান রোয়া হচ্ছে



ট্র্যাকটর প্রভৃতি আধুনিক কৃষিযন্ত্র

যায়। জাপানের চাষীরা ওর পাঁচ গুণ ধান ফলায়, আর চীনা চাষীরা ফলায় আমাদের ৪ ভাগ বেশী। এদেশে ধান-ফলনের হার এত নিম্ন হওয়ার একাধিক কারণ আছে। যেমন—এদেশে বর্ষা ঋতুর খামখেয়ালীপনা ও জল সরবরাহের অনিশ্চয়তাহেতু কখনই প্রত্যাশিত ফসল পাওয়া যায় না। এই অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। বিদেশ থেকে ভালো বীজ আমদানী করা হচ্ছে; জলসেচের সুব্যবস্থাও করার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি জাপানী প্রথায় চাষের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে কোন কোন অঞ্চলে। বর্তমানে উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাতের ধান আমাদের দেশে উৎপন্ন হচ্ছে। সাবেকী প্রথার চাষের পরিবর্তে এদেশের গ্রামীণ চাষীরা যাতে উন্নত প্রথায় চাষবাস করতে শেখে, তার জন্যও প্রচেষ্টা চলেছে। সরকারী মহলের বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন যে, প্রয়োজন হলে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের-ব্যাপকহারে ধান-রোপণের কাজে লাগানো যায় কিনা।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## গৃহ উদ্যান—শাক সবজি চাষ

**ভূমিকা:** বর্তমান অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার দিনে, বাজারে তরকারীর দাম যখন খুবই চড়া, তখন গৃহ-সংলগ্ন জমিগুলোকে পতিত না রেখে আমরা নিশ্চয় উদ্যান পরিকল্পনানুসারে একটা ছোটখাটো বাগান করার কাজে হাত দিতে পারি। ধরা যাক, গৃহের সামনেটায় হ'বে একটা বারোমাসী ফুলের বাগান, আর পিছনের অংশটা ব্যবহৃত হ'বে সবজি ক্ষেতরূপে। তা'হলে দ্বৈত-উদ্দেশ্যই সাধিত হ'বে। যেমন—ফুল বাগান তৈরি হ'লে সুন্দর হয়ে উঠবে গৃহ-পরিবেশটি। দ্বিতীয়তঃ সবজি ক্ষেত থেকে পাওয়া যাবে প্রয়োজন মত নানা তরিতরকারী। এছাড়া স্থায়ী বড় বড় ফলের গাছগুলিকে—যেমন আম-জাম লিচু-পেয়ারা-কাঁঠাল-নারিকেল-সুপারি প্রভৃতি বাড়ীর চতুর্দিকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে সারিবদ্ধভাবে রোপণ করতে হ'বে।

**সবজি ও ফলবাগান:**—সবজি বাগান করতে হ'লে সর্বাগ্রেই একটা কৃষিপঞ্জী প্রস্তুত করে নিতে হবে। কেননা, কোন শাক-সবজি কখন লাগাতে হয়,

তা' জানা না থাকলে, বাগান করাটা বিড়ম্বনা হ'য়ে দাঁড়াবে। কারণ অন্য ঋতুতে কোন সবজি লাগালে, সে গাছ লাগানোই সার হ'বে, কোন ফসলই পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে লাভজনক ফল চাষ করতে হ'লে নানা কৃত্রিম উপায়ে বিচিত্র ধরণের, হরেক রকম জাতের বৃক্ষ উৎপাদনের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হ'বে। আর জানতে হ'বে নানা রকমের কলম করার বিভিন্ন প্রণালী।

**সবজি চাষের কৃষিপঞ্জী :** প্রথমে সবজি চাষের কৃষিপঞ্জীটা সামনে রাখা যাক। ব্রাহ্মণের যেমন নিত্য আরাধ্য গীতা, তেমনি অপেশাদার কৃষি-প্রেমিকের কাছে অপরিহার্য কৃষিপঞ্জী। এই কৃষিপঞ্জার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মাস বা ঋতু অনুসারে সাজিয়ে নিয়ে একটা বড় কাগজে সুন্দর করে লাইন টেনে লিখে নিয়ে কার্ডবোর্ডে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখতে হবে। সেটা বৈঠকখানা ঘরের এমন জায়গার দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে হবে যে, বসার চেয়ার থেকে যেন সহজেই কৃষিপঞ্জীটা দেখা যায়। নিম্নে সবজি চাষের কৃষিপঞ্জীটা দেওয়া গেল :—

**বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে :** বরবটি, শশা, ঢ্যাড়স, দেশী কুমড়া, ধুন্দুল, ঝিঙা, করলা, মুক্তকেশী বেগুন, আউসে বেগুন, সাদা বড় বেগুন, মাকড়া বেগুন, সাদা হাঁসের ডিমের মত বেগুন, চাঁপানটে, সাদানটে, কাটোয়ার ডাঁটা, পুঁইশাক, লঙ্কা, বর্ষাতি মূলা, সিম, শাঁক-আলু, লাউ, চিচিঙ্গা ও মক্কা প্রভৃতির বীজ বপন করতে হয়।

**আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে :** বেগুন, বিলাতী কুমড়া, ঢ্যাড়স, ধুন্দুল, মুক্তকেশী, বেগুন, চাঁপানটে, কাটোয়ার ডাঁটা, চিচিঙ্গা, মক্কা, পাটনাই মূলা, হাতি চোখ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর ও বীট প্রভৃতি বপন করতে হয়।

**ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে :** বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর, টমেটো, ছালাদ, মার্কিন লঙ্কা, পামকিন, স্কোয়াস, পিঁয়াজ, স্পিনাক, আমেরিকা মূলা, দেশী লাউ, তামাক, পালংশাক, শুলফা, টকপালং, পিড়িং, মেথি ও বেতোশাক বপন করতে হয়।

**কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে :** নাবী বাঁধাকপি, ওলকপি, বীট, শালগম, গাজর, ছালাদ, আমেরিকান সিম ও মূলা, দেশী ও আমেরিকান কড়াইশুঁটি, টম্যাটো, পিঁয়াজ, মূলা, আলু, ধনে, মুগ, মসুর, ছোলা, কলাই, সরিষা ও পটোল প্রভৃতির বীজ বপন করতে হয়।

**পৌষ ও মাঘ মাসে :** উচ্ছে, কাঁকুড়, ফুটি, তরমুজ, খেঁড়ো, ঝিঙা, পেঁপে, কন্‌কানটে, লালশাক, লাউ, লঙ্কা, কুলি বেগুন, সিঙ্গে বেগুন ও শশা বপন করতে হয়।

**ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে:** পুঁইশাক, দেশী কুমড়া, লঙ্কা, নটে, ডেঙ্গো, তরমুজ, খরমুজ, কাঁকুড়, চাঁপানটে, পদ্মনটে, বিবিনটে, আউসে বেগুন, কাঁকড়ি ও পাট বপন করতে হয়।

## বপন ও রোপন প্রণালী

যে সব চারা স্থানান্তরিত করতে হয়, তাদের বীজ ভাটিতে কিম্বা গামলায় বপন করাই সমীচীন। বিকালের দিকই বপনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত।

বীজ বপনের পূর্বদিন বীজতলার মাটি আল্‌গা ও ঝুরা করে রাখতে হ'বে। মাটি যখন শুষ্কাবস্থায় থাকে, তখন বীজতলা প্রস্তুত করতে হবে। বীজতলার মাটি ঝুরা ও আঁশাল হওয়া উচিত। মাটির সঙ্গে অত্যল্প চূর্ণ, পাতা সার, গোবর সার মিশ্রিত করে দিলে ভালো হয়। বীজতলার মাটি একান্ত শুকনো হ'লে বীজ রোপন করার ৪।৫ ঘন্টা পূর্বে অল্প জল দিয়ে মাটিটা সরস করে নেওয়া উচিত।

**ভাটির আয়তন:** ভাটির আয়তন মত বা নিজের প্রয়োজন মত বীজ নিয়ে তাতে ছড়িয়ে দিতে হবে। বীজগুলি যাতে সমান দূরত্বে সুশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে পড়ে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হ'বে। বীজগুলি অঙ্কুরিত না হওয়া পর্যন্ত জল সেচনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মাটিতে রস না থাকলে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে দিতে হবে। বীজের উপর হাল্‌কা ও ঝুরা মাটি চাপা দেওয়া উচিত। অধিক এবং ভারী মাটি চাপা দিলে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মাটি ভেদ করে উপরে উঠতে পারে না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজসমূহ ভাটিতে ছড়িয়েই বপন করতে হয় এবং অপেক্ষাকৃত বড় বীজগুলি এক একটি করে স্বতন্ত্রভাবে ২ সেন্টিমিটার মাটির নীচে পুঁততে হয়।

বীজ অঙ্কুরিত হ'তে সাধারণত: ৮।১০ দিন সময় লাগে। চারা যখন নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে, তখন সেগুলিকে প্রচণ্ড রৌদ্র থেকে রক্ষা করার জন্য মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ণ পর্যন্ত ঢেকে রাখা উচিত। চারা গাছে অতি সাবধানে জলসেচন করা উচিত।

একদিকে ভাটিতে যেমন চারাগুলি বাড়তে থাকে, অন্যদিকে তখন জমিতে লাঙ্গল ও মই বা কোদাল চালিয়ে মাটি তৈরি করে রাখতে হবে। মাটি তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতে পরিমাণ মত সার মিশিয়ে নিতে হয়। বিকেল বেলায় ক্ষেতে চারা লাগাতে হয়। যথানিয়মে চারাগুলি ক্ষেতে রোপিত হ'লে, তাতে ভালোভাবে জলসেচন করতে হবে।

চারা রোপনের পরদিন থেকে ৪।৫ দিন দিনের বেলা এই সব রোপিত চারাগুলিকে কদলী পেটিকা, কচুপাতা ও কলাগাছের বাইল দ্বারা বিশেষরূপে আবৃত

করে রাখতে হ'বে অর্থাৎ সূর্যের খর তাপ থেকে চারাগাছকে ৪।৫ দিন রক্ষা করতে হবে।

## বাঁধাকপির চাষ

**কপির জমি:** বাঁধাকপি ছায়াবিহীন শক্ত দোআঁশ অথবা হাল্‌কা মাটিতে কিম্বা একেবারে নূতন জমিতে (যেখানে আদৌ চাষ হয়নি) ভাল জন্মায়। সার দিয়ে জমি তৈরি রাখতে হয়। ভাদ্র অথবা আশ্বিন মাসে চারা প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে অথবা তৎপূর্বে লাঙ্গল বা গার্ডেন ট্র্যাকটরের সাহায্যে জমিতে ভালোভাবে চাষ দিয়ে সার ছড়িয়ে দিতে হয়। কপিচাষে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে যে,প্রয়োজন মত সার দিলে কপির ফলন বাড়বে এবং কপিও বড় হবে।

**চারা তৈরির নিয়ম:** দো-আঁশ মাটিতে পুরাতন গোবর সার মিশিয়ে ধুলার মত গুঁড়া করে সেই মাটি দিয়ে একটি গামলা পূর্ণ করতে হ'বে। ঐ গামলার আকার অনুসারে তাতে পরিমাণ মত বীজ বপন করতে হ'বে। অল্পস্থানে বেশী বীজ বুনলে চারা ঘন হয়ে উঠে। তাতে চারাগুলি অপেক্ষাকৃত কমজোরী হয়। কাজেই পাতলা করে বীজ বুনে তার উপর মিহি গুঁড়ো মাটি ছাড়িয়ে ঢাকা দিয়ে হাতের তালু অথবা সমতল কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে সামান্য চাপ দিতে হয়, অধিক চাপ পড়লে অঙ্কুর বার হতে ব্যাঘাত জন্মায়।

**বীজতলে জল সেচনের নিয়ম:**

বীজ বপনের দু' তিন দিন পরে সরু ছিদ্রের ঝাঁঝরি করে অথবা জলে ভিজানো কতকগুলি বিচালী বা খড়ের অগ্রভাগ দ্বারা গামলা বা হাপরে আবশ্যক মত অল্প অল্প ৩।৪ দিন পরে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে। সমস্ত চারা বার হতে ৭।৮ দিন পর্যন্ত জল দিলে সময় লাগতে পারে।

গামলা অভাবে একটু উচ্চ ক্ষেতে চৌকো বা হাপর প্রস্তুত করে সেখানে বীজ বপন করা যেতে পারে। হাপর কিন্তু পার্শ্বস্থিত জমি অপেক্ষা ৪।৫ ইঞ্চি উঁচু হওয়া চাই। বীজবপন কালে মাটি অত্যন্ত ভিজা থাকলে চলবে না। গামলা বা হাপরে চারা বের না হওয়া পর্যন্ত উহা অনাবৃত রাখা উচিত। কিন্তু বীজ বপন করার পর অধিক রৌদ্রের তাপ ও বৃষ্টি থেকে বীজ এবং পরে চারাগুলি রক্ষা করা আবশ্যক।

**চারা গাছ রাখার নিয়ম:** চারা বার হ'লে অধিক রোদে কিম্বা ছায়া না পায়, এরূপ জায়গায় রাখতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, অধিক বৃষ্টির জলে বীজ নষ্ট হয়ে যায় এবং চারা গাছ মারা যায়। এইজন্য চৌকো বা হাপরের উপর

রৌদ্রাদি নিবারণের জন্য গোল পাতা, বিচালি অথবা হোগলার দ্বারা ছাউনি বা ঢাকা প্রস্তুত করে প্রয়োজন মত ঢেকে রাখতে হ'বে।

এই ছাউনি বা ঢাকা এমন হওয়া উচিত যে, ইচ্ছা মতন তুলে রাখা যেতে পারে; এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বীজ বপন করে দিনের বেলা ছাউনি বা ঢাকার দ্বারা "হাপর" আবৃত রাখতে হয় এবং রাত্রিকালে বৃষ্টি হলে তৎক্ষণাৎ "হাপরে" চাপা দিতে হ'বে। ঐভাবে রাত্রে বীজতলা বা হাপর ঢাকা দেওয়ায় অসুবিধা হ'লে, প্রতিদিন রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার আগেই হাপর বা বীজতলা ঢাকা দিলেও চলে। প্রাতঃকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছাউনি বা ঢাকা খুলে দিতে হ'বে। কিছুক্ষণ ভোরের রোদ লাগার পর পুনরায় ঢাকা দিতে হ'বে। আবার অপরাহ্নে সূর্যের তাপ কমলে ঢাকা খুলে দিতে হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত পারা যায় রাত্রিকালে বীজতলা অনাবৃত রাখতে হ'বে।

চারা গাছ বড় হ'তে থাকলে দিন দিন অপেক্ষাকৃত অধিক সময় খোলা রাখতে হবে এবং অপরাহ্নে ক্রমশঃ তাড়াতাড়ি অনাবৃত করে অল্পে অল্পে চারাগুলিকে রৌদ্র তাপ সহ্য করাতে হ'বে। কিছুদিন এইরূপ করার পর আর হাপর ঢাকার দরকার হবে না। তবে বৃষ্টি হলে হাপর অতি অবশ্যই ঢাকা দিতে হবে। অবিবেচনা পূর্বক বেশ কয়েকদিন আবৃত রাখলে চারাগুলি অতিরিক্ত লম্বা ও শ্বেত বর্ণ হয়ে ভূমিতে পড়ে অচিরে নষ্ট হয়ে যাবে।

**চারা রোপনের সময়ঃ** চারাগুলি গামলা বা হাপরে কিছু বড় ও সতেজ হয়ে উঠলে, তখন সাবধানে চারাগুলিকে তুলতে হ'বে, যাতে চারাগুলির শিকড় ছিঁড়ে না যায়। সন্ধ্যা বা রাত্রিকালে চারাগুলি তুলে পূর্বে তৈরী করা জমিতে আবশ্যক মত এক থেকে দু'হাত দূরে গর্ত করে চারাগুলিকে বসিয়ে অল্প অল্প জল দিতে হবে। রৌদ্র থেকে চারাগুলি রক্ষা করার জন্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে চারাগুলির প্রত্যেকটিকে একটি একটি করে কলাপাতা, শালপাতা, সেগুনপাতা কিম্বা অন্য কোন পাতার দ্বারা ঠোঙা তৈরি করে ঢাকা দিতে হবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আবরণ খুলে দিতে হবে (যেভাবে হাপরের চারাগুলিকে রক্ষা করা হয়েছে, সেই পদ্ধতি এখানেও অনুকরণ করতে হবে)। প্রয়োজন হলে দু'বেলা জলসেচন করতে হ'বে।

এইভাবে ৪/৫ দিনে চারাগুলি সতেজ হয়ে উঠলে, তখন আর রৌদ্রের তাপ থেকে তাদের রক্ষা করতে হ'বে না। কিন্তু যদি হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ চারাগুলিকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত

**চারার যত্ন ঃ** ক্রমশঃ চারাগুলি যখন একটু বড় হয়ে উঠবে, তখন ওদের চারপাশের মাটি কোদাল দিয়ে ওদের গোড়ায় টেনে দিতে হ'বে। এইভাবে বার কতক মাটি টেনে ওদের মূলদেশে দিতে হয় এবং আবশ্যকানুযায়ী জল সিঞ্চনের পর যো হ'লে গাছের গোড়া খুঁড়ে দিতে হয়।

**সারের পরিমাণ ঃ** কপি ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৫/৬ কুইণ্টাল সরিষার খইল দেওয়া উচিত। চারা বসানোর পর চারা গাছ পিছু অন্ততঃ ৫০—১০০ গ্রাম খইল দেওয়া উচিত। প্রত্যেকবার খইল দেবার পর জলসিঞ্চন ও তৎপূর্বে গাছের গোড়া খুঁড়ে মাটি সামান্য আল্‌গা করে দিতে হয়। কপি চাষে খইল ছাড়া নানা-প্রকার রাসায়নিক এবং মিশ্রসারের ব্যবহার করা যেতে পারে।

খইল পচিয়ে কিম্বা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ৩।৪ দিন রাখার পর তবে গাছের গোড়ায় দিতে হয়। তাল না বাঁধা অবধি মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন বুঝে জলসেচন ও মাটি খুঁড়ে দিতে হয়। জলাভাব হলে বাঁধাকপি ভালো জন্মে না। বাঁধাকপি আপনা আপনিই তাল বাঁধে, উহা জড়িয়ে দেওয়ার দরকার হয় না।

যখন বাঁধাকপি অর্ধেক তাল বাঁধে, সেই সময় প্রত্যেক গাছের গোড়া অল্পাধিক খুঁড়ে গর্ত করে শিকড় বার করে দিতে হয়। গাছ না পড়ে যায়, সেইভাবে গর্ত করতে হ'বে। কোদাল দ্বারা ঐ কার্য ভালোভাবে সম্পন্ন হয় না, এর জন্য ছোট **হাত আঁচড়া** বা **কর্ক** ব্যবহার করা উচিত।

তিন চার দিন ঐরূপ অবস্থায় রেখে গাছের শিকড়ে বাতাস লাগানোর পর চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিনে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় এক বা দু'মুঠা করে সরিষার খইল দিয়ে পূর্ববৎ মাটি চাপা দিতে হয় এবং ক্ষেত্র জলসেচ দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হ'বে। মনে রাখতে হবে যে, খইল দেবার সময় যেন কোন চারা গাছের গায়ে খইল না লাগে, কারণ চারার গায়ে খইল লাগলে গাছ মরে যাওয়ার সম্ভাবনা। ঠিক ঐরূপ ভাবে বাঁধাকপির চাষ করলে তা প্রকারে ভালো এবং আকারে বড় হবে।

## ফুলকপি

ফুলকপি চাষের প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ বাঁধাকপি চাষের মতই হ'বে। তবে বাড়তি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, এই চাষে বিঘা প্রতি ৮ কুইন্টাল সার দিতে হয়। চাষের প্রথম দিকে ৬ কুইন্ট্যাল, পরে চারার গোড়ায় ২ কুইন্ট্যাল সার দিতে হয়। ফুলকপি গাছে এক সময় সমস্ত ফুল ফুটে ওঠে বলে, উহা ফাঁক ফাঁক করে রোপণ করা একান্ত দরকার। এজন্য এককালীন সমস্ত চারা রোপণ করা উচিত নয়। প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু করে রোপণ করলে ভালো হয়।

## ওলকপি

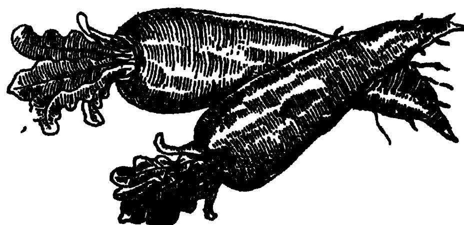
ওলকপির চাষ অবিকল বাঁধাকপি চাষের মত তবে প্রভেদের মধ্যে বিঘা



প্রতি ৪ কুইন্টাল খইল অথবা রাসায়নিক সার দিতে হয় এবং চাষের জমি অপেক্ষাকৃত গভীরভাবে কর্ষিত হওয়া উচিত।

## গাজর

গাজর বেলে মাটিতে ভালো জন্মে। চাষের জমি খুব গভীরভাবে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক এবং প্রতি বিঘায় ২ কুইন্টাল খইল ছড়িয়ে দিতে হয়। তার আগে



গামলায় চারা তৈরি করে নিয়ে ক্ষেত্রে বসানো অথবা এককালে ভূমিতে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে চাষ করলেও চলতে পারে। এর বীজ অতি সূক্ষ্ম, এজন্য বেশী বাতাসের সময় বপন করা ঠিক নয়। তাতে বাতাসে উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

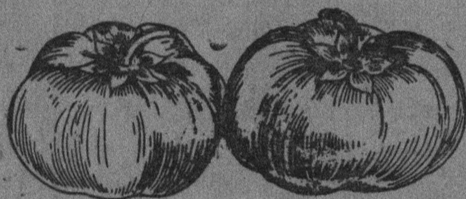
## শালগম

অপরাপর মাটি অপেক্ষা অধিক হালকা ও ঝুরা মাটিতেই শালগম চাষ করার নিয়ম। ভাদ্রমাসে প্রতি বিঘায় ৪০০ কেজি খইল ছড়িয়ে দিতে হয় এবং চাষের জমি কিছু গভীর করে কর্ষণ করে তাতে কিছু লবণজাতীয় সার মিশিয়ে দিলে শালগম ভালো জন্মে। গামলা বা হাপরের চারাগুলির যখন ৩।৪টি পাতা বার হ'বে, তখন সেগুলি তুলে ক্ষেত্রে রোপন করতে হবে। বীজ বপন কালে বীজের চারগুণ বালি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বুনলে ভালো হয় এবং গাছের মূলদেশের মাটি সময় সময় খুঁড়ে দেওয়া উচিত। হাপরে না বুনে পাতলা ভাবে এককালে ভূমিতে ছড়িয়ে দিয়েও শালগমের চাষ করা যায়।

## কয়েকটি মরসুমী সব্জী



শালগম



টমাটো



ফুলকপি



বাঁধাকপি

## বীট

বীটচাষে মাটি যতদূর সম্ভব গভীর, কর্ষণে ধূলোর মত করে নিতে হয়। বীটের বীজ রাত্রে ভিজিয়ে রেখে পরদিন বুনতে হয়। প্রয়োজন মত প্রত্যহ অল্প অল্প জল দিতে হয়। আর মধ্যে মধ্যে জলমিশ্রিত তরল সার প্রয়োগ করতে হয়।

## লঙ্কা

চৈত্র থেকে শ্রাবণ মাসের মধ্যে যে কোন সময় দেশী লঙ্কার বীজ বপন করা চলে। দেশী লঙ্কা বীজ সমতল প্রদেশে শ্রাবণ ভাদ্র থেকে শুরু করে আশ্বিন পর্যন্ত এবং পার্বত্য প্রদেশে চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বপন করা যায়।

লঙ্কা চাষের জন্য দোআঁশ বেলে মাটিই বিশেষ উপযোগী। চর জমিতে লঙ্কা ফলে ভালো। বেগুনের ন্যায় হাপরে বীজ ফেলে চারা তৈরি করে নিতে হয় এবং বিঘা প্রতি ২০০ গ্রাম বীজ আবশ্যক।

## আলু

**ইতিহাস**—সবজি-ফসলের অন্যতম আলু। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুরাজ্যে আলুর জন্মস্থান। শোনা যায় পোর্তুগীজরাই এদেশে আলুর আমদানি করেন। পৃথিবীর পাঁচ কোটি একর আলুচাষের জমির মধ্যে ভারতবর্ষেই ৬ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে আলুর আবাদ হয়।

**প্রকার বা জাতি ঃ** সাধারণতঃ আলুকে দুটি জাতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) **দার্জিলিং রেড্ রাউণ্ড** ও (২) **রঙবুল-৯**। এই দু' প্রকারের আলু ছাড়া, আরও ছ' প্রকারের আলু দেখা যায়। যেমন—(৩) **আপ্-টু-ডেট্** বা **নৈনিতাল** (৪) **রয়াল কিড্নি** বা **গৌহাটি** (৫) **ম্যাগনাম বোনাম্** বা **রেঙ্গুন**। ঐ সব উন্নত আলু ছাড়া আর একটি আলু আছে—নাম ঠিকরে আলু।

**মাটি (Soil) :** বিশেষ উর্বর মাটিই আলুর চাষের উপযোগী। কিঞ্চিৎ অম্ল, উর্বর দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিই আলুচাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। সেই সঙ্গে আবশ্যক জলসেচন ও জলনিকাশের সুবিধা।

**জমি প্রস্তুতকরণ :** আলু লাগাবার ৬/৮ সপ্তাহ পূর্বে জমির আগাছা পরিষ্কার করে, পর পর বেশ কয়েকবার লাঙ্গল দিয়ে মাটিকে ধূলোর মত করে নিতে হয়। তারপর গোবর সার, কম্পোষ্ট সার ও জৈব সার একত্রে বেশ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়।

**বীজবপনকাল :** উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে আলু বপন করার সময় মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে। নীচু পাহাড়ী এলাকার আলু বপনের সময় ডিসেম্বর থেকে

জানুয়ারী, আর সমতল ভূমিতে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরই আলু বপনের প্রকৃষ্ট সময়। আর জলদি জাতের আলু সেপ্টেম্বরে এবং নাবি জাতের আলুর বপন কাল ডিসেম্বরে।

**একর প্রতি বীজের পরিমাণ:** গোটা ও টুকরো আলু লাগানোর নিয়ম। জলদি-জাতের ছোট ছোট আলু গোটাই লাগানো হয়। আর নাবি জাতের আলু ৩/৫ টি টুকরো করেই লাগানোর নিয়ম। প্রতি টুকরোয় একাধিক চোখ থাকা দরকার। এই টুকরো আলুর ওজন ১ থেকে ১½ আউন্স বা ৩০ থেকে ৪৫ গ্রাম হওয়া উচিত। একর প্রতি ৬ থেকে ১০ মণ বা ২২৫ থেকে ৩৭৫ কিলোগ্রাম আলু লাগানো চলে। বপনের আগে অ্যাগালল নামক ওষুধে বীজগুলি শোধন করে নিলে ভালো হয়।

**বীজ বপন:** গাছের দূরত্ব বেশী হলে, গাছ প্রতি ফলন বেশী হয়। এইজন্য ৪০ সেণ্টিমিটার অন্তর ৯ ইঞ্চি বা ২২ সেণ্টিমিটার দূরে দূরে আলু লাগানো উচিত। তিন প্রকার পদ্ধতিতে আলু লাগানো হয়ে থাকে। যথা—(১) **মাটির উপর লাগানো (২) নালায় লাগানো** এবং (৩) গর্ত করে লাগানো। সাধারণতঃ জলদি ফসলের জন্য প্রথম পদ্ধতিতে আলু লাগানো হয়ে থাকে।

**সার-প্রয়োগ ও জলসেচন:** প্রচুর জৈব সার, গোবর সার, খৈল, কাঠের গুঁড়া ও কচুরীপানার কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করতে হয়। একর প্রতি আলুর জমিতে ২০/৩০ গাড়ী কম্পোষ্ট সার দিলে ভালো। মাটি যাতে সর্বদা আর্দ্র থাকে সেজন্য জলসেচ করা উচিত। সাধারণত ৭/৮ টি সেচের দরকার হয়। আলু সম্পূর্ণ পরিপক্ক হলেই ওঠানো উচিত।

**কীট পতঙ্গ ও রোগ:** আলুর প্রধান শত্রু নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ ও রোগ। কাটুই পোকা, সুতলী পোকা, ঘুরঘুরে পোকা, ইত্যাদি কীটপতঙ্গ আলুর শত্রু। ইহা ছাড়া জলদি ধসা রোগ, নাবি ধসা রোগ ইত্যাদি রোগেও আলুর অনেক ক্ষতি হয়। সময় মত কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করলে এই রোগের প্রতিকার করা যেতে পারে।

**সংরক্ষণ ও গোলাজাতকরণ**—আলু সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় হল হিমগুদামে আলু রাখা। হিমগুদামে আলু রাখলে শতকরা ৫ ভাগের বেশী আলু নষ্ট হয় না।

## বেগুন

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজতলাতে বীজ বপন করতে হয়। ৭/৮ দিন পরে চারা বের হয়। ঐ সময় বীজতলাতে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে দিতে হবে। এক মাসের মধ্যেই বীজতলার চারা বড় হয়ে ওঠে। চারা বসাবার আগে খইল সার বা মিশ্র-

সার দিয়ে মাটি তৈরী করে রাখতে হবে। চারাগুলো ১০—১২ সেন্টিমিটার বড় হলে তাদের তুলে এনে সারি দিয়ে জমিতে ৮০/৯০ সেন্টিমিটার অন্তর পুঁতে দিতে হবে। পোঁতার পর প্রথম ৪/৫ দিন চারাগুলো সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য দিনের বেলায় কাগজের ঠোঙা কিম্বা কলাগাছের খোলা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। রাত্রে ঢাকা খুলে দিতে হবে। ৩/৪ দিন অন্তর অন্তর বেগুনগাছে জল দিতে হবে। এইভাবে গাছ ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠলে ৩০।৪০ দিন পরে আবার একবার সার দিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে ভাঁটি টেনে দিতে হবে। বেগুন গাছে অনেক সময় পোকা ধরে। গাছের পাতাগুলো পোকাতে খেয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়। ঐ সময় ঘুঁটের ছাইয়ের সঙ্গে কিছু কেরোসিন তেল মিশিয়ে পাতার উপর ছড়িয়ে দিলে পোকা মরে। এ'ছাড়া আর এক রকম হলদে পোকাও বেগুন গাছে দেখা যায়। ফলিডল নামক কীটনাশক ঔষধ ছিটিয়ে দিয়ে এই পোকা দমন করা যায়। অনেক সময় বেগুন গাছের কাণ্ডের ভিতরেও পোকা ধরে, তার জন্য সময়মত ঔষধ প্রয়োগ করলে পোকার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বেগুনের চাষ বেশী হয়। ভাল জাতের বেগুন যথা—মাকড়া বেগুন, বাকসীর বেগুন কার্তিক মাস থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত প্রচুর ফলন দেয় এবং আকারেও বড় হয়। শীতকালে বেগুনের ফলন বেশী হলেও সারা বছর অল্পবিস্তর বেগুন পাওয়া যায়।

## সবজি রোগ ও তার প্রতিকার

১। **আলু:** আলুচাষে বীজতলা, চারা তৈরি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার কোন দরকার হয় না। আলুর চোখগুলো কিছু শাঁস সমেত বসালেই গাছ বার হয়। আলু চাষে প্রচুর সার, সরিষার খইল, মাটির আল ও প্রচুর জল সেচের প্রয়োজন হয়।

**আলুর রোগ ও তার প্রতিকার:** আলুর উপর বীজবাহিত রোগ দমনের জন্য ১০০ গ্রাম আরেটন ট্যাকাসন বা অ্যাগালাল জাতীয় ঔষধ ৪ টিন জলে গুলে ১॥ কুইণ্টাল (৪ মণ) বীজ আলু ১ মিনিট কাল ডুবিয়ে শোধন করে নিয়ে লাগাতে হয়। গাছ ৮।৯ ইঞ্চি পরিমাণ হ'লে একবার এবং তার ২১ দিন পরে আর একবার ব্লাইটক্স জাতীয় তাম্রঘটিত ওষুধ ৬০ গ্রাম ১ টিন জলে গুলে নিয়ে স্প্রে করলে ধসা-রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। রোগের আক্রমণ হলে আরও ১।২ বার স্প্রে করা দরকার হতে পারে।

২। **ফুলকপি-বাঁধাকপি ও মুলাবীজ:** একভাগ এগ্রোসান জাতীয় ওষুধ ২৫ ভাগ বীজের সঙ্গে ভালোভাবে মাখিয়ে বীজতলায় বুনতে হয়। পরে চলে

পড়া রোগ দেখা দিলে ১ থেকে ১॥ কেজি ক্যাপটান জাতীয় ওষুধ ১০০ গ্যালন জলে গুলে নিয়ে বীজতলায় স্প্রে করে ছড়িয়ে দিতে হ'বে, যাতে চারাগাছগুলোর নীচে মাটির ভিতর ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারে।

৩। **শিম ও বরবটি :** দাগ ধরা বীজ বেছে ফেলে দিয়ে ভালো বীজ ১ ভাগ পারাঘটিত ওষুধ ৩০০ ভাগ বীজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে বুনতে হয়। গাছে রোগ দেখা দিলে, নার্শারী মিকশ্চার দরকার মত ছিটিয়ে দিতে হ'বে।

৪। **বেগুন :** কুটেধরা বা ঝুলসে মারা রোগে আক্রান্ত গাছগুলো তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হ'বে। চলে গড়া রোগের জন্য পূর্ব বর্ণিত ক্যাপটান ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫। **পিঁয়াজ :** ৩০ ভাগ বীজের সঙ্গে ১ ভাগ পারাঘটিত ওষুধ ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে বুনতে হবে। গাছ বড় হ'লে ২।৩ বার তামাঘটিত ( Copper Oxychloride ) ওষুধ ২ কেজি ১০০ গ্যালন জলে গুলে নিয়ে ২১ দিন অন্তর স্প্রে করতে হ'বে।

৬। **বিলাতী বেগুন :** বিলাতী বেগুন বা টম্যাটোর নানা প্রকার রোগ হয়ে থাকে। তার প্রতিকার মোটামুটি ফুলকপির মত। তবে কুটে ধরা রোগ দেখা দিলে গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হ'বে। মনে রাখতে হবে যে কীটনাশক ওষুধগুলি খুবই বিষাক্ত, কাজেই উহা ব্যবহারের সময় বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হ'বে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### উদ্যান-কর্ষণ বিদ্যা ( Horticulture )

**ভূমিকা :** ইংরাজী হর্টিকালচার কথাটির বাংলা হ'লো উদ্যান-কর্ষণ-বিদ্যা। অর্থাৎ উদ্যান-চর্চার মাধ্যমে এমন কিছু একটা করা, যার দ্বারা বাগিচা-শিল্পের উৎকর্ষ ঘটে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। জাপানের উদ্যান-বিশেষজ্ঞরা গাছ-গাছালী নিয়ে কত বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। সেই সব গবেষণার ফলাফলের কথা শুনলে উপকথা বলে মনে হ'বে। ওদেশে টবের বাগানে হাজার রকম কাঁটা গাছের শঙ্কর চেহারার ভিড় জমেছে।

দৈত্যের মত বিরাট একটা গাছকে তারা রূপান্তরিত করেছে ক্ষুদে বামন অবতারে। সুপ্রাচীনকালেই নাকি এ বিদ্যা তাদের আয়ত্তে ছিল। শোনা যায় জাপানের কোন এক উদ্যানে টবে রোপিত এমন একটি বিঘত খানিকের কাঁটা গাছ আছে, যার বয়সের গাছপাথর নেই। এই এক রত্তি কাঁটা গাছটা বয়সে নাকি গৌতম-বুদ্ধের সমবয়েসী হ'বে। আমাদের দেশে অবশ্য এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন গবেষণা হয়নি বল্লেই চলে।

অথচ গাছপালার নাড়ী নক্ষত্রের খবর আর্য ঋষিদের আগে কেউ জানতেন না। আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা বিশ্বাস করতেন যে, গাছপালারও প্রাণ আছে—তারা মোটেই জড় পদার্থ নয়। সেইজন্য তাঁরা মন্ত্রোচ্চারণ করে পুষ্প-পত্র চয়ন করতেন। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষদেবতার পূজা করতেন। সেটা যে অনুমান মাত্র নয়, জীবন্ত সত্য, তা হাতে-কলমে প্রমাণ করলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র-বসু। স্বহস্তে নির্মিত ক্রেস্‌কোগ্রাফ্ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখালেন—কেমন করে একটি চারাগাছ বৃদ্ধি পায়, শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। দিব্যি কেমন আহার গ্রহণ করে আবার বিদ্যুৎ-প্রয়োগের উত্তেজনায় কম্পিত হয়। এই প্রাচীন ঐতিহ্য ও ভারতীয় আদর্শ স্মরণ করেই গদ গদ হলে চলবে না, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এই নিয়ে আবার নূতন ভাবনা-ভাবের উদয় হোক। অন্ততঃপক্ষে উদ্যান-বিদ্যার চর্চা হোক—এটাই বোধ হয় নব প্রবর্তিত পাঠ্যসূচীর অন্তর্নিহিত সংকেত।

এই উদ্যান-কর্ষণ-বিদ্যা কৃষিবিদ্যার একটি শাখা, যার প্রয়োগ ফুল ও ফল বাগিচায় সীমাবদ্ধ। এখানে আমরা সেই বাগানের অঙ্গ যে গাছ, আর সেই বাগিচার ঐশ্বর্য যে ফুল, সেই সম্পর্কে আলোচনা করবো। এসম্পর্কে বেশ কিছু দিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার নিদর্শন শান্তিনিকেতনের উদয়ন ভবনের উদ্যানে আজও বিদ্যমান।

**ফুলের চাষ ও পরিচর্যা:** মরশুমী ফুলই বাগানের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য বজায় রাখে। বৎসরে তিন বার মরশুমী ফুলের চাষ হয়ে থাকে। ফুল প্রস্ফুটিত হওয়ার সময়ের পার্থক্য অনুসারে মরশুমী ফুলকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **শীতের মরশুমী ফুল**—এই জাতীয় ফুলগুলি শীতকালে ফোটে এবং বসন্তকালে মরে যায়। (২) **গ্রীষ্মের মরশুমী ফুল**—এই জাতীয় ফুলগুলি গ্রীষ্মকালে ফোটে। গ্রীষ্মকালীন ফুলের সংখ্যা নিতান্ত কম। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য দুটি ফুল। যথা—**পর্টুলেকা ও বেঁটে জাতের ক্যালিওপ্‌সিস্।** (৩) **বর্ষার মরশুমী ফুল**—এই জাতীয় ফুলগুলি বর্ষাকালে

প্রস্ফুটিত হয় এবং শরৎকালে ঝরে যায়। অবশ্য ঐসব মরশুমী ফুলের অতিরিক্ত যত্ন ও পরিচর্যা করলে, ওদের পুষ্প-প্রদানের কাল বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

**মরশুমী ফুল ঃ** মরশুমী ফুলের মধ্যে **কারন্যাশন** ( Carnation ), **মেরি-গোল্ড** ( Marigold ), **ফ্লক্স** ( Phlox ), **পর্টুলেকা** ( Portulaxca ), **সুইট পি** (Sweet Peas), **ডালিয়া** (Dahlia), **ডায়েন্থাস বা পিঙ্ক** (Dianthus or Pink), **হোলিহক** (Hollyhock), **পপি** (Poppy), **সূর্যমুখী** (Sunflower), **দোপাটি** (Balsam) **জিনিয়া** (Zinnia), **সূর্যমণি** (Pentapetes), **সিনেরেরিয়া** ( Ceneraria ), **চন্দ্রমল্লিকা** (Chnysanthemum) প্রভৃতি বিখ্যাত। এদের মধ্যে কিছু জাতি আছে, যাদের ফুল একটু দেরিতে হয়। যদি সময় মত বীজ ফেলা হয়, তবে ঠিক শীতের সময় ফুল পাওয়া যাবে। শীতের মরশুমী ফুলের মধ্যে ডালিয়া ফুলের নাম বিশেষভাবে করা চলে। কারণ কত বিচিত্র বর্ণ ও আকারের ডালিয়া ফুল ফোটে শীতকালে। যদিও শীত ছাড়া এর ফুল খুব ভালো হয় না, তবুও এই ফুলের গাছ সারা বৎসর নানারকম ভারে রাখা যেতে পারে।

**কারন্যাশন** ( Carnation ) **:** প্রথমে কারন্যাশন ফুল সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আগস্ট মাসে এই ফুলের বীজ ফেলতে হয়। এ ফুলের মাটি হ'বে—হালকা দোঁআঁশ মাটি। এর চারা যখন বীজ থেকে বার হ'বে, তখন মাটিতে কিছু পাতা পচা সার মিশিয়ে তার উপর পাতলা করে ছিটিয়ে দিতে হ'বে। ষ্টোক ( Stock ) ইত্যাদি ফুল এইভাবে করতে হয়।

**মেরিগোল্ড বা গাঁদা** ( Marigold ) **:** আমাদের দেশে অনাদিকাল থেকে গাঁদা ফুলের চাষ হয়ে আসছে। খুব বড় হল্‌দে রঙের ফুলের জন্য গাঁদাফুল বিখ্যাত। এ ফুল থাবা ( ডবল্ ) ও একচেটে ( সিঙ্গল্ ) হয়। একচেটে অপেক্ষা থাবা বা থোকা গাঁদার কদর বেশী। বীজ ও ডাল থেকে গাঁদার চারা তৈরি করা যায়। মনে রাখতে হবে যে, থাবা গাঁদার ফুলের অপক্ক বীজ থেকে চারা প্রস্তুত করলে, অনেক সময় একচেটে বা ছোট আকৃতির ফুল হয়। গাছের ডাল কেটে রোপণ করলে, আকারে বড় ফুল পাওয়া যায়। এ ফুল হলদে, লাল, প্রভৃতি রঙের হ'য়ে থাকে। তন্মধ্যে হল্‌দে রঙের ফুলই বেশী প্রচলিত। সমতল অঞ্চলে আগস্ট মাসে গাছের চারা রোপণ করতে হয়। ইহা শীতের ফুল। পার্বত্য অঞ্চলে জুন মাসে চারা রোপণ করতে হয়। বহু জাতের গাঁদা আছে। তন্মধ্যে **আফ্রিকান মেরিগোল্ড** ও **ফ্রেঞ্চ মেরিগোল্ড**—এই দু' জাতের ফুলই বিশেষ সমাদৃত। এই আফ্রিকান জাতীয় গাছ ও ফুল—উভয়েই আকারে বেশ বড় হয়। ফ্রেঞ্চ

জাতের গাছ যেমন একটু বেঁটে, এর ফুলও তেমনি ছোট হয়। ফ্রেঞ্চ গাঁদা একবার কোন স্থানে রোপণ করলে, সেখানে বীজ পড়ে প্রতি বৎসর চারা জন্মায়। গাঁদা ফুলের বিশেষ যত্ন বা সারের প্রয়োজন হয় না। যেমন তেমন করে একটু মাটি কুপিয়ে লাগালেই গাঁদা ফুল হয়।

**ফ্লক্স (Phlox):** এই গাছের উচ্চতা ৯″—১০″ বা ২৩—২৫ সেন্টিমিটার হয়। এ ফুল আকারে ছোট, কিন্তু বিভিন্ন রঙের হয়। এই ফুল দেখতে অতীব সুন্দর এবং গুচ্ছাকারে ফোটে। উদ্যানের চারধারে, কেয়ারীতে অথবা টবে এ ফুলের চাষ করা চলে। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে বীজ বপন করলে, মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল পাওয়া যায়। জানুয়ারী মাসে টবে বা গামলায় বীজ বপন করে বারান্দায় রাখলে, জুন-জুলাই মাসে ফুল ফুটে বারান্দা আলো করে। গামলা বা বীজতলায় বীজ বপন করার পর চারা ২″ ইঞ্চি বা ৫ সেন্টিমিটার লম্বা হলেই, তুলে অন্যত্র স্থায়িভাবে রোপণ করতে হয়। উর্বর দোআঁশ মাটি এ ফুল-চাষের বিশেষ উপযোগী।

**পর্টুলেকা (Portulacca):** এই গাছের উচ্চতা ৬″—৭″ ইঞ্চি বা ১৫ থেকে ১৮ সেন্টিমিটার হয়। এইগাছ মাটিতে লতিয়ে থাকে। এর ফুল একচেটে বা থাবা এবং নানা রঙের হয়। দিবাভাগে বেলা প্রায় ১০টার পর এই ফুল ফোটে এবং বেলা ২টার সময় গুটিয়ে যায়। এই ফুল ফুটলে বাগান খুব সুন্দর দেখায়। সমতল অঞ্চলে অক্টোবর মাসে এবং পাহাড়ী অঞ্চলে মার্চ মাসে এই ফুলের বীজ বুনতে হয়। বীজ খুব ছোট হওয়ায়, সরু বালির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ছোট ছোট গোলাকার কেয়ারীতে অথবা টব বা গামলায় স্থায়িভাবে বপন করা যায়। ইচ্ছে করলে সারা বৎসরই এর চারা করা যায়। এর ডাল কেটে রোপণ করলেও, চারা উৎপন্ন হয়। প্রচুর রৌদ্রযুক্ত উর্বর দোআঁশ মাটিতে এই ফুলের চাষ ভালো হয়।

**সুইট্-পি (Sweet Peas)** এই গাছের উচ্চতা ৪′—৮′ ফুট বা ১২০—২৪০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এটি লতা জাতীয় একটি মরশুমী ফুল। সাদা, নীল, হলদে, বেগুনী, গোলাপী প্রভৃতি নানারঙের সুইট-পি আছে। এর ফুল সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত। এ গাছ অনেকটা মটর গাছের মত। সমতল অঞ্চলে অক্টোবর মাসে এবং পার্বত্য অঞ্চলে মার্চ মাসে এর বীজ বপন করতে হয়। উর্বর দোআঁশ মাটি সুইট-পি চাষের বিশেষ উপযোগী। এদের বর্ডারে বপন করতে হয়। বর্ডারে ১″ ইঞ্চি বা ২৫ মিলি-মিটার অন্তর সারিতে বীজ বপন করলেই চলবে।

তারপর গাছ যখন ৬″ ইঞ্চি বা ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা হয়, তখন কঞ্চি অথবা পাট কাঠি পুঁতে গাছ তুলে দিতে হ'বে।

**ডালিয়া (Dahlia) :** এবার ডালিয়া ফুলের চাষ কিভাবে করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। বহু রকমের ডালিয়া ফুল দেখা যায়। যেমন—**ক্রয়ডন** (Croydon), **মাষ্টারপিস** (Masterpiece), **ব্লাকআউট** (Blackout), **য়্যাক্সফোর্ড** (Axford), **ট্রাইম্প্** (Tramph), **বারবারা** (Barbara), **মারশেল** (Marshail) ইত্যাদি। ডালিয়া ফুল আর তিন রকমের হয়ে থাকে। যেমন—বড় জাতীয়, পম্পম জাতীয়, ক্যাকটাস জাতীয়।

**চাষের রীতি :** ডালিয়ার চাষ জমিতে বা টবে—দুইভাবেই করা চলে। জমিতে চাষ করতে হলে বর্ষাকাল থেকেই জমি তৈরি করতে হ'বে। বর্ষাকালে জমি কোপাবার পর তদুপরি কাঁচা গোবর অথবা পুরাতন গোবর ছড়িয়ে দিয়ে কিছুদিন বৃষ্টির জল খাওয়ানোর পর তার সঙ্গে সুপার ফস্‌ফেট্ সার মিশিয়ে ফেলে রাখতে হ'বে।

তারপর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি অথবা প্রথমে ঐ তৈরি জমির উপর চারা লাগাতে হ'বে। চারা লাগানোর সময় বিকেল বেলা এবং তিন দিন এই চারা গাছগুলিকে ঢাকা রাখতে হ'বে। ডালিয়া ফুলের খুব কদর, সকলেই পছন্দ করে। ডালিয়া গাছও খুব জল পছন্দ করে। সেইজন্য ডালিয়া গাছে রোজ প্রচুর পরিমাণে জল দিতে হয়।

**পরিচর্যা :** ডালিয়া গাছ যখন এক হাত থেকে দেড় হাত লম্বা হ'বে, তখন গাছে সার দিতে হ'বে। সরিষার খইল, সুপার ফসফেট্ সার, রক্তের সার, মাছের সার ও হাড়ের গুঁড়া একসঙ্গে মিশিয়ে একমুঠো করে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় খুঁড়ে দেওয়া উচিত। সার দেবার পর পর সাধারণ মাটি ঐ সারের উপর চাপিয়ে দিতে হবে। তারপর ১৫ দিন অন্তর সামান্য করে চুণের জল গাছের গোড়ায় দিলে খুব ভালো হয়। দুদিনের পচানো সরিষার খইল, পনের দিনের পচানো মাছের সার, দুমাসের পচানো রক্তের সার—এই সব যোগাড় করার পর এক বালতি সাদা জলে ২৫০ গ্রাম পরিমাণ সরিষার খৈলের জল, ১২৫ গ্রাম পরিমাণ রক্তের সারের জল ও ১২৫ গ্রাম পরিমাণ মাছের সারের জল একসঙ্গে মিশিয়ে বড় গাছের গোড়ায় এক মগ ও ছোট গাছের গোড়ায় আধ মগ করে প্রতিদিন দিতে হ'বে। গাছে কুঁড়ি আসার পর এক চামচ করে পটাশ সার দিলে ভালো হয়। এইভাবে জমিতে ডালিয়ার চাষ করা যায়। টবেও ঠিক ঐ একইভাবে সার দেবার ব্যবস্থাদি করতে হবে। পুরোনো গোবর সার এবং বারো আনা পরিমাণ বেলে দোআঁশ মাটি এই চাষের উপযোগী।

এইভাবে ডালিয়ার চাষ করলে ফুল বড় ও বেশী পাওয়া যাবে।

**রোগ ও প্রতিকার:** সাধারণতঃ পাতা কুঁকড়ে যাওয়া ধরণের এক রোগ ডালিয়া গাছের হয়। এ এই রোগ দেখা দিলেই কীটনাশক ফলিডিন ওষুধ ছিটিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। তবে এ বিষয়ে কোন কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াটাই সমীচীন। এইগাছে সবুজ রঙের পোকার উপদ্রব দেখা যায়। এই পোকার আক্রমণে প্রথমে তামাক জল, ডি. ডি. টি, গ্যামাক্সিন প্রভৃতি ওষুধ ছিটিয়ে দিলে ঐ পোকা মরে যায়।

**সংরক্ষণ:**—গাছের ফুল দেওয়া শেষ হলেই, নির্বাচিত গাছের গোড়া খুঁড়ে স্ফীত কন্দ তুলে, এপ্রিল মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে পারলে ভালো হয়। স্ফীত কন্দগুলি বীজাগারে রাখা উচিত; কারণ জল বা বেশী ঠাণ্ডা লাগলে, ওগুলো পচে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই স্ফীত কন্দগুলি ঠাণ্ডা ও জল থেকে সাবধানে রাখা উচিত।

**ডায়েন্থাস্ বা পিঙ্ক (Dianthus or Pink):** শীতকালীন ফুলের মধ্যে এটিই খুবই সুন্দর ফুল। যদিও এরা বহুবর্ষজীবী, তথাপি আমাদের দেশে মরশুমী ফুল হিসাবে এর চাষ হয়ে থাকে। আর চাষ করাটাও খুব সহজ। থাবা বা একচেটে—এই দু' ধরণেরই এ ফুল হয়। ডায়েন্থাসের **জাপানীজ পিঙ্ক** ও **চায়না পিঙ্ক**—এই দু'টি জাত আছে। জাপানীজ পিঙ্ক ফুলের পাপড়ির প্রান্তভাগ কোঁকড়ানো এবং দেখতে ঝালোরের মত। বেদিকায় এক সঙ্গে অনেক ফুল ফুটলে উদ্যান-পরিবেশের শোভা বাড়ে। গাছের ফুল-ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হ'লে, বীজ ধরার পূর্বেই ফুলগুলি তুলে ফেলতে হয়। সমতল অঞ্চলে অক্টোবর মাসে আর পাহাড়ী এলাকায় মার্চ মাসে এই ফুলের বীজ বপন করতে হয়।

**হোলিহক (Hollyhock):** এইসব ফুলগাছের উচ্চতা ৮—১০ ফুট বা প্রায় ২.৪—৩ মিটার হয়। থাবা ও একচেটে—দু'জাতের দেখা যায়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই এর চাষ করা চলে। ফুলগুলিও দেখতে খুব সুন্দর। উদ্যান বেদিকায় একত্রে না লাগিয়ে, লম্বা সারিতে লাগালে বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। সমতল অঞ্চলে অক্টোবর মাসে এবং পার্বত্য অঞ্চলে মার্চ মাসে বীজ বপন করতে হয়। পুণাতে বর্ষা আরম্ভ হওয়ার সময় অর্থাৎ জুন মাসে একবার এবং বর্ষাশেষে পুনরায় বীজ বোনা হয়। জমিতে প্রচুর সার প্রয়োগ করে চারাগুলি রোপণ করতে হয়। বীজতলায় চারা একটু বড় হলেই, সেগুলি তুলে এনে পরিকল্পনা অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে উদ্যানে স্থায়িভাবে রোপণ করতে হয়।

**পপি (Poppy):** পপি একটি অতীব সুন্দর ফুল। এই ফুল ফুটে বাগান আলো করে থাকে; এফুলে মধু বা গন্ধ নেই, তবে প্রচুর পরাগ থাকে। এই ফুলের পরাগ সংগ্রহের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি আসে। পপি থাবা বা এক-চেটে—দু' জাতেরই হয়। হাল্‌কা বেলে-দোআঁশ মাটিই পপি চাষের উপযোগী। সমতল অঞ্চলে, পার্বত্য এলাকায় মার্চ মাসে এর বীজ বপন করতে হয়। যেহেতু এফুলের গাছ তুলে লাগানো যায় না, এই কারণে পপির বীজ স্থায়িভাবে জমিতেই বপন করতে হয়। বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী পপি দেখা যায়। অনেক জাতও আছে। যেমন—**ফ্রেঞ্চ, ক্যালিফোর্ণিয়ান** প্রভৃতি। **আইসল্যাণ্ড** ও **সালি**—এ দুটিই ফ্রেঞ্চ পপির অন্তর্গত। এদের পাতা কাঁটা কাঁটা এবং ফুলের বোঁটা রোমযুক্ত। এই পপি বিভিন্ন রঙের ও গঠনের (যেমন—থাবা ও একচেটে) হয়ে থাকে। ক্যালিফোর্ণিয়ান পপির গাছ অপেক্ষাকৃত বড়। এর পাতাও কাটা কাটা। এ গাছে উজ্জ্বল বড় হলদে রঙে ফুল ফোটে। পশ্চিমবঙ্গে এই জাতের পপির চাষ বিশেষ প্রচলিত নয়, ফ্রেঞ্চ পপিরই আবাদ বেশী। পিঁপড়েই এদের বড় শত্রু।

**সূর্যমুখী (Sunflower):** এই মরশুমী ফুলটি ভারতের সর্বত্রই সুপরিচিত। প্রধানতঃ বর্ষার ফুল হলেও, অন্যান্য ঋতুতেও জন্মে থাকে। শীতকালে এক প্রকার ছোট জাতের সূর্যমুখী ফুল ফোটে। সূর্যমুখীর ছোট, মাঝারি, অতি বৃহৎ একচেটে ও থাবা ফুল আছে। এই ফুলের অসংখ্য জাতের মধ্যে **গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাস, প্লেনিসিমাস্‌** এবং **ক্যালিফোরুনিকাস্‌** নামক জাত দুটির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত জাতের গাছে প্রচুর ফুল উৎপন্ন হয় এবং শেষোক্ত জাতের গাছে ফুল খুব বড় হয়। এছাড়া **আর্কেণ্টাস্‌ আরজিরোফাইলাস্‌** প্রভৃতি জাতের গাছের পাতার রঙ রূপোর মত সাদা হয়। আবার **ম্যাক্রোফাইলাস্‌** নামক জাতের গাছের পাতা খুব বড় এবং গাঢ় সবুজ রঙের হয়। **ইউনিফ্লোরাস** নামক গাছের আকার খুব বড় হয়। অন্য জাতের গাছ ৩—৬ ফুট বা ৯০—১৮০ সেণ্টিমিটার অবধি লম্বা হতে দেখা যায়। কেউ কেউ বড় আকারের সূর্যমুখীকে রাধাপদ্ম বলে থাকেন।

এই ফুল চাষ করাও সহজ। যে কোন মাটিতেই জন্মায়। সামান্য একটু যত্ন ও পরিচর্যা করলেই চলে। পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলে জুলাই মাসে এই ফুলের বীজ বপন করতে হয়। চারা একটু বড় হলে তুলে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে লাগালে সুন্দর দেখায়। গাছ একটু বড় হলে, কাঠি দিয়ে বেঁধে দেওয়া ছাড়া আর কোন যত্নই করতে হয় না। সূর্যমুখীর দানা থেকে রান্নার তেল বের করার চেষ্টা চলছে।

**দোপাটি (Balsam):** দোপাটি একটি অতি পরিচিত শরৎকালের ফুল।

## কয়েকটি মরসুমী ফুলের চিত্র



ডালিয়া



গোলাপ



রজনীগন্ধা



দোপাটি



গাঁদা



সর্যমখী



চন্দ্রমল্লিকা



জুঁই

এগাছের উচ্চতা ১½—২ ফুট বা ৪৫—৬০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এ গাছের কাণ্ড নরম ও গাছ বেশ ঝাড়যুক্ত হয়। কোন স্থানে একবার এই ফুলের চাষ করলে, সেই স্থানে বীজ পড়ে প্রতি বৎসরই বর্ষার সময় চারা বার হয়। দু রকমের দোপাটি—থাবা ও একচেটে হয়ে থাকে। দোপাটি বর্ডারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। টবে অথবা গোলাকার, চৌকোণা পুষ্প বেদিকায় চাষ করলে সুন্দর দেখায়। হাল্কা উর্বর দো-আঁশ মাটিতে ভালো জন্মে। সমতল অঞ্চলে জুন মাসে বীজ বপন করলে বর্ষায় ক্ষতি হয়। ফুলও ভালো হয় না। সেইজন্য সেপ্টেম্বর মাসে এই গাছের চারা প্রস্তুত করতে হয়। তা'হলে বর্ষাশেষে শরৎকালে এগাছে প্রচুর ফুল পাওয়া যায়। পার্বত্য অঞ্চলে মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ বপন করতে হয়।

উদ্যান-বেদিকায় ও বর্ডারে ১ ফুট বা ৩০ সেন্টিমিটার অন্তর চারা রোপণ করতে হয়। দোপাটিগুটি সম্পূর্ণরূপে পেকে উঠলে, বীজ আপনা থেকে ঝরে পড়ে। সেইজন্য গুটি পাকবার আগেই বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

জিনিয়া ( Zinnia ): মরশুমী ফুলের মধ্যে জিনিয়া একটি মূল্যবান ও সুন্দর ফুল। ডালিয়ার মত ইহাও উদ্যানিকদের অতি প্রিয় ফুল। এক স্থানে একবার এফুলের চাষ করলে, সেখানে বীজ পড়ে ফি-বছরই চারা উৎপন্ন হয়। এফুলের গাছ আকারে ৩—৪ ফুট বা ৯০—১২০ সেন্টিমিটার উঁচু হয়ে থাকে। গাছে ডালের সংখ্যা বড় কম হয়। বর্ষাকালীন ফুল হলেও, শীতকালে এর চাষ করা চলে। এফুল নানা বর্ণের থাবা ও একচেটে হয়ে থাকে। এমন বড় জাতের থাবা জিনিয়া আছে যেগুলির ফুল ডালিয়ার মত বড় হয়। বীজ বপনের সময়—সমতল পার্বত্য অঞ্চলে জুন মাসের মাঝামাঝি টবে বা গামলায় বীজ বপন করে চারা তৈরি করে নিতে হয়।

জলবসা ভিজে মাটিতে জিনিয়া ভালো হয় না। অত্যধিক বৃষ্টিতে এগাছের পাতা কুঁকড়ে যায় এবং ফুল ছোট হয়। ভালো ও বড় আকারের ফুল পেতে হ'লে, গাছে গোবর সার, আবর্জনা সার বা পাতা-পচা সার, খৈল, হাড় গুঁড়া, সুপার ফস্‌ফেট প্রভৃতি প্রয়োগ করতে হয়। উর্বর দো-আঁশ মাটি জিনিয়া চাষের উপযোগী।

সূর্যমণি ( Pentapetes ): ইহা দুপুরে মণি নামেই সমধিক পরিচিত। কারণ ঠিক দুপুর বেলায় সূর্যমণি ফুল ফোটে। সাধারণতঃ লাল ও সাদা রঙের ছোট ছোট ফুল দেখা যায়। এফুলের চাষ অতি সহজ সাধারণ। মাটি কুপিয়ে বীজ ছড়িয়ে দিলেই এই গাছ জন্মায়। এও শরৎকালের ফুল। শুকনো দো-আঁশ মাটিতেই ভালো হয়।

**মর্ণিং গ্লোরি ( Morning glory ) ঃ** এ ফুলের আদি জন্মস্থান মেক্সিকো। একপ্রকার লতাজাতীয় বহুবর্ষজীবী গাছ। বর্ষজীবী হিসাবেও এর চাষ হয়ে থাকে। এজন্য গাছের ফুল দেওয়া শেষ হলেই গাছটা তুলে ফেলতে হয়, নতুবা পুরাতন গাছে ভালো ফুল হয় না। গাছের পাতা খুব বড়, চক্‌চকে, গাঢ় সবুজ রঙের। দেখতে অনেকটা পান পাতার মত। জাফরী, থাম প্রভৃতির উপর তুলে দিলে খুব সুন্দর দেখায়। জুন-জুলাই মাসে বীজ বপন করতে হয়। তা'হলে শীতকালের মধ্যে গাছটা বেশ বড় হতে পারে। সমগ্র শীতকাল ধরেই নীল কলমী ফুলের মত অসংখ্য ফুল ফোটে। শুকানোর সময় ঈষৎ লাল দেখায়।

এই ফুল-চাষের জন্য বিশেষ উর্বর জমির আবশ্যক হয় না। তবে প্রতি বৎসর এক স্থানে চাষ না করে স্থান বদল করতে হয়। তা না হলে ভালো গাছ উৎপন্ন হয় না। সাদা রঙেও মর্ণিং গ্লোরি ফুল হয়। তা দেখতে তত সুন্দর নয়।

**সিনেরেরিয়া ( Ceneraria ) :** এই গাছ সাধারণতঃ ঠাণ্ডাতে হয়। অর্থাৎ ছায়া আছে—এমন স্থানেই ভালো জন্মে। এর চারা তৈরি করাটা ঠিক কারনেশন ফুলের মত। তবে এই গাছ ঘোড়ার সার খুব পছন্দ করে। ঘোড়ার সার, গোবরের সারের মত করে তৈরি করতে হয়।

**পিটুনিয়া ( Petunia ) ঃ** এই জাতীয় ফুল দু'রকমের হয়। থাবা ও একচেটে। এর বীজ আগষ্ট মাসে জমিতে লাগাতে হয়। বেলে দো-আঁশ মাটি এই চাষের উপযুক্ত। চালুনি দিয়ে মাটি চেলে নিতে পারলে খুব ভালো হয়। কারণ এর বীজ খুব মিহি। এর চারা বীজ থেকে বার হবার মুখে খুব সাবধানে জল ও সাদা মাটি, পাতাপচা সার এবং সামান্য বালি মিশিয়ে পাতলা করে ঐ চারার উপর ছড়িয়ে দিতে হয়।

**চন্দ্রমল্লিকা ( Chaysanthimum ) ঃ** বিবিধ ধরণের মরশুমী ফুলের মধ্যে বর্ণ বৈচিত্র্যে, আকার সৌষ্ঠবে চন্দ্রমল্লিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এফুল সকলেরই সুপরিচিত। টবে বা উদ্যানে এর চাষ হয়ে থাকে। বাগানে চাষ করতে হলে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর এই ফুল বাগান আলো করে রাখে। জাপান ও চীনই এ ফুলের জন্মভূমি। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র এফুলের চাষ হচ্ছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের চেষ্টায় অনেক উন্নত-জাতের মল্লিকা ফুলের গাছ সৃষ্টি হয়েছে। বড়দিনের সময় ( খ্রীষ্টমাসডের সময় ) চন্দ্রমল্লিকা ফোটে বলে এর নাম হয়েছে ক্রিসেন্থিমাম্‌। জমি অপেক্ষা টবে এর চাষ করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ রৌদ্রে খর তাপে গ্রীষ্মকালে এর গাছগুলি শুকিয়ে যায়। এ হলো ঘর সাজানোর ফুল।

**চারা প্রস্তুত পদ্ধতি :** মল্লিকার বীজ, কাটিংস্‌, কোঁড় ও তেউড় ( sucker ) থেকেও চারা তৈরি করা যায়। বীজের গাছ থেকে তেমন ভালো ফুল হয় না। সেইজন্য তেউড় বা কোঁড় থেকে চারা প্রস্তুত করাই যুক্তিযুক্ত। জানুয়ারী মাসে ফুল দেওয়া শেষ হলেই, গাছের গোড়া থেকে বহু তেউড় বার হয়। তখন শিকড় সমেত গাছটি তুলে ফেলে মাটি ঝেড়ে তেউড় গুলো কেটে নিতে হয়। অতঃপর ছায়া যুক্তস্থানে মাটি প্রস্তুত করে পচা গোবর সার অল্প বালির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তাতে এক ফুট অন্তর তেউড়গুলো এমনভাবে পুঁততে হ'বে, যেন তেউড়ের কাণ্ড অংশটি মাটির উপরে থাকে। তেউড় টবেও রোপন করা যায়। এই সময় নিয়মিত জলের সেচ দিতে হয়। তার ফলে তেউড় থেকে নূতন চারা বার হয়। মে মাসের দিকে শিকড়সহ চারাগুলো তুলে ৩-৪ ইঞ্চি বা ৮-১০ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত টবে রোপন করতে হয়। শিকড়সহ পৃথক পৃথক কাণ্ডকে টবেই লাগাতে হবে। বর্ষাকালে আচ্ছাদিত বারান্দায় রাখতে হয়। এছাড়া পুষ্পদানকারী পুরাতন শাখা দ্বারাও চারা প্রস্তুত করা যায়। পুরাতন শাখাকে ৬—৭ ইঞ্চি বা ১৫—১৮ সেন্টিমিটার লম্বা করে কেটে নিয়ে হাপরে লাগিয়ে চারা তৈরি করা যায়। এই চারাগুলিকে পূর্বোক্ত নিয়মে লাগিয়ে ভাবী গাছে পরিণত করা যায়।

**চাষ পদ্ধতি :** চন্দ্রমল্লিকার জন্য উর্বর জমি এবং পর্যাপ্ত জলের অত্যাবশ্যক। টবে চাষ করলে ২-৩ বার টব পরিবর্তন ও স্থানান্তরকরণ করা দরকার। টব পরিবর্তনের সময় ক্রমশঃ বড় টব ব্যবহার করতে হয়। ফুল ফোটার আগে ২।৩ বার তরল সার প্রয়োগ করতে হয়। শুকনা রক্ত, সোডিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি প্রয়োগ করতে হবে।

**বহুবর্ষজীবী গাছের ফুল :** এবার কয়েকটি বহুবর্ষজীবী ফুলের কথা আলোচনা করা যাক। একাধিকবার ফুল পাওয়া যায় এমন ফুলের গাছ প্রত্যেক উদ্যানে থাকা উচিত। সেই ধরণের কয়েকটি ফুলগাছ যেমন—**ক্যানা বা সর্বজায়া** ( Canna ), **রজনীগন্ধা** ( Tube rose ), **জেসমিন্‌** ( Jasmine ) এবং গোলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

**সর্বজায়া বা ক্যানা ( Canna ) :** ক্যানা একটি বহুবর্ষজীবী বারোমাসী ফুলের গাছ। একবার বাগানে রোপন করলে, ক্যানা গাছ বহু বৎসর বেঁচে থাকে। ফুল দেওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ফুল ও তার ডাঁটা কেটে দিলে, গাছের গোড়া থেকে আবার নূতন গাছ ও ফুলের ডাঁটা বার হয়। ফি-বছর মাঝে মাঝে জমি কুপিয়ে কিছু সার দিলেই এই ফুলের চাষ পর্ব মেটে।

ক্যানা গাছের উচ্চতা ৩—৬ ফুট বা ৯০—১৮০ সেন্টিমিটার। সর্বজন পরিচিত এই ক্যানা গাছের পাতা দেখতে অনেকটা কলাপাতার মত। নানা রঙের যেমন—উজ্জ্বল হল্‌দে, হাল্‌কা হলদে, গোলাপী, ফিকে লাল, টকটকে গাঢ় লাল—ক্যানা ফুল দেখতে পাওয়া যায়। বাগানে ও রাস্তার দু'পাশে, তৃণভূমি বা লনের মাঝে মাঝে এবং বেদীতে সারিবদ্ধভাবে ক্যানা রোপন করলে বেশ সুন্দর দেখায়। বীজ ও মূল থেকে এর চারা প্রস্তুত করা যায়। এদেশে কিন্তু মূল দ্বারা প্রধানতঃ এর চারা তৈরি করা হয়।

ক্যানার চাষ-পদ্ধতিও অতি সহজ। উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটিই ক্যানা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ক্যানা গাছের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। এর জন্য একটু ছায়াময় স্থানের প্রয়োজন। টবেও ক্যানার চাষ করা চলে।

**চারা তৈরি ঃ** ক্যানার চারা প্রস্তুত করাও সহজ। ক্যানার মূলকে টুকরো টুকরো করে মাটির ১ ইঞ্চি বা ২৫ মিলিমিটার নীচে পুঁতে, জলে ভিজিয়ে খড়কুটা দিয়ে ঢেকে দিলে সত্বরই গাছ উৎপন্ন হয়। চারা রোপনের ২—৩ মাসের মধ্যেই গাছে ফুল আসে। বহু রকম,ও রঙের ক্যানা গাছ দেখা যায়।

**রজনীগন্ধা ( Tube rose ) ঃ** রজনীগন্ধা আমাদের ফুল বাগানের একটি সুপরিচিত সুগন্ধি ফুলের গাছ। অতি সুমিষ্ট স্নিগ্ধ গন্ধে রাতকে মাত করে বলে এই ফুল রজনীগন্ধা নামে অভিহিত। যেখানে এই ফুল ফোটে, তার চারপাশের বহু দূরে এর সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে।

এই ফুল গাছ সাধারণতঃ ৩—৩½ ফুট বা ৯০—১০৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। উর্বর জমিতে প্রায় ৬ ফুট বা ১৮০ সেন্টিমিটার অবধি এই গাছকে লম্বা হ'তে দেখা গেছে। এ গাছ থেকে লম্বা মঞ্জরী দণ্ড বার হয়। তার মাথায় ১০—১৫ ইঞ্চি বা ২৫—২৮ সেন্টিমিটার জায়গা জুড়ে ছোট কলকের মত একসঙ্গে অনেক সাদা রঙের ফুল ফোটে। এই রজনীগন্ধার ঝাড় বা ষ্টিকগুচ্ছ ঘর সাজানো এবং উপহারের সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

টবে বা জমিতেই এই ফুলের চাষ করা যায়। বীজ থেকেও যে চারা জন্মানো না যায়, এমন নয়। সাধারণতঃ মূল থেকেই এর চারা প্রস্তুত করা হয়। সব রকম মাটিতে এ ফুলের চাষ করা যায়। মূলগুচ্ছগুলি কিছু দিন শুকিয়ে নিস্তেজ করে নেওয়ার পর জমিতে রোপন করতে হয়।

**রোপনের সময় ও সার ঃ** রজনীগন্ধা লাগানোর সময় ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে। তার আগে টবের বা জমির মাটি বেশ করে কুপিয়ে নিয়ে

গোয়ালের ও আবর্জনা সার, ছাগল ও ভেড়ার নাদি কিম্বা হাঁস-মুরগীর পুরাতন মল প্রয়োগ করলে একাধারে গাছ যেমন বেড়ে ওঠে, তেমনি প্রচুর ফুল ফোটে।

**জেসমিন ( Jasmine ):** জুঁই, বেল, মল্লিকা, চামেলি প্রভৃতি ফুল জেসমিনের অন্তর্গত। আমাদের প্রাচীন ফুল-প্রীতির সঙ্গে এইসব সুগন্ধী ফুলের স্মৃতি বিজড়িত হ'য়ে আছে। এই ফুলের গাছ বহুবর্ষজীবী। মরশুমী ফুলের মত স্বল্পস্থায়ী নয়। তদুপরি এইসব ফুলের গন্ধ অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও মনোরম। এইসব জাতীয় ফুলের পাপড়িগুলো অতি নির্মল। এই সব ফুলের বাগান, এমন কি পাড়া পরিবেশ পর্যন্ত মিষ্টি গন্ধে আমোদিত করে তোলে। এই জাতের বেল-জুঁই-চামেলি প্রভৃতি ফুলের গাছ টবেও করা চলে। যে-কোন মাটিতেই এই সব ফুলের আবাদ করা যায়। সাধারণতঃ ফাল্গুন থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এই ফুল ফোটে।

এই ফুলের বীজ ছাড়াও শাখা-কলম ও দাবা-কলম দ্বারা এদের চারা প্রস্তুত করা যায়। এছাড়া শাখা-কলম ও দাবা-কলম থেকে এদের চারা তৈরি করে নিতে হয়। নীচে পৃথক পৃথকভাবে বেল, চামেলী, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হ'ল।

**বেল**—কেউ কেউ একে বেলাফুল বলে থাকে। এই ফুলের আবার তিনটি শ্রেণী আছে। যথা—**মতিয়া, রাই, খোয়ে** প্রভৃতি। বেলফুলের রঙ সাদা, বেশ সুগন্ধযুক্ত। **মতিয়া** বেলফুল আকারে বেশ বড়। ফুলগুলিও অধিক গন্ধ-যুক্ত। বেশ মিষ্টি সৌরভ। **রাই** এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বহু পাপড়ি বিশিষ্ট। বেলফুল ফোটে অজস্র। এই ফুলের সুগন্ধ সবচেয়ে বেশী বলে, এ ফুলে মালা গাঁথা হয়। বাজারে এর যেমন কদর, তেমনি চাহিদা। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই ফুলের চাষ লাভজনক।

**চারা প্রস্তুতি :** সাধারণতঃ শাখা বা দাবা কলম দ্বারা চারা প্রস্তুত করা যায়। ৯০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে চারা রোপন করতে হয়। চারা রোপনের সময় হলো বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। উর্বর দোআঁশ মাটিই এ চাষের উপযোগী। এরা বহুবর্ষজীবী গাছ। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সব গাছেরই ডালপালা ছেঁটে দিয়ে প্রত্যেক গাছের গোড়া কুপিয়ে গোবর সার, খৈল, হাড় গুঁড়া প্রভৃতি সার দিতে হয়। ভালো ভাবে ছাঁটলে, বেশ ঝাড়ালো হয়। বাজারে বেলফুলের মালার চাহিদা আছে।

**চামেলী :** এই ফুল সাদা ও সুগন্ধী। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রচুর চামেলী ফুল ফোটে। এই ফুল শুকিয়ে রাখলেও অনেক দিন গন্ধ থাকে। চামেলী দ্রুত বর্ধন-শীল লতানে গাছ। এর লম্বা লম্বা শাখা মাটি স্পর্শ করলেই, পর্ব থেকে শিকড় বার

হয়। এইজন্য একটি গাছ আস্তে আস্তে অনেকখানি স্থান দখল করে নেয়। তবে উত্তমরূপে গাছ ছাঁটাই করে গাছের এই বৃদ্ধিটা কিছু হ্রাস করা যায়। এই ফুল গাছের চাষ ও পরিচর্যা বেলফুলের মত।

**জুঁই :** এই ফুল সাদা ও সুগন্ধ বিশিষ্ট। গাছের আকার ছোট এবং লতানে। এদের পাতাগুলো অনেকটা পান পাতার মত। বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত একটানা ছ'মাস প্রচুর পরিমাণে জুঁই প্রস্ফুটিত হয়। ফুলগুলি তারকাকৃতি, রঙ সাদা এবং আকার মাঝারি ধরণের। মাঘ মাসে গাছ ছেঁটে দিতে হয়। এই ফুলের তিন প্রজাতি আছে। যথা—**একচেটে** ( সিঙ্গল ) ডবল বা থাবা এবং স্বর্ণ। বর্ষাকালে শাখা বা দাবা কলম দ্বারা চারা তৈরি করা যায়। এই ফুল থেকে সুগন্ধি তৈল তৈরি করা যায়।

**মল্লিকা :** মল্লিকা একটি অতীব সুগন্ধি পুষ্প। জুঁই ও বেল প্রভৃতি ফুলের মতই এই ফুল গাছে চাষ ও পরিচর্যা করতে হয়।

**গোলাপ :** বাগানের সম্পদ। গন্ধ, বর্ণ ও সৌন্দর্য বিচারে গোলাপই সর্বশ্রেষ্ঠ ফুল। এই কারণে একে ফুলের রাণী ( Queen of flowers ) বলা হয়। বর্তমান কালে আমাদের দেশে উন্নত ধরণের গোলাপের চাষের আমদানী হয়েছে। আগে অবশ্য **রোজ, এডওয়ার্ড, চায়না, মাস্ক, বসোরা** প্রভৃতি জাতের গোলাপের চাষ হত। পূর্বে বারো মাস গোলাপ ফুল পাওয়া যেতে না। এখন অবশ্য উদ্ভিদতত্ত্ব-বিদদের চেষ্টায় উন্নত ধরণের সুগন্ধি বারোমাসী গোলাপের চাষ আরম্ভ হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে গোলাপের উৎকৃষ্ট সাধনে নানা গবেষণা চলছে।

ভারতবর্ষের আবহাওয়া ও মাটি গোলাপ চাষের পক্ষে অনুকূল। বীজ থেকে কোন কোন জাতের গোলাপ জন্মে। তবে প্রধানতঃ শাখা, দাবা, চোখ এবং জোড় কলম দ্বারা গোলাপের চারা প্রস্তুত করা হয়।

## গাছের কলম প্রস্তুত প্রণালী

**ভূমিকা :** বীজ-বপনের দ্বারা যে ফুল বা ফলের গাছ পাওয়া যায়, তা' নির্দিষ্ট জাত বা শ্রেণীগত-এক একটা বিশেষ বংশগতি নিয়ে আসে। তার মধ্যে এতটুকু উন্নতি বা বৈচিত্র্য ঘটানোর কোন অবকাশই থাকে না। তা' ছাড়া রক্ষণাবেক্ষণের কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত না হওয়ার দরুণ একদিকে যেমন দিন দিন ভালো বীজ সংগ্রহের সম্ভাবনা কমে আসতে পারে, অন্যদিকে তেমনি তার পরিণামে গাছ বা ফলের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কৌলীন্য কমে যেতে পারে।

এসব কারণে আধুনিক উদ্যানবিদরা এই ফুল বা ফলের গাছের বংশোন্নতি ঘটানোর দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছে। তার ফলশ্রুতি স্বরূপ উদ্ভাবিত হয়েছে নানা পন্থা-পদ্ধতির। উদ্যানতত্ত্ববিদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বীজ অপেক্ষা কৃত্রিম উপায়ে যেমন—(ক) **অঙ্গজ জনন** ( Vegetative propagation ) (খ) **কলম-প্রস্তুতিকরণ** ( Grafting ) এবং (গ) **কাটিংস** ( Cuttings ) প্রভৃতি পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারাই কেবল গাছের বংশোন্নতিই ঘটানো যায়, তা নয়, নানা প্রজাতির সৃষ্টি করে উদ্ভিদ-জগতে বিস্ময়কর বৈচিত্র্যও আনা যায়। এখানে সেই সব কৃত্রিম জনন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াগুলো জানা থাকলে, তা' নিয়ে উদ্যানরসিকরাও ব্যক্তি বা দলগতভাবে বিদ্যালয়ের কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গবেষণামূলক কিছু কাজও করতে পারেন।

(ক) **অঙ্গজ জনন** ( Vegetative Propagation ) : প্রথমে গাছের **অঙ্গজ-জনন** সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। গাছের যে কোন অঙ্গ—যেমন মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র প্রভৃতি থেকে বংশ-বৃদ্ধি ও বংশ-বিস্তার করার পদ্ধতিকে বলে **অঙ্গজ-জনন**। এই অঙ্গজ জনন আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে কলম প্রস্তুতকরণ বিষয়ের অবতারণা করা যাক। কলম প্রস্তুত-করণের ইতিহাস সপ্রাচীন। প্রায় দু'শো বছর আগে থেকেই আমাদের দেশে কলমের চারা দ্বারা গাছ উৎপন্ন করা হয়ে আসছে। বীজের চারা অপেক্ষা কলমের চারার কতকগুলি সুবিধা আছে। আবার কয়েকটি অসুবিধাও আছে।

**কলমের চারার সুবিধা**ঃ প্রথমে সংক্ষেপে সুবিধার কথাগুলো আলোচনা করা যাক। মোট পাঁচটি সুবিধা আছে। যথা (১) খুব তাড়াতাড়ি কলমের গাছে ফুল ও ফল ধরে। (২) অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই এক গাছেরই কয়েক পুরুষ উৎপন্ন করা যায়। (৩) কলমের চাষে গাছের প্রকার ও জাতি বিশুদ্ধ থাকে। তা'ছাড়া কলমের গাছের ফুল ও ফলের গুণ ও আকৃতি অপরিবর্তনীয় থাকে। (৪) এই জাতীয় গাছের জীবনীশক্তি অপেক্ষাকৃত কম হলেও মোটামুটি ভালো ফলন পাওয়া যায়। (৫) যে সব গাছের বীজ হয় না, কলম প্রস্তুতকরণ দ্বারাই তাদের বংশ রক্ষিত হয়েছে।

**কলম-প্রস্তুতির নানা পদ্ধতি** : সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পাঁচটি পদ্ধতিতে ফুল ও ফল-গাছের কলম তৈরি করা যায়। যথা—(১) **গুল কলম** বা **গুল কলম** (২) **চোক কলম** (৩) **জোড় কলম** (৪) **দাবা কলম** এবং (৫) **কাটিংস দ্বারা**ঃ

**ওল বা গুল কলম:** ওল বা গুল কলমের জন্য প্রথমে মাটি প্রস্তুত করে নিতে হয়। পুকুরের পাঁক মাটি অথবা যে ক্ষেত্রে কপি-আখ-মটর প্রভৃতি শস্য জন্মায়, সেই ক্ষেত্রের মাটির সঙ্গে কিঞ্চিৎ পাঁক মাটি মিশিয়ে নিয়ে কাদার মত করে চটকে মাখতে হবে; তারপর কিছু খৈল মেশাতে হ'বে। এইভাবে মাটি তৈরি করে নেওয়ার পর গাছের যে ডালে গিঁটের আধিক্য, সেই ডালের চারদিক ঘিরে ঐ মাটির প্রলেপ দিতে হবে। বেশ মোটা করে প্রলেপ দেওয়ার পর যখন সেটা ওলের মত অনেকটা হবে, তখন চট, মোটা কাপড় বা কম্বল-ছেঁড়া দিয়ে বেশ করে বেঁধে রাখতে হবে। তৎপর যে ডালে ওল কলম বাঁধা হয়েছে তার উপরের ডালে একটা ছিদ্র করা কলসী বেঁধে দিতে হ'বে। কলসীটার সেই ছিদ্রমুখে ভিতর থেকে এমনভাবে একটা শণের সলতে লাগিয়ে দিতে হবে যে, তাতে জল ঢাললে যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে চট দিয়ে ঢাকা ঐ প্রলেপ মাটির উপর অনবরত পড়তে থাকে। এর উদ্দেশ্য ঐ মাটিটাকে সদাসর্বদা ভিজিয়ে রাখা। এভাবে মাস কয়েক থাকার পর ঐ চট বা কম্বলের আবরণ ভেদ করে যখন চার দিক দিয়ে শিকড় বার হ'বে, তখন ওটাকে গাছ থেকে কেটে নিয়ে জমিতে সযত্নে সার দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এর নাম ওল কলম। প্রস্তুতির পর্বে গুল কলমের সঙ্গে ওল কলমের অবশ্য কোন পার্থক্য নেই। গুল কলমে ডালের ছাল তুলে দিতে হয়। সেজন্য বহু গাঁট যুক্ত দু'তিন বছরের পুরানো ডালের খানিকটা চেঁচে নিয়ে মাটির প্রলেপ দিয়ে নারকেলের ছোবড়া জড়িয়ে বেঁধে দিতে হবে। বালি মাটি সহযোগে নারকেলের জড়ানো ঐ কলম বাঁধার অংশটা নিয়মিত জল সেচ দিলে কিছু দিনের মধ্যে সেখান দিয়ে শিকড় বার হবে। তখন গুল কলম গাছ থেকে কেটে নিয়ে বাগানে রোপণ করতে হবে। এর নাম **গুল কলম**।

**চোখ কলম বা চিপ বাডিং:** এবার চোখ কলম তৈরি করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। দু'ভাবে এই চোখ কলম বাঁধা যায়। (১) প্রথমতঃ অতি উৎকৃষ্ট জাতের আমগাছের নীচের কতকটা অংশ রেখে বাকীটা কেটে ফেলতে হ'বে। তারপর গাছের সেই নিম্নাংশ থেকে নূতন ডাল গজালে, অন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আম গাছের ডাল সহ চোখ এনে, ওর সঙ্গে সংযোগ করে বেঁধে দিতে হবে। তারপর নিয়মিত জল সেচ ও মাটি দিয়ে লেপন করে পরিচর্যা করলে সেই নূতন ডালসহ চোখ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সজীব হয়ে উঠবে এবং সেই চোখ থেকে নূতন ডাল বার হ'বে। নূতন ডাল বার হলে মূল ডালের উপরি ভাগ কেটে দিলে চোখ কলম তৈরি হবে। এই কলম গাছ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিপায় এবং সত্বর ফল প্রদান করে।

(২) চিপ বাডিং তৈরি করার জন্য সর্বাগ্রে একটি আমের আঁটি সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে দিতে হয়। কিছুদিনের মধ্যে গাছ বার হ'লে ও কিছু পুষ্ট হ'লে, ওর গায়ের একাংশ ২ মিলিমিটার চেঁচে অন্য উন্নত জাতের ডালসহ চোখ ৪।৫ মিলিমিটার লম্বা ও ২ মিলিমিটার গভীর পরিমিত অংশ কেটে নিয়ে য়্যালকাথিন দিয়ে ও পলিথিলিন কাগজ জড়িয়ে বেঁধে দিতে হয়। তারপর চোখ-ডাল বড় হ'লে সেটা তুলে জমিতে রোপন করতে হবে।

এই চিপ বাডিং প্রথায় উৎপন্ন গাছের শতকরা ৮০টি গাছ বাঁচে এবং বছরে ১ মিটার বর্ধিত হয়। জুন থেকে নভেম্বর মাসই চিপ বাডিং করার প্রশস্ত সময়।

## (৩) জোড় কলম

**প্রাথমিক প্রস্তুতি :** একটি ছোট টবে একটি আঁঠির চারা গাছ জন্মাতে হবে। গাছটার দু বছর বয়স হলে, ঠিক ঐ বয়সের অন্য কোন ভালো জাতের বড় আম গাছের ডালের সঙ্গে টন সুতা দিয়ে কসে বাঁধতে হ'বে। তারপর ছোবড়া দ্বারা ঝুরা মাটি ও সার দিয়ে নারকেল দড়ি জড়িয়ে বেঁধে আবশ্যক মত জল সেচন করতে হবে। এই জোড় বাঁধার পূর্বে মূল চারা গাছের ডালের গায়ের রঙীন ছাল ছুরি দিয়ে চেঁচে ফেলতে হবে, অন্যদিকে অপর আম গাছের ডালের এমন অংশের ছাল চেঁচে নিতে হবে, সেটা চারা আম গাছের ডালের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংযোগ করা যায়। ঐ ভাবে ডালে ডালে কসে বেঁধে দিতে হবে।

এই ভাবে ৫।৬ মাস জোড় বেঁধে রাখলে যখন তা থেকে শিকড় বার হয়ে ছোবড়ার ঐ বন্ধনীর বাইরে দেখা যাবে, তখন আম গাছের সেই ডালটি কেটে নিয়ে মাটিতে রোপণ করতে হবে। তারপর পাতা পচা সার দিয়ে গাছটাতে জলসেচন করতে হবে। এবার মাথা কাটা চারা গাছ এই জোড়া লাগানো ডালটাকে খাদ্য যোগান দিয়ে বাঁচিয়ে তুলবে। এর নাম **জোড় কলম**। জোড় কলম তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্র ফল দান করে।

## (৪) দাবা কলম :

এবার দাবা-কলমের কথা আলোচনা করা যাক। এর জন্য মাটির খুব সন্নিকটের ডাল বেছে নিতে হবে। সেই ডালের ছালের উপর গোল করে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে দিতে হবে। তার ৫ সে. মি. উপরেও এই রকম একটা দাগ দিতে হবে। এই দু' দাগের ভিতরকার ছালটুকু খুব সাবধানে চেঁচে তুলে ফেলতে হবে। এখন এই ডালটি নুইয়ে ঐ ছাল তোলা অংশটা মাটির ভিতর ঢুকিয়ে দিতে



কাটিংস-এর জন্য ডালের উপর এবং নিচের দিক এভাবে কাটতে হয়।



গুল কলম




গুল কলম ও কলমের চারা গাছ

হবে। তারপর মাটির উপরের সেই জায়গাটায় একটা বড় ইঁট বা পাথর চাপা দিতে হবে। তা'হলে ডালের ঐ অংশটা কোন ক্রমে উপরে উঠে আসতে পারবে না। ইঁট পাথরের বদলে এক টুকরো বাঁশের ঠিক মাঝখানটি চিরে নিয়ে ঐ নোয়ানো ডালের উপর দিয়ে মাটিতে পুঁতে দেওয়া যেতে পারে। এই কলম তৈরি করার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় গাছের ডালের ছাল তোলা অংশটা মাটির ভিতর দাবিয়ে রাখতে হয় বলে, এই কলমটি **দাবা কলম** নামে সুপরিচিত।

**দ্বিতীয় পদ্ধতি :**—এই ছাল না তুলে দাবা কলম আর একভাবেও করা যায়। সেটা হলো এই যে, ডালের কোনও অংশের ছাল না তুলে, খুব ধারালো ছুরি দিয়ে মাটির কাছাকাছি কোন একটা ডালের নির্দিষ্ট স্থানের মাঝখানটা আধাআধি ভাবে চিরে নিতে হবে, তারপর সেই চেরা অংশের ভিতরে একটি সরু কাঠি ঢুকিয়ে দিলে ঐ চেরা অংশ জিভের মত ঝুলে থাকবে। এবার ঐ চেরা অংশটি মাটির ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে দাবিয়ে রাখতে হবে। যেভাবে করার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, সেভাবে ডালটাকে মাটির সঙ্গে আটকে রাখতে হবে। এই দাবিয়ে রাখার ব্যাপারটা বিবেচনা করেই কোন উঁচু ডালে দাবা কলম বাঁধা যায় না।

### কাটিংস দ্বারা বংশ বিস্তার :

প্রথমে জানা দরকার কাটিংস কি ? সাধারণতঃ গাছের ডালের টুকরো কাটা অংশকে বোঝায়। আসলে কোন গাছ থেকে তার কাণ্ড, শাখা, পাতা, এমন কি শিকড় প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন করে, তার ডালের বিভিন্ন অংশ দিয়ে নূতন পৃথক গাছ তৈরি করাকে **কাটিং** করা বলে। সাধারণতঃ বর্ষাকালেই গাছের কাটিং প্রস্তুত করার উপযুক্ত সময়। শীতকালীন কোন কোন গাছের কাটিংস অবশ্য শীতকালে প্রস্তুত করে নিতে হয়। যেমন ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি। সাধারণতঃ চারভাবে এই কাটিং করা যায়। যথা—(ক) **শাখার কাটিংস** (খ) **কুঁড়ির কাটিংস** (গ) **পত্রের কাটিংস** এবং (ঘ) **মূলের কাটিংস**।

**(ক) শাখার কাটিংস** ( Steam Cuttings ) : শাখার কাটিংস এমন একটি পদ্ধতি, যার দ্বারা সর্বাপেক্ষা সহজে গাছের কলম তৈরি করা যায়। যেমন—গাঁদা, গোলাপ, জবা, সজিনা, বাগান বিলাস ( বেগন ভালিয়া ), রঙ্গন, ঝুমকালতা প্রভৃতি গাছের কলম এই প্রণালীতে প্রস্তুত করা যায়।

### শাখা নির্বাচন ও কাটার নিয়ম :

শাখা কাটিংসের জন্য সাধারণতঃ মোটা গোলাকার অনেকটা লেড পেনসিলের মত শাখা বাছাই করে নিতে হয়। সজিনা প্রভৃতি গাছের মোটা শাখাই কাটিংসের

জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে কাটা ডালের পরিমাপ হবে ৪—১৮ ইঞ্চি বা ১০—৪৫ সেন্টিমিটার লম্বা হওয়া উচিত। কমপক্ষে এই সব কাটিংসের মধ্যে ২—৫টি পর্ব ও পর্বমধ্য থাকা দরকার। শাখার অগ্রভাগ ধারালো ছুরি দিয়ে সমতল ভাবে কাটা হয়। ডালের নিচের দিকে অংশটা কলম বাড়ার মত করে কেটে নিতে হবে। শাখা পর্বের ঠিক নিচ থেকেই ঐভাবে কেটে নিতে হ'বে। তারপর কিছুদিন মাটি, বালি, কাঠের গুঁড়া অথবা কয়লার গুঁড়ার মধ্যে পুঁতে রেখে কাচ পাত্র দিয়ে ঢাকা দিতে হয়। অল্পদিনের মধ্যেই শাখা থেকে শিকড় বার হয়। তারজন্য নিয়মিত সেচ দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

শাখায় বেশী পাতা থাকলে, অতিরিক্ত বাষ্প মোচন দ্বারা শাখাটি শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অথচ পাতা রাখার প্রয়োজনীয়তাও আছে। কেননা, পাতা থেকে নিঃসৃত একপ্রকার **হরমোন** ( Growth promoting hormone ) শাখায় দ্রুত মূল গজিয়ে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করে। এই কারণে ডালের সংলগ্ন অর্ধেক পাতা ফেলে দিলে ঐ দু'টি উদ্দেশ্যেই সাধিত হ তে পারে। হাপর ছাড়া টবে পুঁতেও কাটিংস থেকে চারা করা যায়। যেখানে এই কাটা ডাল বসানো হোক না কেন, শাখাটা সব সময় একটু কাত করে বা হেলিয়ে বসাতে হ'বে। কাটিং করা ডালের উপরে অর্থাৎ মাথার উপরটা সামান্য গোবর দিয়ে টুপির মত করে দিতে হ'বে। এই সময়টা নিয়মিত জলসেচের একান্ত প্রয়োজন।

(খ) **কুঁড়ির কাটিংস ( Bud Cuttings ) :**

এই পদ্ধতি শাখার কাটিংস অপেক্ষা দু'টি কারণে ভালো। প্রথমতঃ এতে এক সঙ্গে অনেক অধিক সংখ্যক কলম পাওয়া যায় ; দ্বিতীয়ত, একটি শাখায় বহু কুঁড়ি থেকে অনেক কলম তৈরি করা যায়। কুঁড়ির কাটিংস তৈরি করতে হ'লে, সবল ও সুস্থ কোরক বেছে নিতে হয় তারপর ধারালো ছুরি দিয়ে ছালসহ কুঁড়িটি তুলে নিতে হয়। অতঃপর ঐ কুঁড়িগুলি উর্বর দো-আঁশ মাটি, বালি অথবা কাঠের গুঁড়ার উপর বসাতে হ'বে। শাখার মতই ওদের ঢাকা দিয়ে রাখতে হয় ; এবং দরকার হয় নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কিছুদিন পরে কুঁড়ির কাটা অংশ থেকে শিকড় বার হলে, তখন ওগুলোকে তুলে স্থায়ীভাবে অন্যত্র রোপণ করতে হয়।

(গ) **পত্রের কাটিংস ( Leaf cuttings ) :** পাথর কুচি, নাইট কুইন প্রভৃতি গাছের পাতার কিনারা থেকে নূতন গাছ জন্মায়। এইজন্য অপেক্ষাকৃত পুরানো পাতা চয়ন করে মাটিতে বা টবে পুঁতে রাখলে অল্পদিনের মধ্যে গাছ উৎপন্ন হয়। তারপর প্রত্যেকটি গাছ তুলে নিয়ে অন্যত্র রোপণ করতে হয়।

**(ঘ) মূলের কাটিংস ( Root Cuttings ) :**

যে সমস্ত গাছ মূল থেকে জন্মায়, মূলের কাটিংস দ্বারা তাদের বংশবৃদ্ধি করা যায়। এছাড়া অন্য গাছ—যেমন পটোল গাছের মূল দ্বারা চারা প্রস্তুত করা যায়। ২—৩টি মুকুলসহ পটোল গাছের ৩—৪ ইঞ্চি বা ৮—১০ সেন্টিমিটার লম্বা মূল সংগ্রহ করে সোজাভাবে বা ঈষৎ কাত করে মাটির ২—৩ ইঞ্চি বা ৫—৮ সেন্টিমিটার গভীরে পুঁতে রাখলে, কিছুদিনের মধ্যে ঐ মূল থেকে চারা জন্মায়। চারা উৎপন্ন হ'লে যথা নিয়মে অন্যত্র রোপণ করতে হবে।

**কলম পঞ্জি :**

এবার কতকগুলি সুপরিচিত ফুল ও ফলের গাছের কোনটি কি কলম হবে তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল :—

প্রথমে ফুলের গাছের কথাই ধরা যাক।

| বিভিন্ন ফুল গাছের নাম | | | কি কি কলম হবে ? |
|---|---|---|---|
| ১। গন্ধরাজ | ... | ... | গুল ও গুটি কলম |
| ২। বকুল | ... | ... | বীজ থেকে গুটি কলম |
| ৩। টগর | ... | ... | কাটিং, গুটি* |
| ৪। বেল ফুল | ... | ... | কাটিং |
| ৫। জুঁই | .... | ... | দাবা |
| ৬। চামেলী | ... | ... | দাবা |
| ৭। জবা | ... | ... | দাবা, গুটি, কতকগুলোর কাটিং |
| ৮। স্থলপদ্ম | ... | ... | গুটি বা গুল |
| ৯। কামিনী | ... | ... | গুটি বা গুল |
| ১০। রঙ্গন | ... | ... | কাটিং, গুটি |
| ১১। করবী | ... | ... | কাটিং, গুটি |
| ১২। ফুরুস | ... | ... | কাটিং |
| ১৩। হাসনাহানা | ... | ... | কাটিং |
| ১৪। গোলাপ | ... | ... | বীজ, কাটিং, গুটি ও জোড় চোখ |
| ১৫। বাগান বিলাস বা বোগানভিলা | ... | | কাটিং, দাবা |

১৬। বিভিন্ন জাতের লতা, যেমন—মালতী, মধুমালতী, ঝুমকা, স্বর্গঝুড়ি প্রভৃতির দাবা কলম করতে হয়।

---

* গুটি, গুল একজাতীয় কলমের বিভিন্ন নাম মাত্র ; গুল কলম এদের সমগোত্রীয় হলেও একটু তফাৎ আছে। তবে ও তিনটি একই শ্রেণীর কলম।

| বিভিন্ন ফল গাছের নাম | | | কি কি কলম হবে ? |
|---|---|---|---|
| ১। আম | ... | ... | জোড়, গুল |
| ২। লিচু | ... | ... | গুটি বা গুল |
| ৩। কুল, লেবু, বাতাবী | | ... | গুল, চোখ |
| ৪। পাতিলেবু | ... | ... | গুল, চোখ |

### ফুল সংরক্ষণ

পাশ্চাত্ত্য দেশের উদ্যান-বিদরা পুষ্প প্রেমিকদের জন্য এমন একটি উপায় বাতলে দিয়েছেন, যার দ্বারা দর্শনধারী সুন্দর সুগন্ধি ফুলও বেশ কয়েক বৎসর ধরে সংরক্ষণ করতে পারেন। কোন-একটা প্রিয় ফুল কি ভাবে দীর্ঘ দিন পুষ্পপ্রেমিকদের সান্নিধ্য দেবে, তার ফরমূলাটা নিয়ে দেওয়া গেল :—

স্যালিসিলিফ ফসিড ১০ গ্রেণ, ফর্মালডিহাইড ৫ ফোঁটা, এলকোহল ১ আউন্স, পরিস্রুত জল ১ পাইন্ট একত্র মিশ্রিত করে একটি কাঁচের বোতলে রেখে তার মধ্যে যেকোন টাট্কা ফুল ডুবিয়ে রাখলে, সেই সব ফুল বহু বৎসর ধরে টাট্কা থাকবে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### মিশ্র-সার প্রস্তুতকরণ (Compost making) :

**সংজ্ঞা :** ইংরাজী **কম্পোষ্ট** কথাটার অর্থ মিশ্র-সার। একটি প্রক্রিয়ার দ্বারা এই মিশ্রণ কার্য সাধিত হয়। বিভিন্ন জাতীয় ব্যাকৃটিরিয়া ও ছত্রক জাতীয় জীবাণুর দ্বারা এ প্রক্রিয়া সংসাধিত হয়। তা'হলে কম্পোষ্ট কথার অর্থ দাঁড়াল এই যে, বিভিন্ন রকমের ব্যাকৃটিরিয়া ও ছত্রক-জাতীয় জীবাণু দ্বারা শস্যের পরিত্যক্ত অংশ বা আবর্জনাদি পচিয়ে যে কৃত্রিম সার প্রস্তুত করা হয়, তা'কে **কম্পোষ্ট** বলে। কতকগুলো প্রক্রিয়া দ্বারা বর্জ্য পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন করতে হয়, নচেৎ তা' সার হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। কি ভাবে এই কম্পোষ্ট তৈরি করা যায়, নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

**কম্পোষ্ট তৈরির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত :** সার তৈরির ইতিহাস অবশ্য সুপ্রাচীন। রোমানরাই সুপ্রাচীন কালে সবুজ সারের উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করেন।

আর এই কম্পোষ্ট তৈরির বয়স বছর তিপান্ন হবে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে **হাচিন্‌সন্‌** ( Hutchinson ) ও **রিচার্ড** ( Richard ) নামক দুইজন কৃষিবিশারদ পণ্ডিত এক কৃত্রিম প্রক্রিয়ার দ্বারা খড় থেকে প্রথম সার প্রস্তুত করেন। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া **সবাত** ( aerobic ) নামক এক প্রকার জীবাণুর দ্বারা সংসাধিত হয়। তাঁদের অভিমত এই যে, উপযুক্ত বায়ু, জল, তাপ এবং নাইট্রোজেনের সংমিশ্রণে কম্পোষ্ট সার তৈরি করা যায়। নিরপেক্ষ অথবা সামান্য ক্ষারত্বের সাহায্যে খড়ের পচন সাধিত হয়। একারণে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে তাঁরা কোন সুফল পান নাই। তার কারণ উহা ব্যবহার করার ফলে অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে জীবাণুর সহজবৃদ্ধি ও পুষ্টি ব্যাহত হয়। তখন তাঁরা ক্ষারপ্রয়োগে এই নূতন সারপ্রস্তুত করেন।

**কম্পোষ্ট প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি** ( Systems of making compost ) সাধারণতঃ নিম্নলিখিত চারটি উপায়ে কম্পোষ্ট করা যায়। যথা—(১) **হাচিনসন্‌-ও রিচার্ডের অ্যাড্‌কো** ( adco ) **পদ্ধতি**, (২) **ফাউলারের** ( Fowler ) **অ্যাক্‌টিভেটেড কম্পোষ্ট পদ্ধতি** ( Activated Compost Process ) (৩) **হাওয়ার্ড** ( Howard ) ও **ওয়াডের** (Wad) **ইন্দোর পদ্ধতি** (Indore Process) এবং **আচার্যের** ( Acharya ) **বাঙ্গালোর পদ্ধতি** ( Bangalore process )। উল্লিখিত পদ্ধতিগুলির সমন্বয়ে এদেশে দেশীয় পদ্ধতি গুলির সমন্বয়ে দেশীয় পদ্ধতি (Country method) উদ্ভাবিত হয়েছে। এখানে আমরা দেশীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

**দেশীয় পদ্ধতি** ( Country method ) **:** আমাদের দেশে অবশ্য দেশী পদ্ধতি নামে কোন বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত নেই। তবে এ দেশে প্রচলিত নানা পদ্ধতির গুণাবলীর সমন্বয় সাধন করে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুতির আদর্শ মান ঠিক করে, তার নাম দিয়েছেন **দেশীয় পদ্ধতি**।

**উপদান সংগ্রহ ঃ** আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থান ও খাদ্য শস্যাদির অংশাবশেষ থেকে—যেমন ফসলের অপ্রয়োজনীয় অংশ, খামারের আগাছা, বিচালি, খড়, কচুরিপানা, গাছের কচি ডালপালা, আখের ছোবড়া প্রভৃতি পচিয়ে কম্পোষ্ট সার তৈরি করা হয়। এই পচন-কার্য সংঘটিত হয় প্রভাবকের (Starter ) দ্বারা।

**স্থান নির্বাচন ঃ** স্থান হিসাবে উচ্চ সমতলভূমি সর্বোৎকৃষ্ট। তার কারণ সমভূমিতে আদৌ জল দাঁড়ায় না। কোন গাছের নীচে ছায়াযুক্ত স্থান নির্বাচন করাটাই সমীচীন। কারণ সূর্য-তাপে উপাদানগুলি শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। **স্থানটি** গোয়ালঘরের সন্নিকট অথবা জলাশয়ের ধারে হলে ভালো হয়।

**প্রস্তুত-প্রণালী (Method of preparation):** সংগৃহীত উপাদানসমূহ নির্বাচিত স্থানে এনে সমানভাবে বিছিয়ে দিতে হবে। এই বিছানো স্তরটির উচ্চতা হবে ৩০ সে. মি.; কারণ বায়ুর সংস্পর্শে জীবাণুগুলির সংখ্যা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। ফলে আবর্জনা শীঘ্রই পচে যায়।

**স্তূপের আকার:** সাধারণতঃ এই স্তূপটির আকার হ'বে ১২০ সে.মি. চওড়া এবং উচ্চতায় ১২০ সে.মি, লম্বটা অবশ্য সংগৃহীত উপাদানসমূহের উপর নির্ভর করবে। প্রথমে ৩০ সে. মি. উঁচু স্তরটি সমানভাবে সাজিয়ে নিতে হবে। তারপর ঐ স্তূপের উপর ২।৩ কিলোগ্রাম হাড়ের শুকনো গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে হবে। হাড়ের গুঁড়ার অভাবে গোচোনা ছিটিয়ে স্তরটি ভিজিয়ে দিতে হবে। যদি এই গোচোনাও না যোগাড় করা যায় তবে জলে গোবর গুলে নিয়ে ঐ স্তূপের উপর দিনে ১৫ বার ছিটিয়ে দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। অতঃপর গোবর ও মাটি ঐ স্তূপের উপর ২ সে.মি. পুরু করে ছড়িয়ে দিতে হ'বে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে স্তূপটিতে যেন জল বেশী না দেওয়া হয়। এর কারণ বেশী জল দিলে বায়ু চলাচলে ব্যাঘাত ঘটার ফলে পচন-ক্রিয়াও ব্যাহত হয়। এই পচন-কার্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য ঐ স্তরের উপর **অ্যামোনিয়াম সালফেট** দিতে হয়। তারপর পূর্ব পদ্ধতি অনুসারে আরও তিনটি ৩০ সে. মি. পরিমাণের স্তর রচনা করতে হবে। স্তর তিনটি সাজানো হ'লে শেষ স্তরের উপরটা গোবর ও মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়ে ৪২ দিন ঐ অবস্থায় ফেলে রাখতে হয়। তারপর ছ' সপ্তাহ অন্তে স্তূপটিকে ভালভাবে নেড়ে উল্‌টে দিতে হয়। এর ফলে কম-পচা অংশগুলি নীচে চলে যায় আর অপেক্ষাকৃত বেশী-পচা অংশটা উপরে আসে। স্তূপটিকে আবার পূর্বের মত ভিজিয়ে দিয়ে হয়। এর ছ' সপ্তাহ পরে উল্‌টে নিয়ে ভিজিয়ে দিতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ার ফলে ৪।৫ মাসের মধ্যে পচন-কার্য সম্পন্ন হয়। এই পচন-কার্য শেষ হলেই, ঐ কম্পোষ্ট সার তখন জমিতে প্রয়োগ করার উপযোগী হবে।

**অঞ্চল বিশেষে পচন-ক্রিয়ার তারতম্য**—পশ্চিম বাংলার যে সব অঞ্চলে চার থেকে ছ' ফুট খুঁড়লেই মাটির নীচে জল পাওয়া যায়, সেই সব অঞ্চলে কোন গর্ত না খুঁড়ে মাটির উপরেই স্তূপাকারে কম্পোষ্ট প্রস্তুত করাটাই বিধেয়। কারণ মাটির অত নীচে জল থাকায় পচন-ক্রিয়ায় কেবল ব্যাঘাত ঘটবে তা নয়, উপাদান গুলির সার পদার্থ মৃত্তিকাস্থ জলের সঙ্গে বিধৌত হয়ে ক্ষয়-প্রাপ্ত হতে পারে। এই কারণে উত্তর বঙ্গাঞ্চলে মাটির উপরেই কম্পোষ্ট প্রস্তুত করাটাই সমীচীন। পশ্চিমবঙ্গের অপরাপর অঞ্চলে মাটির উপর গর্ত খুঁড়ে অর্থাৎ ট্রেঞ্চ (trench)

কম্পোষ্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করলে, উন্নত মানের কম্পোষ্ট বা মিশ্র সার পাওয়া যেতে পারে।

**মাটির উপরে বা নীচে পচানোর ফলাফল :**

মাটির উপরে বা নীচে কম্পোষ্ট প্রস্তুত করার সুবিধা অসুবিধাগুলি মোটামুটি যে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা করা যায়, তা নীচে দেওয়া হ'ল :—

| মাটির উপরে | মাটির নীচে |
|---|---|
| (১) মাটির উপরে পচানোর ব্যবস্থা করলে পরিমাণ মত বায়ুর সংস্পর্শে আসায় তাড়াতাড়ি কম্পোষ্ট তৈরি করা যায়। | (১) বায়ু চলাচলের ব্যাঘাত ঘটায় দেরীতে কম্পোষ্ট তৈরি হয়। |
| (২) দ্রুত বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার তিনটি অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন— জল বিনষ্ট হয়, উপাদানগুলি শুকিয়ে যায়, তাপমাত্রা হ্রাস পায়। | (২) এক্ষেত্রে তিনটি সুবিধা আছে। যথা—উপযুক্ত তাপমাত্রা রক্ষিত হয়, জলের ক্ষয় কমে, উপাদানগুলি বিশুষ্ক হতে পারে না। |
| (৩) সমভাবে পচন-ক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ার দরুণ কম্পোষ্টের মান নিম্নগামী হয়। | (৩) পচন-ক্রিয়া সমভাবে সম্পন্ন হওয়ার ফলে উঁচুমানের কম্পোষ্ট তৈরি করা যায়। |
| (৪) আর্থিক ব্যয় বেশী হয়। | (৪) খরচ কম হয়। |
| (৫) জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজের ক্ষয় সাধিত হয়। | (৫) জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের অপচয় কম হয়। |

(১) **অ্যাডকো পদ্ধতি :** ইংল্যাণ্ডের এগ্রিকালচারাল ডেভালপ্‌মেণ্ট কোম্পানী নামক একটি বেসরকারী সংস্থার নাম অ্যাডকো ( Adco* )। এ পদ্ধতি নতুন কোন উদ্ভাবন নয়, বরং হাচিন্‌সন্‌ ও রিচার্ড প্রবর্তিত সেই প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে সামান্য একটি প্রক্রিয়ার সংযোজনা। এখানে কেবল প্রভাবক হিসাবে অ্যাডকো পাউডার ব্যবহৃত হয়। এখানে অবশ্য বর্জ উপাদানের দ্বারা প্রস্তুত কম্পোষ্ট-স্তূপটির উচ্চতা ঠিক করা হয়েছে অনধিক ৬ ফুট মাত্র। অ্যাডকো পাউডার ব্যবহারের পরিমাণ ধার্য হয়েছে প্রতি ১০০ পাউণ্ড শুষ্ক পদার্থের জন্য ৭ পাউণ্ড অ্যাডকো পাউডার। প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি দেশীয় প্রণালীর অনুরূপ।

---

* Agricultural Development Company, England.

(২) **অ্যাক্টিভেটেড কম্পোষ্ট পদ্ধতি** ( Activated compost process ) এই পদ্ধতির প্রণেতা ফাউলার এবং রেজ। এই পদ্ধতিতে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয় গোবর সার সিউয়েজ ( sewage ), স্লাজ প্রভৃতি। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান্ ইনস্টিটিউট অব স্যায়েন্স এর ( Indian Institute of Science ) কর্তৃপক্ষ ১৯২২ সালে এই পদ্ধতির প্রচলন করেন। এর প্রস্তুত প্রণালী দেশীয় পদ্ধতির ন্যায়।

(৩) **ইন্দোর পদ্ধতি** (Indore process) : হাওয়ার্ড ও ওয়াড সর্বপ্রথম এই পদ্ধতিতে ইন্দোরের Institute of Plant Industry-তে যে কম্পোষ্ট সার উৎপাদন করেন, তা' **ইন্দোর পদ্ধতি** নামে অভিহিত হয়। এই সার প্রস্তুতির ব্যাপারে প্রভাবক রূপে গোবরই ব্যবহৃত হয়। এর প্রস্তুত প্রণালী দেশীয় পদ্ধতির ন্যায়।

(৪) **বাঙ্গালোর পদ্ধতি** ( Bangalore process ) : এই পদ্ধতিতে সি-এন-আচার্য Indian Institute of Science-এ কম্পোষ্ট বা মিশ্রসার প্রস্তুত করেন। এই পদ্ধতিতে গর্ত খুঁড়ে সার বেদিকায় শহরের আবর্জনা ব্যবহৃত হয় উপাদান হিসাবে এবং শহরের বিষ্ঠাকে প্রভাবক রূপে প্রয়োগ করা হয়। ইহা দেশীয় পদ্ধতির অনুরূপ।

**সালেজ** ( Sullage) : শিল্পপ্রধান বড় বড় শহর বা রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরের খোলা ড্রেন বা নালার মাধ্যমে যে তরল পদার্থ নিত্য বাহিত হয়, তাকে বলে **সালেজ**। এই মিশ্র তরল পদার্থটি মূলতঃ প্রস্রাব এবং বাসনপত্র ধোয়া নোংরা জল ছাড়া অন্য কিছু নয়। ঐ সব তরল পদার্থকেও জমির সাররূপে ব্যবহার করা যায়।

**সিউয়েজ** ( Sewage ) : আবার বড় বড় শহরের ঢাকা ড্রেন বা বদ্ধ নালার মধ্যে নানা জিনিস মিশ্রিত যে তরল পদার্থ থাকে, তাকে **সিউয়েজ** বলা হয়। এই পদার্থের সঙ্গে প্রস্রাব, বাসন ধোয়া জল ছাড়া থাকে মানুষের ময়লা বা বিষ্ঠা ( night soil) মিশ্রিত থাকে। সেই কারণে ঐ পদার্থসমূহকে গাঢ় তরল পদার্থের ন্যায় দেখায়। এই পদার্থও জমির উত্তম সাররূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপরে বর্ণিত তরল সার জমিতে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি অসুবিধা আছে। তা দূর করার জন্য আজকাল এক উন্নত উপায়ে স্লাজ তৈরি করা হ'চ্ছে।

**স্লাজ** ( sludge) : এবার স্লাজ পদার্থটি কি, তা আলোচনা করা যাক। সাধারণতঃ সেপটিক (Septic tank) চৌবাচ্চার নিম্নাংশে কাদার ন্যায় যে স্তর জমা হয়, তাকেই বলা হয় **স্লাজ**। এতে অধিক মাত্রায় বর্তমান থাকে নাইট্রোজেন ও ফসফরিক অম্ল। অথচ পটাশের ভাগ থাকে যৎসামান্য, না থাকার মতই। ভালো খামারের সারের তুলনায় এর গুণগত উৎকর্ষতা কম।

**স্লাজ তৈরির প্রণালী ( Method of preparation of sludge ) :** বর্তমান যুগে অবশ্য অ্যাকটিভেটেড্ স্লাজ পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা স্লাজপ্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে কিভাবে স্লাজ প্রস্তুত করা যায়, নীচে তার বিবরণ দেওয়া হ'ল। প্রথমতঃ সিউয়েজ এবং মানুষের বিষ্ঠাকে একত্রে ভালো করে মিশ্রিত করার পর কয়েকটি চৌবাচ্চার ভিতর দিয়ে ঐ মিশ্রিত তরল পদার্থকে প্রবাহিত করানো হয়। এই চৌবাচ্চাগুলিকে ব্যাকট্রিরিয়ার দ্বারা সংক্রমিত করে রাখা হয়। আর ঐ জীবাণুর কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সেজন্য বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা রাখা হয়। ফলে ঐ অ্যামোনিয়াযুক্ত দুর্গন্ধময় -পদার্থসমূহ ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা জারিত ( oxidised ) হয়ে **নাইট্রেটে** পরিণত হয় ; এবং দুর্গন্ধময় কলয়েড্‌াল ( colloidal ) পদার্থগুলি যখনই **হিউমাসে** ( humus ) পরিণত হয়, তখন আর ঐ গলিত পদার্থে কোন গন্ধ থাকে না। এই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি খুব তাড়াতাড়ি সংসাধিত হয়। অতঃপর চৌবাচ্চার তলদেশের গলিত পদার্থসমূহ জমে যায় আর তার উপরে একটি পরিষ্কার তরল পদার্থ থিতিয়ে থাকে। তাকে বলা হয় **ইফ্লুয়েন্ট** ( effluent )। উপরের ঐ তরল পদার্থকে বাদ দিয়ে, জমানো পদার্থটিকে শুকিয়ে তুলে নেওয়া হয়। ওর নামই **স্লাজ**! এই সারে প্রায় শতকরা ৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এই কারণে সার হিসেবে অতি উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান।

**(ii) সবুজ সার (Green manure ) :**

**সংজ্ঞা :** ইংরাজী 'গ্রীন ম্যানিওর' ( green manure ) কথাটার বাংলা হলো সবুজ সার। এই সবুজ সারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জনৈক কৃষিবিজ্ঞানী বলেছেন যে, "Green manuring means the turning under of green plants for the enrichment of the soil." অর্থাৎ এক জাতীয় সবুজ গাছগাছালিকে মাটির নীচে চাপা দিয়ে মাটির প্রক্রিয়ায় তাকে রূপান্তরিত করে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ানো ব্যাপারটাই সবুজ সারের অন্তর্গত।

**ইতিহাস :** সবুজ সার প্রস্তুতির সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। যেটুকু খবর পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে, সবুজ সার তৈরি ও প্রয়োগের ইতিবৃত্ত অতি প্রাচীন। রোমানরাই এই পদ্ধতির প্রবর্তক। তাঁদের মাধ্যমে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ঐ সবুজ-সার-প্রয়োগ-প্রথা চালু হয়। পদ্ধতিটি ছিল অতি সহজ। জমির জৈব পদার্থ বৃদ্ধি করার জন্য সবুজ গাছপালা বা শস্যাদিকে চাষের দ্বারা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হতো। আজকালও জমির

উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য গাছপালার কচি সবুজ অংশকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু আছে। এই প্রথা এখন চাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উক্ত উপায়ে প্রাপ্ত জৈব সার বা পদার্থকেও সবুজ সার (Green manure) বলা হয়। গাছের বিভিন্ন অংশ পচিয়ে কম্পোস্ট সারে রূপান্তরিত না করেই এই পদ্ধতিতে সরাসরিভাবে ওদের জমিতে প্রয়োগ করা হয়।

**সবুজ সারের গাছের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of green manuring plant) :** সবুজ সার প্রয়োগ করার পর যে গাছপালা জন্মায়, সেই সব গাছের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়। যথা—(১) এই সব গাছের পাতা ও গাছের বৃদ্ধি অধিক পরিমাণে হয়। (২) এই সব গাছের ডাঁটা নরম ও ছিবড়াহীন হয়। নরম ডাঁটাযুক্ত গাছ তাড়াতাড়ি পচে যায়। (৩) এই সব গাছের শিকড় মাটির বেশ গভীরে প্রবেশ করতে পারে। ফলে এই গাছসমূহ মাটির নীচের স্তর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে উপরেও আনতে পারে। (৪) এই সারে জন্মান যে সব গাছের শিকড়ে গুটি থাকে, সেই সব গুটিস্থ জীবাণু বায়ুমণ্ডল থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন আত্মসাৎ করতে পারে। (৫) এই সব গাছের বৃদ্ধি প্রথম অবস্থায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত তালে হয়।

**সবুজ সার প্রয়োগের উপকারিতা (Benefits from green manuring) :**

এই সবুজ সার যেন মাটির বন্ধু। মাটির ভালো মন্দ, তার উর্বরতা সাধন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় যে সব কাজ করে, সেগুলিকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (১) সবুজ সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে ; কারণ সবুজ সার মাটির ভাণ্ডারে জড় করে দেয় অতি প্রয়োজনীয় ছ'টি উপাদান। যথা—নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, ক্যালসিয়াম, অন্যান্য খনিজ উপাদান এবং ভিটামিন। (২) সবুজসার জমির 'ঢাকা শস্য'রূপে কাজ করে মাটির উপরে জড় করে দেয় ফসলের ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারীর জন্য জমির নাইট্রেট ও অন্যান্য দ্রবনীয় উপাদান নষ্ট হতে দেয় না এবং মাটির ক্ষয় রোধ করে। (৩) লম্বা মূলযুক্ত সবুজ সারের গাছ মাটির নীচের স্তরের খাদ্য উপাদানগুলিকে শোষণ করে নিলেও, উহা নিম্নস্তরের খাদ্যোপাদানগুলিকে উপরের স্তরে সহজলভ্য অবস্থায় বর্তমান থাকার কাজে সাহায্য করে। (৪) প্রচুর জৈব পদার্থ সরবরাহ করার ফলে, মৃত্তিকাস্থ জীবাণুর কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। আর ঐ জীবাণুগুলি জৈব পদার্থ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এই জৈবিক ক্রিয়াকলাপের ফলে মৃত্তিকাস্থ জৈব পদার্থ হিউমাসে রূপান্তরিত হয়। এই হিউমাস মাটিকে জল ধারণের কাজে সাহায্য করে। তা ছাড়া বায়ু-চলাচল, জল-নিষ্কাষণ প্রক্রিয়াও মাটিকে সহজতর করে।

**সবুজ সারের উপযোগী শস্য (Crops suitable for green manuring) ঃ**
সবুজ সারের উপযোগী শস্যসমূহকে দু'ভাগে ভাগে করা যায়। যথা (১) অশিম্বিজাতীয় ( non-legumes ) এবং শিম্বি জাতীয় ( legumes )। প্রথম শ্রেণীর উদ্ভিদসমূহ বায়ুর নাইট্রোজেন-বন্ধন করতে সক্ষম হয় না। রাই, গম, সরিষা, মূলা, গাজর প্রভৃতি শস্যাদিকে অশিম্বিজাতীয় সবুজসার হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই সকল উদ্ভিদের মূল, পাতা, কাণ্ড প্রভৃতি জমিতে প্রয়োগ করলে জমির জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্ভিদসমূহের মূলস্থ নতুন-ব্যাকটিরিয়া ( nodule-bactaria ) বায়ুর মুক্ত নাইট্রোজেনকে বন্ধন করতে পারে। এই কারণে এই জাতীয় উদ্ভিদকে মাটিতে প্রয়োগ করলে মাটির নাইট্রোজেনের জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ধৈঞ্চা, বরবটি, আলফা, শণ, সয়াবীন কলাই, মটর, লাল ক্লোভার ছোলা প্রভৃতি শস্যকে শিম্বিজাতীয় সবুজসার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

**মেশানোর নিয়ম ঃ** কচি ও নরম অবস্থায় সাধারণতঃ সবুজ সারের গাছ-গুলিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। ডাঁটা একটু শক্ত হয়ে গেলে, উহা সহজে পচতে চায় না। পচনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। এই কারণে জমিতে জল সরবরাহ করা উচিত। সাধারণতঃ চাষের দ্বারা গাছগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ২।• সপ্তাহ পরেই ঐ জমি চারা রোপণ বা বীজবপনের উপযোগী হয়।

সবুজ সার পচনের জন্য চাই উপযুক্ত জল, বায়ু এবং নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্য ও কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের সরবরাহ। আর এই জীবাণুগুলি সবাত (acrobic) বলেই, ওদের শ্বাস ক্রিয়ার জন্য বায়ুর বিশেষ দরকার। ওদের জীবন ধারণের জন্য চাই নাইট্রোজেন ও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য। ওগুলির অভাব হলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। তখন বীজ বপন করলে ভালো ফসল পাওয়া যায় না।

**মূত্রজাত সার (Urenal manure) :** কম্পোষ্ট সার প্রস্তুতকরণ প্রসঙ্গে মূত্রের প্রয়োগ-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হ'য়েছে। মূত্রসারকে কিভাবে সংরক্ষণ ও প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হবে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দুটি উপায়ে গোচোনা ও মূত্র সাররূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যথা—(ক) **খোলা নালা পদ্ধতি** ( Open drain system ) এবং (খ) **শুষ্ক-মৃত্তিকা-পদ্ধতি** ( Dry earth system )।

**(ক) খোলা নালা পদ্ধতি ( Open drain system ) ঃ** সরকার পরিচালিত

খামারগুলিতে এই খোলা-নালা পদ্ধতিতে মূত্র সংরক্ষণ ও সময় মত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। পশুশালার পাকা মেঝের একপাশে "V" আকৃতির ১´ ফুট চওড়া ও ৪″ ইঞ্চি গভীর নালা ( gutter ) তৈরি করা হয়। এই নলটি একটি চৌবাচ্চার সঙ্গে যুক্ত থাকে। গবাদি পশুর মূত্র বা চোনা ঐ চৌবাচ্চায় জমা হওয়ার পর, ঐ গোচোনা সন্নিকটবর্তী সার গাদায় ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রণালীতে মূত্রের অপচয় বন্ধ করে কাজে লাগানো যায়। অনুরূপভাবে বিদ্যালয়ের প্রস্রাবাগারের মূত্রকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। খোলা ড্রেনের সাহায্যে কিভাবে ঐ মূত্র সংরক্ষণ ও চাষের কাজে লাগানো যায়, তার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তা' ছাড়া বিশেষ করে—শীতকালের রাত্রে গোয়ালের মেঝেতে যে, খড় কুটো বিছানো থাকে, সেগুলি রাত্রে গো-চোনায় সিক্ত হয়ে যায়। সকালে গোয়াল পরিষ্কার করার সময় ঐ সিক্ত খড়গুলো পাশের সার গাদায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে হয়। এইভাবে ক্রমান্বয়ে মূত্র-সিক্ত খড়কুটো সার গাদায় ফেলার দরুণ ২।৩ মাস পরে ওগুলি সারে পরিণত হ'লে, তা সাররূপে জমিতে প্রয়োগ করা যায়। ইহা অতি সুলভ ও সহজ পদ্ধতি।

(খ) **শুষ্ক মৃত্তিকা পদ্ধতি ( Dry earth system ) :** গ্রামের গরীব চাষীরাই সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অনুসারে মূত্র সংরক্ষণ ও তার প্রয়োগ-ব্যবস্থাও করে থাকেন। সেই ব্যবস্থাপনাটা এইরূপ। গ্রামের চাষীরা প্রতিদিন পশুশালার মেঝেতে কিছু পরিমাণ শুকনো মাটি ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে, তা প্রতি রাত্রে গোচোনায় ভিজে যায়। আবার সকালে মাটি বিছানো হয়। এইভাবে ৩।৪ সপ্তাহ অন্তর গোয়াল মুক্ত করার সময় ঐ মৃত্তিকা তুলে নিয়ে পাশের সার গাদায় ফেলে দেন। ঐ ভাবে গোচোনা থেকে অতি সহজেই এবং প্রায় নিঃখরচায় সার পাওয়া যায়।

**মল সংরক্ষণ ( Human night soil ) :** নিম্নলিখিত দু'টি উপায়ে মল সংরক্ষণ ও তার সদ্ব্যবহার করা যায়। যথা—(১) **শুষ্ক মৃত্তিকা চাপা-দেওয়া ও কাঁচা ড্রেন-পদ্ধতি** এবং (২) **গর্ত ভরাট করিয়া (By filling up pits).**

(১) **শুষ্ক মৃত্তিকা চাপা-দেওয়া ও কাঁচা ড্রেন-পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে মানুষের মলকে সারে পরিণত করার জন্য আনুষঙ্গিক একটি ট্রলি পায়খানার প্রয়োজন। কাঠের ফ্রেমের উপর টিন দিয়ে তৈরি কাঠের চাকা

লাগানো একটি চলমান পায়খানা নির্মাণ করে নিতে হবে। পায়খানাটি উদ্যানের একপ্রান্তে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে স্থাপন করতে হ'বে। ঐ পায়খানার নীচে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ৩০ সে. মি. গভীর ও ২০ সে. মি. চওড়া খোলা কাঁচা ড্রেন কেটে নিতে হবে। এই ড্রেনটার প্রথম প্রান্তে পায়খানাটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যে, প্রতিবার মলত্যাগ করার সময় যেন ঐ ময়লা কাঁচা ড্রেনটিতে পড়ে। মলত্যাগ ও শৌচাদির পর পায়খানার ভিতর থেকে এক মগ মাটি ঐ ড্রেনের মধ্যে মলের উপর ঢেলে দিতে হবে। এইজন্য পায়খানাটির ভিতরে একটা বড় বালতি মাটি ভর্তি করে রেখে দিতে হবে এইভাবে একাধিক ব্যক্তি ঐ পায়খানাটির ব্যবহার অন্তে ক্রমান্বয়ে মাটি দেওয়ার পর যখন গর্তের ৩০ সে. মি.র মত স্থান মাটিতে ভর্তি হ'য়ে যাবে, তখন ঐ ট্রলি পায়খানাটিকে সামনের দিকে ৩০ সে. মি. সরিয়ে দিতে হবে। এইভাবে একাধিক কাঁচা ড্রেন কমপক্ষে চার সারি বিশিষ্ট ৭।৮ মিটার স্থান ভর্তি হয়ে গেলে, ট্রলি পায়খানাটিকে বাগানের অপর এক প্রান্তে স্থাপন করতে হ'বে। মাস চারেক পর ঐ গর্ত ভর্তি করা কাঁচা ড্রেনের মাটি কুপিয়ে ভিতরকার সারের সঙ্গে মিশ্রিত করে নিতে হবে। এই মলজাত সার কপি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

**গর্ত ভরাট করিয়া ( By filling up pits ) :** বাসগৃহ থেকে অনেকটা দূরে কোন সমতল স্থান নির্বাচন করে একটি ৪৫ সে. মি. চওড়া × ৯০ সে. মি. গভীর গর্ত করতে হবে। ট্রলি পায়খানার সঙ্গে একটি ১ মিটার লম্বা টিনের চোঙ্ দিয়ে ঐ গর্তের সঙ্গে যোগ করা থাকবে। চোঙ্টি এমন ঢালু করে বসাতে হবে যে, পায়খানার পর শৌচাদি করলে, ময়লা যেন তৎক্ষণাৎ গড়িয়ে গিয়ে ঐ গর্তে পড়ে। তারপর প্রতিদিন পায়খানা করার পর ঐ গর্তে কিছু শুকনো মাটি ঢেলে দিতে হবে। আর গর্তটির উপরে থাকবে ঘরের চালের আচ্ছাদন। ঐভাবে গর্তটি ভরে গেলে, অর্থাৎ প্রায় মাস ছয়েক পরে ঐ মাটি সাররূপে ব্যবহার করা যাবে। তখন ট্রলি পায়খানাটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অনুরূপ ব্যবস্থায় পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এটা মল সংরক্ষণের অতি সহজ দেশী পদ্ধতি।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## হাঁস-মুরগী পালনের ক্ষুদ্রকেন্দ্র ( Small Poultry Farm )

**প্রস্তাবনা:** ভারতবর্ষে হাঁস-মুরগী পালনের রেওয়াজ ছিল সুপ্রাচীন কাল থেকে। শুনতে অবাক লাগে যে, বন্য-কুক্কুট প্রথম প্রতিপালিত হয়েছিল এই ভারতবর্ষে জনৈক গৃহীর ঘরে। সেই আদি গৃহপালিত মুরগীর বংশধরেরা আজ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র।

বর্তমানকালে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মুরগী পালনের উদ্যম দেখা গেছে আধুনিক ভারতে। তার প্রথম সূত্রপাত হয় প্রায় পঁচিশ বছরেরও আগে। ইজ্যাতনগরে পশু-চিকিৎসা গবেষণাগারের অধীনে স্থাপিত হয় হাঁস-মুরগী গবেষণা কেন্দ্র। এই সংস্থাই প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় মুরগী-পালন-সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের কাজে হাত দেয়। সেই সঙ্গে গৃহীত হয় বিশেষ-প্রশিক্ষণ-পরিকল্পনা। সেই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত জেলায় স্থাপিত হলো একটি করে গবেষণাগার এবং সম্প্রসারণ সংস্থা।

**মুরগী পালন কি এবং কেন:** ইংরাজী 'পোলট্রি' শব্দের অর্থ হলো গৃহপালিত নানা জাতের কুক্কুটাদি—যেমন পাতি ও রাজ হাঁস, পায়রা, মুরগী শাবক প্রভৃতি—যাদের মাংস ডিম বা পালকের জন্য প্রতিপালন করা হয়। মুরগী-পালন কেন্দ্রে যেসব মুরগী ও মুরগী-শাবক পরিবার রয়েছে, তাদের বিষয় ব্যবস্থার কথা আমরা এখানে আলোচনা করবো। এখনও আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ ক্ষুদ্রাকারে দেশী প্রথায় মুরগী পালন করা হয়। কিন্তু মুরগী পালনের বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল না জানা থাকার দরুণ এদেশের ঐসব ঘরোয়া মুরগী-পালন-ব্যবস্থা নানা কারণে—যেমন অনুন্নত জাতের মুরগী, বংশবৃদ্ধির মন্থরতা, উৎপাদন-স্বল্পতা উপরন্তু ব্যাধি-মড়ক প্রভৃতির জন্য—তেমন লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়ে উঠতে পারেনি।

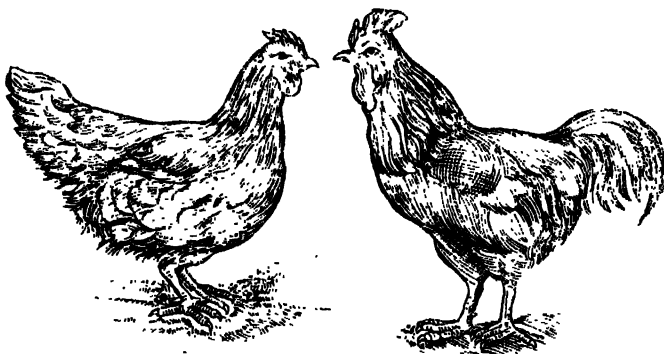
**হাঁস-মুরগীর পরিচিতি:** গৃহপালিত উপকারী পক্ষীদের মধ্যে হাঁস মুরগীরাই অন্যতম। সমস্ত পক্ষী জাতিই প্রধানত: দুইভাগে বিভক্ত। যথা—বন্য ( wild ) এবং গৃহপালিত ( domesticated )। আবার এই গৃহপালিত পাখীদেরও দুইটি শ্রেণী আছে—যেমন, **সৌখীন** ( fancy ) ও **উপকারী** ( utility )। কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না প্রভৃতি পাখীরা আমাদের কোন উপকারই করে না, অথচ আমরা সখ করে পুষে থাকি। এরাই সৌখীন পাখী। অন্যদিকে হাঁস ও মুরগীকে আমরা প্রয়োজনের জন্য সযত্নে পুষে থাকি।

মোষ গরুর মতই হাঁস মুরগীরও বিভিন্ন প্রজাতি আছে। নিম্নে কয়েকটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা গেল।

**খাঁকি ক্যাম্বেল ( Khanki Cambell Breed ) :**—এই প্রজাতির সৃষ্ট শ্রীমতী ক্যাম্বেল ( Mrs. Cambell ) নামে জনৈকা ভদ্রমহিলা। তিনি রোয়ান ( Roan ) হাঁসের সঙ্গে এক প্রকার সাদা হাঁসের মিলন ঘটিয়ে প্রথমে যে বাচ্চা তোলেন, সেই হাঁসের সঙ্গে মুলার্ড ( Mullard ) হাঁসের মিলন ঘটিয়ে এই নূতন জাতের সৃষ্টি করেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার নামানুসারেই এই নূতন হাঁসের নামকরণ করা হয় খাঁকি ক্যাম্বেল। এই প্রজাতির হাঁসগুলি এদেশীয় পাতিহাঁস-গুলি অপেক্ষা আকারে বড়। এদের গায়ের রঙ খাঁকি অথবা ধূসর।

দেশী হাঁসের মত এরা ভীরু প্রকৃতির নয়। বরং বেশ সাহসী এবং কষ্টসহিষ্ণু। এরা জল ছাড়া বেশ কিছুদিন থাকতে পারে। এই কারণে যে সব অঞ্চলে জলাশয়ের অভাব, সেখানে এই জাতীয় হাঁসের চাষ করা যেতে পারে এই প্রজাতির স্ত্রী-হাঁস বছরে ১৫০টি থেকে প্রায় ২০০ ডিম পাড়ে।

**রোড আইল্যাণ্ড রেড ( Rhode Island Red ) :** আজ থেকে ঊনআশি বছর আগে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার রোড আইল্যাণ্ড দ্বীপে এই



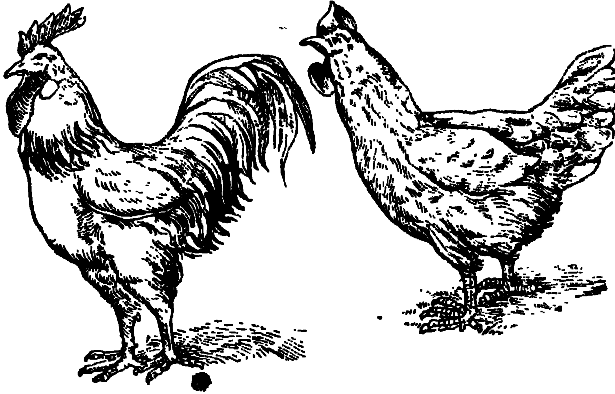
রোড় আইল্যাণ্ড রেড মোরগ-মুরগী

প্রজাতির জন্ম হয়। এদেশীয় মুরগী অপেক্ষা এই প্রজাতির মোরগ-মুরগীগুলি আকারে বড়। ভেলভেটের মত গাঢ় খয়েরী লাল বর্ণের পালকে এদের দেহ ঢাকা। এদের চেহারাটা বর্ণে ও দেহসৌষ্ঠবে বেশ দর্শনধারী।

**হোয়াইট লেগ হর্ণ ( White Leg Horn ) :** এই প্রজাতির জন্মভূমি ইটালির অন্তর্গত লেগহর্ণ নামক স্থান। ঐ স্থানের নামানুসারে এই প্রজাতির নামকরণ হয়েছে হোয়াইট লেগহর্ণ।

ধবধবে সাদা রঙ, আর টুকটুকে লাল ঝুঁটির সমন্বয়ে এই প্রজাতির মোরগ

মুরগীগুলোকে কি সুন্দর দেখায়। সাদা ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন রঙের এই প্রজাতির



লেগ হর্ণ মোরগ-মুরগী

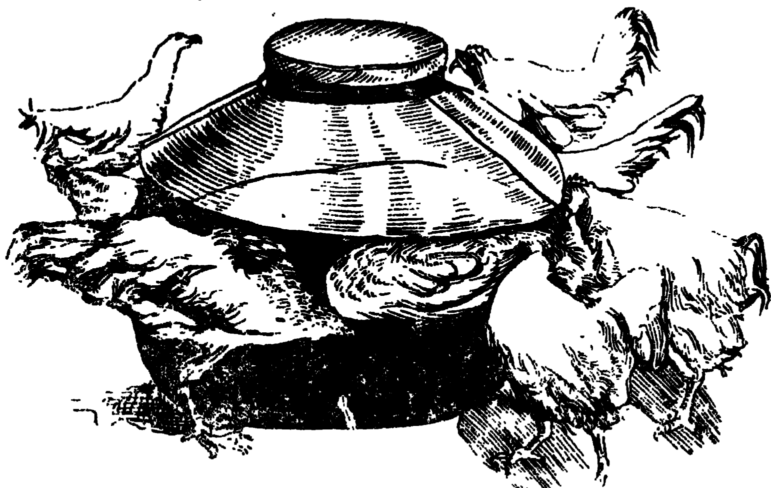
মুরগী দেখা যায়। তবে সাদা জাতের লেগ হর্ণ মুরগীই অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয়। আজকাল অবশ্য ব্রাউন লেগ হর্ণ পোষার প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**মুরগীর বাসস্থান ও সরঞ্জাম:** পোলট্রি-ব্যবস্থাপনা বা মুরগী পালনের কাজে হাত দেওয়ার আগে, সর্বপ্রথম দরকার একটা উপযুক্ত বাসস্থানের। প্রথমতঃ বাসস্থানটি এমনভাবে নির্মাণ করতে হ'বে, যাতে বাসাটি মুরগীদের পক্ষে নিরাপদ ও আরামপ্রদ হয়; দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে স্বল্প খরচে সব রকম সুবিধার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান হলে—যেখানে ভালো আলো বাতাস চলাচল করে না—তো কেবল মুরগীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হ'বে না; ডিম পাড়াও কমে যাবে।

**খাদ্য-পরিবেশনের চুঙ্গী (Feed Hopper):** মুরগীদের খাদ্য পরিবেশনের সময় তাদের বয়স, আকার ও প্রকৃতির কথা চিন্তা করেই পরিবেশনের পাত্র নির্বাচন এবং পরিবেশনার ব্যবস্থা ঠিক করতে হ'বে। মনে রাখতে হবে যে, পাত্রটির গঠন আকৃতি এমন হওয়া উচিত, যাতে আহার্য গ্রহণের সময় সেই খাদ্য মুরগীরা ফেলাছড়া করতে না পারে। সেইজন্য খাদ্য-পরিবেশনের চুঙ্গী বা ফিড হপার-এর সৃষ্টি হয়েছে। এই পাত্রের লম্বা চোঙার অংশে অর্ধ ভাঙা শস্যকণাদি মজুত থাকবে। সেটা এমনভাবে নীচের ডালার সঙ্গে লাগানো থাকে যে, খাদ্য গ্রহণের সময় মুরগীর নাড়াচাড়ায় উপরের চোঙাটি যেই একটু ঘুরে যাবে, অমনি ঐ পাত্রের চারিদিকের ছিদ্রপথ দিয়ে প্রয়োজনমত মিশ্রিত খাদ্যাদি বার হয়ে আসবে। সেইগুলো মুরগীরা মনের আনন্দে গ্রহণ করবে। আর সেগুলি ছড়িয়ে পড়ে

নোংরাও হবে না। আজকাল প্রত্যেক মুরগী পালনকেন্দ্রে বাচ্চা ও ডিমপাড়া মুরগীদের জন্য পৃথক পৃথক ধরনের ফিড্ হপার ব্যবহার করা হয়।

**খেতে দেওয়ার নিয়ম (Feeding Methods)** উপযুক্ত, সুসম খাদ্য দিতে না পারলে যেমন ছোট মুরগীর বিকাশ বৃদ্ধি স্বাভাবিক হবে না, তেমনি ডিম পাড়ার



মোরগ-মুরগীদের খাদ্য পরিবেশন চুঙ্গী

পরিমাণও আনুপাতিক হারে কম হবে। এই কারণে বয়সানুপাতিক মুরগীদের খাদ্যাদি কি হবে, সে সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে। তারই ভিত্তিতে মুরগী-পালক-বিশেষজ্ঞরা যে পরামর্শ দিয়েছে, সেই সূত্রেই সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সাতটি প্রথা এখন অনুসৃত হচ্ছে। যথা—(ক) **কেবল শস্যকণা বণ্টন বা স্ক্রাচ জাতীয় খাদ্য,** (খ) **গোটা ও আধ-ভাঙা-পেষিত শস্য,** (গ) **কেবল পেষিত শস্য,** (ঘ) **আর্দ্র-মিশ্র শস্য,** (ঙ) **পিলেট পদ্ধতি,** (চ) **রুচি মাফিক-খাদ্য** (ছ) এবং **গৃহ-মিশ্রিত খাদ্য।**

(ক) **কেবল শস্যকণা বণ্টন অথবা স্ক্রাচ পদ্ধতি** ( All grain or All scratch method) : বড় বড় যে সব মুরগী-শাবক বেশ বড় ঘাস পাতা খুঁটে খেতে শিখেছে, তাদের নিয়মিত কেবল শস্যাদি দিলেই, তারা দিব্যি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে।

(খ) **গোটা ও আধ-ভাঙা পেষিত শস্যাদি ( Grain and Mash Method ) :** উঠতি বাচ্চা মুরগী, আর ডিমপাড়া মুরগীদের উপযুক্ত খাদ্য হচ্ছে শস্যাদি ও পেষিত শস্যাকণা। এই পদ্ধতিতে মুরগী-শাবক বা মুরগীরা অনেকগুলি

শস্যাদির মিশ্রিত পেষিত খাদ্য খেতে পায়। সেই সঙ্গে মানুষের ভুক্তাবশেষ, ধাতুজ খাদ্যপ্রাণ প্রোটিন ও খাদ্যপ্রাণ মিশ্রিত যা খাদ্য পরিবেশন-চুঙ্গীর মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। অতি ছোট মুরগী শাবকরা তো ঐ মিশ্রিত পেষিত খাদ্যই গ্রহণ করে থাকে।

(গ) **কেবল পেষিত শস্য ( All-mash Method ) :**

সুষমখাদ্য বিচারের দিক থেকে এই কেবল পেষিত শস্যাদিই খাদ্য হিসাবে দ্বিতীয় স্তরের। প্রকৃত প্রস্তাবে এর সঙ্গে পূর্ববর্তী খাদ্য পরিবেশনা পদ্ধতির বিশেষ কোন তফাৎ নেই বল্লেই চলে। ডিমপাড়া মুরগীদের পক্ষে এইধরণের খাদ্যই আদর্শস্থানীয়।

(ঘ) **আর্দ্র পেষিত খাদ্য ( Wet-mash Feeding ) :**

এই পদ্ধতিটির এমন কতকগুলি অসুবিধা আছে, যার দরুণ আর্দ্র পেষিত খাদ্য প্রণালী কোন বড় মুরগী-পালনকেন্দ্রের জন্য সুপারিশ করা যায় না। তা'ছাড়া এর জন্য শ্রম ও লোকের প্রয়োজন হয়, তার অভাবে এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তোলা কঠিন। উপরন্তু স্বাস্থ্য-বিধি-সম্মতভাবে এই ভাত-ফেন মিশ্রিত-শস্যাদিকে অদূষিত অবস্থায় পরিবেশন করাটাও অসুবিধাজনক। তবে যেখানে হোটেল বা ছাত্রাবাস আছে, সেখানে রান্নাঘরের ভুক্তাবশেষ ফেন-ভাত তরকারীর অংশ বিশেষ পেষিত খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে মুরগীর খাদ্যরূপে পরিবেশন করা সম্ভবপর।

(ঙ) **পিলেট পদ্ধতি ( Pellet Method ) :** পিলেট কথাটার অর্থ বটিকা। এই পদ্ধতির মাধ্যমে পেষিত-মিশ্র শুষ্ক-শস্যাদিকে উচ্চচাপের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত নলাকার খাদ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। তারপর সেগুলি বয়স অনুপাতে মুরগীদের খেতে দেওয়া হয়। বয়সোপযোগী ছোট বড় আকারের এই খাদ্যগুলি খাদ্য-চুঙ্গীর মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। ছোট ফার্মের মালিক এবং অনগ্রসর মুরগীপালন-কেন্দ্রের লোকেরা এই পদ্ধতিটিকে বিশেষ পছন্দ করেন। তাঁরা বলেন যে, নির্ঝঞ্ঝাটে মুরগীদের সুষম খাদ্য পরিবেশন করা যায়। হাঁস মুরগীদের উপযোগী কৃত্রিম খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপিত হ'লে এর ব্যবসায়িক মূল্যবৃদ্ধি পেতে পারে।

(চ) **রুচি মাফিক খাদ্য (Free Choice Method) :** এই পদ্ধতি অনুসারে মুরগী শাবক বা বড় হাঁস মুরগীদের সুষম খাদ্যবস্তু সরবরাহ করা হয় না। তার পরিবর্তে বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় এক একটি খাদ্য চুঙ্গীতে আলাদা আলাদা ধরণের খাদ্যবস্তু পরিবেশন করা হয়। তাতে মুরগীরা যা' পছন্দ করে, সেই খাদ্যই পেটভরে খেয়ে নেয়।

(ছ) **গৃহ-মিশ্রিত খাদ্য ( Home-mixture Method ) :** এই জাতীয় খাদ্য

মুরগীপালক ছোট ছোট চাষী পরিবারের লোকেরাই ফরমুলা অনুসারে বানিয়ে নিতে পারেন। এর সঙ্গে কিছু আধ ভাঙা শস্যকণা, খাদ্য-প্রাণ ও ধাতব পদার্থ প্রয়োজন মত মিশিয়ে নিলে সুষম খাদ্যে পরিণত হ'বে।

**ডিম ফোটানো ও বাচ্চা পালন ( Brooding and Rearing ) :** মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থাগমের ব্যবস্থা করাটাই মুরগী-পালনকেন্দ্রের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের আগে এমন কতকগুলো জ্ঞাতব্য বিষয়— যেমন, ডিম নির্বাচন করা, কিভাবে ডিম ফোটানো হবে, তা ঠিক করা; অথবা স্বাভাবিকভাবে মুরগীর দ্বারা ডিম ফুটাতে হ'লে, সুবিধা ও সতর্কতার জন্য কি ব্যবস্থাপনার দরকার, তা ঠিক করে নিতে হ'বে।

**ডিম নির্বাচন :** এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সব ডিমে তা' দিলেই কিন্তু বাচ্চা ফোটে না। কারণ দু' রকমের ডিম পাওয়া যায়। যথা—অনুর্বর বা ভূয়া, উর্বর ডিম। এই শেষোক্ত ডিম থেকেই বাচ্চা জন্মান যায়।

উর্বর ডিমকে এক কথায় নিথর জীবন্ত-সত্তা বলা যায়। অবশ্য সে-প্রাণ থাকে সম্ভাবনার বীজে ঘুমিয়ে। নীরোগ প্রাপ্তবয়স্ক মুরগী এক বছরের শেষ দিকে এবং দ্বিতীয় বছরের প্রথম দিকে যে সব ডিম পাড়ে, তার অধিকাংশই উর্বর ডিম। তা ছাড়া **তা'-দেওয়ার-ঋতুতে** যদি ব্যধি, মৃত্যু অথবা বন্ধ্যাতার কারণে মোরগ বদলের প্রয়োজন হয়, তখন ১৫ থেকে ২০ দিনের ব্যবধানে ডিম সংগ্রহ করলে, উর্বর ডিম পাওয়া যাবে। ডিমের জীবনীশক্তি বাড়ানোর জন্য এই সময় মোরগ ও মুরগী—উভয়কেই উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিনযুক্ত খাদ্য দিতে হবে।

**ডিম-ফোটানোর ব্যবস্থা :** ডিম সংগ্রহ ও নির্বাচনের পর বাচ্চা তোলার পর্ব। দু'রকমে ডিম থেকে বাচ্চা তোলা যায়। যথা (ক) তা-দিয়ে (স্বাভাবিক ভাবে মুরগীর সাহায্যে) (খ) কৃত্রিম উপায়ে।

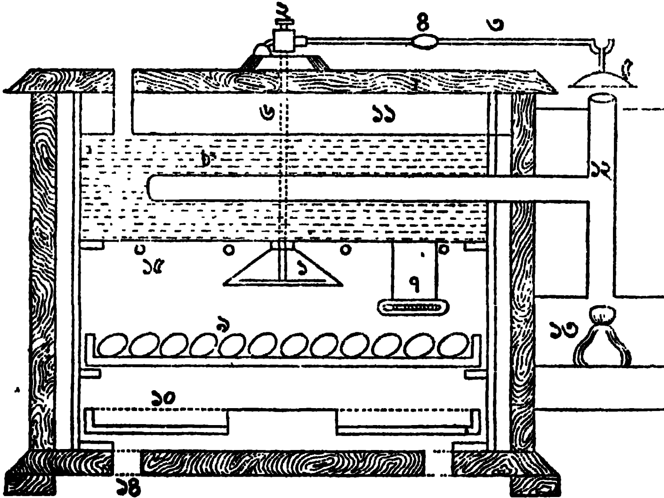
**(ক) তা-দিয়ে :** তা-দিয়ে ডিম ফোটাতে হ'লে, 'তা-দিতে' ইচ্ছুক এমন মুরগী নির্বাচন করে বিকেলের দিকে ডিমে বসাতে হবে। তার আগে একটা নির্জন স্থান ঠিক করে, সেখানে একটা খোপ বা ঝুড়ির মধ্যে ধানের তুষ আর খড়কুটো দিয়ে বাসা সাজিয়ে দিয়ে মুরগীটিকে বসিয়ে দিতে হবে। এই বাসার খড়কুটোগুলোর উপর ডি-ডি-টি ছিটিয়ে নিতে হবে। প্রথমত তিন দিন মুরগীটাকে বাসায় (খোপে হলেই সুবিধা হয়) আটকে রাখতে হবে এবং দিনে, মিনিট বিশেকের জন্য ছেড়ে দিতে হবে খাওয়া-দাওয়ার জন্য।

দেশী মুরগীই ভালো তা'-দিয়ে ডিম ফুটাতে পারে। তবে একসঙ্গে ৬-১০টার বেশী ডিম দেওয়া উচিত নয়। কোন কোন ডিম ফুটবে, তা পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে ডিম বসানোর পরের সপ্তম বা নবম দিনে। সম্ভব হলে আর একবার ১৫ বা ১৬ দিনের দিন। তখন যে সব ডিমের খোসার উপর কোন লক্ষণের চিহ্ন না ফুটে উঠে, তবে সে ডিমগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ১৮ দিনের পর থেকে মুরগীকে বিরক্ত করা চলবে না। তখন খোপ বা বাসা খোলা রাখতে হবে, যাতে মুরগীটা ইচ্ছে মতন পান-আহার করতে পারে। ২০ থেকে ২১ দিনের মধ্যে সব ডিম ফুটে যায়।

সব ডিম ফুটে যাওয়ার পরেই খড়কুটো, ভাঙা ডিমের খোসাগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে। বাসাটি আর একবার নির্বীজন করে নিতে হবে। তারপর বাচ্চা আর তাদের মাকে একান্তে নির্জনে দু'দিন আটক রেখে দিতে হবে। ঐ দুদিনে ওদের কোন আহার্যের প্রয়োজন হয় না।

**কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানোর আধুনিক যন্ত্র ( Incubator ):**

সাধারণতঃ দু' রকমের ডিম ফুটানোর যন্ত্র বা ইনকিউবেটার আছে। (১) ফ্ল্যাট




কেরোসিন ইন্‌কিউবেটর : (১) ক্যাপসুল্; (২) স্ক্রু; (৩) লিভার-দণ্ড; (৪) ভার; (৫) ঢাক্‌না; (৬) ঠেলা-দণ্ড; (৭) থার্মোমিটার; (৮) জলাধার; (৯) ডিম রাখার টানা; (১০) জলের পাত্র; (১১) বাচ্চা রাখার টানা; (১২) চিমনি; (১৩) বাতি; (১৪) বায়ু-প্রবেশের পথ; (১৫) বায়ু-নির্গমনের পথ।

টাইপ, (২) ক্যাবিনেট টাইপ। এগুলি আবার দু' ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। যথা গরম বায়ু অথবা গরম বাষ্প দ্বারা। এগুলি আবার তেলবাতি বা বৈদ্যুতিক

তাপ দ্বারা চালিত হয়। এই যন্ত্রগুলি চালু করার আগে, প্রথম দরকার বিশুদ্ধি করণের। ফরম্যালডিহাইড (Formaldehyde) এর গ্যাসীয় ধোঁয়ার দ্বারা যন্ত্রের ভিতরটা ভালো করে নির্বীজন করে নিতে হয়। তারপর ঠিক সমান্তরাল ভাবে বসিয়ে চেম্বার বা কক্ষগুলো ঠিক করে নিতে হবে।

**নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা (Regulating Incubation):** ডিম ফুটানোর মরশুমের প্রথমেই যন্ত্রটি ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে। যন্ত্র—নূতন বা পুরাতন যাই হোক না কেন,—সর্বক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া দরকার। যে বাতি জ্বালানো হবে, তাতে নূতন যথেষ্ট লম্বা ধরণের সলতে থাকা চাই। এই যন্ত্রে ১০৩° ফারেনহিট তাপ থাকবে চব্বিশ ঘন্টার জন্য। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত থারমোস্ট্যাট (Thermostat) ঘুরিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

**ডিম স্থাপনা:** প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলে, ডিমগুলি সারিবদ্ধভাবে অথবা পাশাপাশিভাবে সাজিয়ে নিয়ে যথাক্রমে ফ্ল্যাট ও ক্যাবিনেট টাইপ যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। কিন্তু একটা ডিমের সারির উপর আর কোন ডিম বসানো চলবে না। তারপর দরকার তাপ সংযোগের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাটা অতি অবশ্যই সকালেই চালু করতে হবে। তা হ'লে প্রথম বারো ঘণ্টা ভালো করে লক্ষ্য করা যাবে। আর ঠিক করে নেওয়া যাবে যে, তাপমাত্রা প্রয়োজনানুপাতিক হয়েছে কিনা।

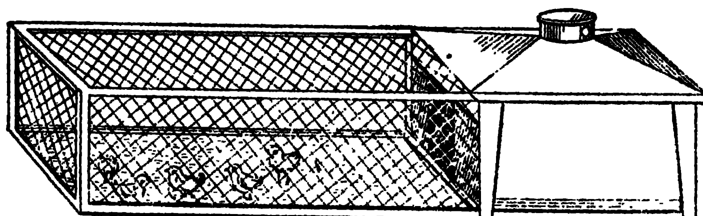
**বায়ু ও বাষ্প সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ (Regulating Ventilation & Moisture):**

দমকা ঝড়ো হাওয়া যাতে বাইরে থেকে এসে উপর দিয়ে বয়ে যেতে না পারে, সেইজন্য ডিম ফুটানোর কৃত্রিম যন্ত্রটিকে ঘরের মধ্যে বসাতে হবে। ক্রমে যখন ডিমের মধ্যে প্রাণের জন্ম হয় এবং তারা দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে, তখন তাদের খোসার ভিতর থেকে একটা দুর্গন্ধ বার হতে শুরু করে। তখন একদিকে যেমন অধিক মাত্রায় বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় জলীয় বাষ্পের। সেইজন্য এই সময় বিশুদ্ধ বায়ু, আর গরম জলের ছিটে দেওয়ার দরকার হয়। ডিম উল্টানোর সময় এই গরম জলের ছিটে দিতে হবে। আর নার্শারী কক্ষে রাখতে হয় ভিজে বালি। এইভাবে দূষিত বায়ু নিষ্কাষণ করে গরম জল সিঞ্চন করে বায়ু সঞ্চালন ও আর্দ্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

**'তা'-দেওয়া কালীন যত্ন (Care during hatching):** এই পন্থা অনুসৃত হওয়ার পর যদি ২১ দিনের আগেই বাচ্চা ডিমের খোসা ভেঙে বার হয়ে আসে,

তবে বুঝতে হবে ডিমগুলোয় ভালো ভাবেই তা' দেওয়া হয়েছে। পরিণত জ্রূণ-গুলো যখন ডিমের খোসার উপর ঠোঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করবে, তখন বুঝতে হবে তাপ উঠেছে উর্দ্ধমাত্রায়, ওদিকে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেক কমে গেছে। ১৯ দিনের দিন নার্শারি-ট্রে তৈরি রাখতে হবে। তখন যন্ত্রটিকে বন্ধ করে দিতে হবে, যতক্ষণ না ডিম ফোটার পর্ব শেষ না হয়। বাচ্চাগুলো আলোর জন্যে সামনের দিকে এগিয়ে আসামাত্র নার্শারী ট্রেতে এসে পড়বে। ২২ দিনের দিন সব ডিম—যা ফোটেনি, মরা বাচ্চা, ডিমের খোসা-সমেত ট্রেগুলি সরিয়ে এনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

**নূতন বাচ্চার যত্ন (Care of New Hatch):** এবার ডিম থেকে বেরিয়ে আসা বাচ্চাগুলোকে ঐ ইনকিউবেটার যন্ত্রের উষ্ণতার মধ্যে ৩৬ ঘণ্টা



নবজাতবাচ্চাদের উষ্ণঘর (Brooder) এবং উহার সংলগ্ন জালের ঘর

কিছু না খেতে দিয়ে রাখতে হবে। তারপর ওদের সর্বাঙ্গ বেশ শুকনো খটখটে হয়ে গেলে, ক্রমে তাপমাত্রার পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। আলো বাতাসের দরজাটাও ঈষৎ ফাঁক করে দিতে হবে। এই সময় ক্ষীণ দুর্বল বাচ্চাগুলো মেরে ফেলে ভালো বাচ্চাগুলোকে সাবধানে ঈষৎ উষ্ণ (৯০°—৯৫° ফাঃ) ঘরে বা ব্রুডারে রেখে দিতে হবে।

## কয়েকটি মারাত্মক ব্যাধি ও তার চিকিৎসা:

ভারতবর্ষে হাঁস মুরগীদের মধ্যে যে সব ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়, তার অধিকাংশই সংক্রামক বীজাণুঘটিত ব্যাধি (Viruses and Bacteria) বিশেষ। এর মধ্যে কয়েকটি ব্যাধি উৎকট ধরণের, যার মধ্যে দু' একটি আবার মহামারীরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। যেমন—**রাণীখেত, মোরগ-বসন্ত, মোরগ কলেরা** প্রভৃতি। এছাড়া, আরও কয়েকটি সংক্রামক ব্যাধি আছে। যেমন—**টিক জ্বর, এভিয়ান লিউকসিস, সংক্রামক ক্রোয়জ্যা, টিউবারকিউলসিস** প্রভৃতি। নিম্নে কয়েকটি ব্যাধির লক্ষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হল।

**রানিখেত ব্যাধি ( Ranikhet Disease ) :** এই রোগ আবার নিউকাসেল ( New castle ) ব্যাধি নামেও পরিচিত। এ অতিশয় মারাত্মক ধরণের সংক্রামক ব্যাধি, যার প্রকোপে একটা বড় মুরগী উপনিবেশও উজাড় হয়ে যায়।

**ব্যাধির লক্ষণ :** এই ব্যাধি বয়স নির্বিশেষে সকল মোরগ-মুরগীদের মধ্যে দেখা দেয়। বিশেষ করে, অল্প বয়সের মুরগী-শাবকরা এই রোগে আক্রান্ত হলে, তাদের হাঁচি-কাশি থেকে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। মহামারীরূপে এই রোগ দেখা দিলে কিছু বোঝার আগেই ঝাঁকে ঝাঁকে কচি শাবকগুলো মারা যায়। জলের মত সবুজ, দুর্গন্ধময় পায়খানা হ'তে থাকে। এই পায়খানাকালীন যে সব মুরগী-শাবক বেঁচে থাকে তাদের স্নায়বিক দুর্বলতার লক্ষণ—যেমন ঘাড় পিছনে, দেহের নীচে ঘন ঘন বাঁকানোর প্রবৃত্তি দেখা যায়। ডানায়, পায়ে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দেয়, ক্ষুধা থাকে না, হাঁটার সময় ঘুরপাক খেতে থাকে, আড়ষ্ট, নিস্তেজ অবস্থায় ঘরের কোণে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই ব্যাধিতে মৃত্যুহার দাঁড়ায় ৮০।৯০%।

**চিকিৎসা :** চিকিৎসায় অবশ্য তেমন কোন সুফল পাওয়া যায় না। তবে প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে প্রফিল্যাকটিক ভ্যাকসিন ( Prophylactice Vaccine ) এর ইন্‌জেকশন দিলে, মুরগীদের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ঐ ব্যাধিতে সহজে ওরা আক্রান্ত হয় না। আজীবন ঐ শক্তি সক্রিয় থাকে। এইভাবে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

**মোরগ-বসন্ত ( Fowl Pox )** মোরগ বসন্তও একটি ভীষণ ছোঁয়াচে ও অতি সংক্রামক ব্যাধি। সব বয়সের মোরগ-মুরগীরা এই রোগে আক্রান্ত হয়। তবে মোরগ-শাবকেরা যেমন বেশী আক্রান্ত হয় তেমনি তত তাড়াতাড়ি মারা যায়।

**লক্ষণ :** এই ব্যাধি তিন রকমে আত্মপ্রকাশ করে। যথা (১) চামড়া বা ত্বকের উপর ( cutaneous form ) (২) মুখে ও গণ্ডদেশের উপর (৩) নাক ও চোখের উপর। চোখে, মুখে, ঠোঁটে, চামড়ায় হলুদ বর্ণের ঝিল্লিময় পুঁজে ভর্তি মনোরম গুটি দেখা দেয়।

**চিকিৎসা :** আক্রান্ত মুরগীদের চিকিৎসা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বিশেষ করে যাদের মুখের ভিতরে বাইরে বসন্ত আত্মপ্রকাশ করে। চামড়া বা ত্বকের উপর যে বসন্ত দেখা দেয়, তার অবশ্য চিকিৎসা করা যায়। প্রথমে চামড়ার পর্দাটা তুলে ফেলতে হয়; তারপর সিলভার নাইট্রেট দণ্ড দিয়ে ক্ষত স্পর্শ করা, অথবা পিকরিক এ্যাসিড কারবোনেটেড্ ভেসলিনের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেওয়া।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## কাতাই ও সাধারণ বয়ন ( Spinning and Simple weaving )

**প্রাচীন ইতিহাস :** কাতাই বলতে গান্ধীজী বুঝতেন এক পূর্ণাঙ্গ শিল্পকে। ভুনাই-ধুনাই-কাতাই থেকে বুনাই পর্যন্ত—শিল্প-কর্মের এই ধারাটিকে তিনি কাতাই-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কেননা কাতাইয়ে যার সূচনা, বয়নে তার পরিণতি। তাই এই কাতাইকে কেবল সুতো-কাটার কাজ হিসাবে না দেখার সঙ্গত কারণও আছে। প্রাচীন ভারতেও বয়ন শিল্পের এই অখণ্ড রূপ ছিল। তখন কাপাসের তুলো সংগ্রহ করা থেকে বুনাই বা বয়ন পর্যন্ত সবটাই যেন ছিল একই সূত্রে গাঁথা। একদা ভারতীয় তাঁত-শিল্পের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। এহেন যে বয়ন-শিল্প, তার ইতিহাসও সুপ্রাচীন। খ্রীষ্ট জন্মের চার পাঁচ শতাব্দী পূর্বে রচিত জৈন আচারঙ্গ সূত্রে বাংলার বসন-বিলাসের কথার উল্লেখ আছে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, তদানীন্তন কালের রাধা নগরীর ( বর্তমান বর্ধমান অঞ্চলের ) অধিবাসীরা আদুল গায়ে রাস্তায় বার হওয়াটাকে অশালীন বলে মনে করতেন। সে যুগের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত টেরাকোটা-শিল্পে বিচিত্র-বস্ত্র-পরিবৃত যে সব নরনারীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি নির্মিত হ'য়েছিল খ্রীষ্টজন্মের তিন চার শ' বছর আগে। সেগুলি নিঃসন্দেহে বাংলার তাঁত-শিল্পের উজ্জ্বল নজির। বাঙালীর এই বসন-বিলাসের আরও নিদর্শন পাওয়া গেছে পরবর্তী যুগের নানা ভাস্কর্যে। সেই পাষাণে খোদিত বিচিত্র বস্ত্র পরিহিত যে সব মূর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেই সুপ্রাচীন কালে বাংলার বয়ন-শিল্প কী উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

একদা সিন্ধু নদের উপকণ্ঠে উৎপন্ন কাপাস পারস্য দেশবাসীদের কাছে 'সিনদোন' (Sindon) নামে সুপরিচিত ছিল। এমন কি খ্রীষ্টজন্মেরও কয়েক হাজার বছর আগে মিশরের মমী করা শবদেহে যে সূক্ষ্ম কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ জড়ানো হতো, সেগুলিই ছিল ভারতাগত মসলিন বস্ত্র। একদিন এই মসলিনের কি কদর ছিল সেকালের বোগদাদ-রোম-চীনে। মহেনজোদড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে যে রঙিন বস্ত্রখণ্ড পাওয়া গেছে, তা বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এযুগেও শান্তিপুর, ধনেখালি ও বেগমপুরের তাঁতের শাড়ীর নাম ডাক আছে। মুর্শিদাবাদের বালুচরের সিল্কের শাড়ী আজও বাংলার গৌরব।

**কাতাই বা সুতা কাটা :** কাপড় বোনার সুতা উৎপন্ন হয় কাপাস তুলা থেকে। এই তুলা পাওয়া যায় কাপাস গাছের বীজ-আঁশ থেকে। কাজেই এই

কাতাইয়ের উপাদান যে তূলা, সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। এই কারণে কাতাই-শিল্পের পূর্বাপর প্রতিটি স্তর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

**কাপাস :** যত রকমের তন্তু বা আঁশ আছে, তার মধ্যে কাপাসের আঁশই সহজলভ্য। ব্যবহারের দিক থেকেও সুবিধাজনক। দেশভেদে অনেক রকমের কাপাস দেখা যায়। যথা— (১) ক্ষেতী বা বর্ষজীবী ও (২) দীর্ঘজীবী বা দেব কাপাস। ক্ষেতী কাপাস এক বছরের বেশি ভাল ফল দেয় না, কিন্তু দেব কাপাসের গাছ আট দশ বছর নিয়মিত তূলা দিয়ে থাকে। এজন্য দেব কাপাসের গাছ লাগানোই সুবিধা।

**কাপাস তোলা :** সুপক্ক অথচ যে কাপাসে পোকা বা দাগ লাগেনি, এমন কাপাসই খুব সকালের দিকে তোলা উচিত। এভাবে তোলা কাপাস কিছুদিন খোলা বাতাসে রেখে দিতে হয়।

**বীজ ছাড়ানো :** কাপাসের বীজ আগে ছাড়িয়ে রাখতে নেই, 'তুনাই' বা পাঁজ করার সময় কাপাস থেকে বীজ ছাড়ানোটাই ভাল। হাত দিয়ে বীজ ছাড়াতে অনেক সময় লাগে। তা' ছাড়া হাতের চাপে তূলার আঁশগুলিও ছিঁড়ে যেতে পারে। এই কারণে তক্তার পাটায় একটু কৌশলে বীজগুলি ছাড়িয়ে নিতে হয়। সেজন্য প্রয়োজন একটি ৮″ × ৪″ ছোট তক্তার। এর উপর বীজ যুক্ত তূলা রেখে তার উপর আধ ইঞ্চি মোটা লোহার শিক দিয়ে রুটি বেলার মত চাপ দিলে, বীজগুলি উপরের দিক দিয়ে কাঠের নীচে পড়বে।

**তুনাই :** জমাট বাঁধা তূলাকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেওয়ার যে পদ্ধতি, তাকে বলে **তুনাই**। দু'ভাবে এই তুনাই করা যায়। যথা **ছুরি তুনাই** এবং **ধনুষ তুনাই**। পাঁচ ছ' ইঞ্চি লম্বা বাঁশের একটি খণ্ডকে কলম-কাঁটার মত করে নিয়ে, তার দ্বারা যে তুনাই করা হয়, তাকে বলে **ছুরি তুনাই**। আর বাঁশের ধনুকে শক্ত ছিলা পরিয়ে যে ধুনাই করা হয়, তাকে বলে **ধনুষ তুনাই**।

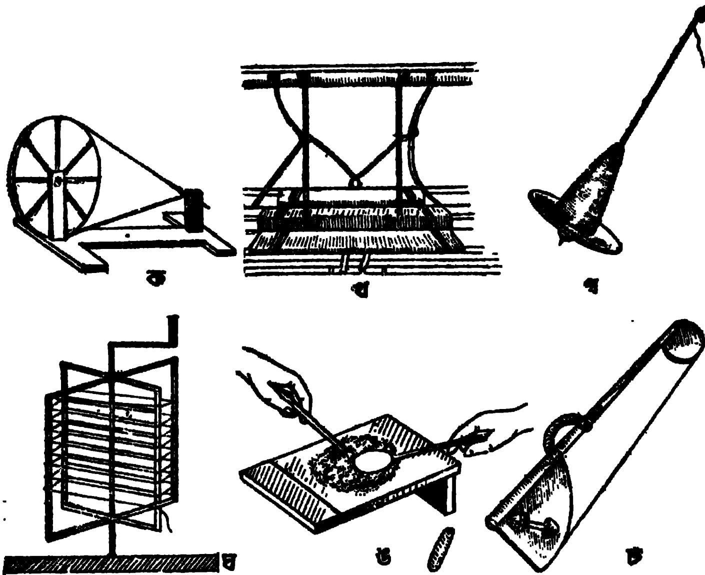
**পুনাই বা পাঁজ করা :**

এই পুনাই বা পাঁজ করার জন্য প্রয়োজন তিনটি জিনিসের। যথা একটি ঢালু পাঁজ পিঁড়ি, একটি হাতা-ওয়ালা ইস্ত্রি যন্ত্রের মত ছোট হাতা, এবং একটি আধ ইঞ্চি মোটা লৌহ বা বাঁশের শলাকা। তুনাই করা খানিকটা তূলা পাঁজ পিঁড়ির উপর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর লোহার বা বাঁশের শলাকা রেখে হাতার সাহায্যে রুটি বেলার মত চাপ দিতে হয়। তার ফলে শলাকায় জড়িয়ে তূলোটা যখন পাঁজ পিঁড়ির নিচের দিকে নেমে আসে, তখন ডান হাতে ধরা হাতাটা দিয়ে বেশ জোর

করে চেপে ধরতে হয়, এবং বাঁ হাতে ধরা শলাকাটিকে তুলোর ভিতর থেকে টেনে বার করে নিলেই দিব্যি একটি পাঁজ তৈরি হয়ে যাবে। হাতার শেষ চাপে শলাকা-মুক্ত তুলোর পাঁজটি হাতার চাপে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। এ ধরণের ঈষৎ চ্যাপ্টা পাঁজ থেকে সুতো কাটতে বিশেষ সুবিধা হয়।

**সুতা :** মোটামুটি তিন প্রকার সুতার ব্যবহার দেখা যায়। যথা—**কাপাসের সূতা (Cotton), রেশম (Silk)** এবং **পশম (Wool)**। কাপাসের তুলা থেকে দু প্রকারে সুতা কাটা হয়—**(ক) তক্‌লির** সাহায্যে ও **(খ) চরকার** সাহায্যে।

**সুতা কাটা :** পাঁজ করা তুলা থেকে তকলি বা চরকার সাহায্যে সুতা কাটা হয়। সুতা কাটার জন্য সর্বপ্রথম তকলিই ব্যবহৃত হত। তার অনেক পরে




ক—চরকা, খ—তাঁত, গ—তকলি, ঘ—সুতা নাটাই, ঙ—পাঁজপিঁড়ি, চ—ধুনাই।

আবিষ্কৃত হয় নানা ধরনের চরকা। চরকাতে দ্রুতগতিতে অনেক সুতো কাটা যায়। তৎসত্ত্বেও তকলিতে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা থাকার দরুণ এখনও চরকার সঙ্গে তকলির ব্যবহার অব্যাহত আছে।

**তকলি :** একটি সুতা কাটার প্রথম উদ্ভাবিত যন্ত্র। উপকরণ বলতে কল কব্জার কোন কলা কৌশল নেই। অতি সাধারণ গঠনাকৃতি। একটি এক ইঞ্চি

ব্যাসযুক্ত পিতলের সরু চাকতির মধ্যে লোহার সরু শিক বসিয়ে তকলি তৈরী। তকলির চাকতির ভিতর দিয়ে যে সরু শিকটা গিয়েছে, তার নীচের বাড়তি অংশটা সরু বা ছুঁচলো থাকে। আর তকলির কাঠির মাথায় সূতা আটকে রাখার জন্য খাঁজ কেটে নেওয়া হয়।

একটা ছোট পাথরবাটিতে তকলির গোড়াটি রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে তকলির কাঠিটা ঘুরাতে হয়। বাঁ-হাতে সূতার পাঁজ রেখেই সূতা কাটতে হয়। তকলিতে সূতা কাটার কতকগুলি সুবিধা আছে, কিন্তু চরকায় তা পাওয়া যায় না। যেমন পথে ঘাটে চলার সময়ও তকলির ব্যবহার করা সহজসাধ্য। সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার পক্ষেও কোন অসুবিধা নেই। অসুবিধার মধ্যে এই যে, তকলিতে দ্রুতগতিতে সূতা কাটা যায় না।

**চরকা :** চরকার টোকার সাহায্যে সূতা কাটা হয়। ডান হাত দিয়ে চরকার হাতল ঘুরিয়ে বাঁ-হাতে পাঁজ ধরে সূতা কাটতে হয়। চরকাতে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে সূতা কাটা যায়। তিন প্রকার চরকা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা— **পাখী চরকা, বাক্স চরকা** এবং **কৃষাণ চরকা**।

**সূতা নাটাই :** তকলি বা চরকাতে সূতা কাটার পর সেই সূতা দিয়ে ফেটি পাকানোর জন্য নাটাইয়ে সূতা জড়ানো হয়। একে **নাটাই করা** বলে। দু' নাল সূতা এক সঙ্গে পাক দিয়ে নাটাই করাকে 'দুবটা' বলে। এই সূতা দিয়ে আমরা কত কাজ করি। কাপড় সেলাই, খাতা-পত্র, বই ইত্যাদি সেলাই, জামা তৈয়ারি, জাল তৈরি প্রভৃতি বহুবিধ কাজ আমরা সূতা দিয়ে করে থাকি।

**সূতার হিসাব :** ৪ ফুটে ১ তার
৪০ তারে ১ পাটি
৪ পাটি বা ১৬০ তারে ১ লটি
১৬ পাটি বা ৬৪০ তারে ১ লাছি বা গুণ্ডি
(৬৪০ তার = ৮৫৩⅓ গজ)

৪০ তোলা ওজনে যত লাছি, সূতার নম্বরও তত। যেমন—আধ সের (৪০ তোলা) সূতায় যদি ২০ লাছি হয়, তা' হলে সূতার নম্বর ২০ হবে।

**তাঁতে কাপড় বোনা :** কাপড় বোনার প্রধান কথা **তানা** ও **পড়েন**। কাপড়ের লম্বালম্বি সূতাগুলিকে 'তানা' এবং আড়াআড়ি সূতাগুলিকে 'পড়েন' বলে। তাঁতে চিরুণীর মত যে যন্ত্রটি থাকে, তাকে **শানা** বলে। শানার ঘনত্বের উপর কাপড়ের বুননী নির্ভর করে। কাপড় সরু-মোটা বহু রকমের হতে পারে।

কাপড় দিয়ে আমরা জামা, মশারী, তোষক, লেপ প্রভৃতি কত কি না করে থাকি। কাপড় আমরা পরি, গায়ে দিই, আবার এক জাতীয় লম্বা মিহি কাপড় পাগড়ি করে অনেকে মাথায়ও বাঁধে। তাঁতে মিলে দু'রকমে কাপড় তৈরি হয়ে থাকে।

## কয়েকটি সহজ বুননের কাজ

বিদ্যালয়ের কাজে লাগে এমন কয়েকটি সহজ বুননের কথা আলোচনা করা যাক। যথা—**গজ-কাপড়, সোয়াব, ঝাড়ন,** এবং **খেশ**। হস্তচালিত ছোট ছোট তাঁতে এইসব কাজ করা যেমন সহজ, তেমনি সুবিধাজনক। প্রথমে গজ-কাপড় বোনার কথায় আসা যাক।

**গজ-কাপড়ঃ** এই কাপড়ের চাহিদা ডাক্তারখানা বা হাসপাতালেই বেশী। সাধারণতঃ হাত-পা ভাঙা রোগী এবং অস্ত্রোপচারের পর ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জন্য সর্বদাই গজ কাপড়ের আবশ্যক হয়।

**উপকরণাদিঃ** ছোট তাঁতই গজ কাপড় বোনার প্রধান যন্ত্র। সাধারণ **ঠকঠকি** বা চিত্তরঞ্জন জাতীয় তাঁতে গজ কাপড় বোনা যায়। কাপড় ও সূতা জড়ানো বীম, ঝাঁপ, শানা, নলি, মাকু, হাতুড়ি, হুক, ফিতা, কাঁচি, লিজ কাঠি প্রভৃতি সরঞ্জামের প্রয়োজন।

**প্রস্তুত বিধিঃ** প্রথমতঃ থানের ( যতটা লম্ব করা হবে ) মাপে নূতন সূতায় টানা তৈরি করে নিয়ে বীমের সঙ্গে গুটিয়ে নিতে হবে। অতঃপর হুকের সাহায্যে সানায় গাঁথিয়া সমগ্র নুড়িটিকে ( টানা-কে ) পাট করে নিতে হবে। একে সাধারণতঃ নুড়ি তাসেন বলে। নুড়ি পাট করার পর পুনরায় ঝাঁপ, 'ব'-সানায় গাঁথিয়া তাঁত বোনার কাজ শুরু করতে হবে। টানা সাধারণতঃ ২০ নং, ৪০ নং সাদা সূতায় প্রস্তুত করে নিতে হবে।

সহজ 'ব' গাঁথার নিয়মে থান কাপড়ের প্রথম দিকের কিছু অংশ প্লেন বুঝতে হবে। গজ কাপড়ের বুননটা কম ঠাসা একটু আলগা ধরণের হবে। নলীতে সূতা পরিয়ে ঝাঁপটিকে—১ উঠাও, ২ নামাও—এইভাবে পর পর মাকুর সাহায্যে সাবধানে বুনতে হবে। গজ কাপড় বুনিবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সূতার দূরত্ব ও ঠাস কম বেশী না হয়। এক দেড় হাত কাপড় বোনার পর ক্রমে ক্রমে কোলের বীমের সঙ্গে বোনা থান গুটিয়ে নিতে হবে।

এইভাবে সমগ্র থানটি বোনা শেষ হ'লে বীম থেকে খুলে ধোলাই করে নিতে হবে। অতঃপর ডাক্তারী নিয়ম ও মাপ অনুযায়ী কেটে নিয়ে এক একটি ব্যাণ্ডেজের প্যাকেট করে মজুত রাখতে হবে।

## সোয়াব বুনন ঃ

সোয়াব একটি ঝাড়ন জাতীয় বস্ত্র। এই বস্ত্র ঘর মোছা, খাবার টেবিল, ঘরের মেঝে, কাঠ বা লোহার আসবাব পত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর লম্বা চওড়ার মাপ হবে যথাক্রমে ২৪″×২৪″, ২৬″×২৬″, ২৮″×২৮″, ৩০″×৩০″ ইঞ্চি।

**উপকরণাদি ঃ** সূতা জড়ান বীম, নলী, ববিন, মাকু, ঝাঁপ, সানা, হুক, লিজকাঠি মাপের ফিতা, হাতুড়ি, কাঁচি ইত্যাদি এবং ৪০″ ইঞ্চি থেকে ৬০″ ইঞ্চি লম্বা তাঁত ; বোনার সূতো ( টানার সূতোর নম্বর ৬।৩ এবং পড়েনের সূতোর নম্বর ১।।০ ) সাদা অথবা রঙীন ইত্যাদি আবশ্যক।

**পদ্ধতি ঃ** হাতে চালানো তাঁতে যেমন ছোট খাটো জিনিস বোনা যায়, তেমনি সোয়াবও ঠকঠকি ফ্রেম তাঁতের সাহায্যেই বোনা যায়। যে মাপের সোয়াব হ'বে, সেই মাপ অনুযায়ী নূতন সূতোর দ্বারা টানা প্রস্তুত করে নিয়ে বীমে গুটাতে হবে। বুনন শেখার পূর্বে টানা প্রস্তুতের কৌশল সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। আগে ঝাঁপ ও শানার কাজ শেষ করে নিয়ে তাঁতে সোয়াব বোনার কাজে হাত দিতে হবে।

প্রথমতঃ সোয়াবের কিয়দংশ টুইল 'ব' গাঁথার নিয়মে অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪ নিয়ম এবং ঘর ও সূতোর মাপ অনুযায়ী সূতো বসিয়ে পর পর বোনার কাজ করতে হবে, সূতোর নলীতে বোনার সূতো পরিয়ে মাকুর দ্বারা সাবধানে বোনার কাজ করতে হবে।

বোনার নিয়ম-কৌশল হলো অনেকটা ঝাড়ন বোনার মত ১, ২।২, ৩।৩, ৪।৪, পুনরায় ১—এইরূপ পা-দানিতে (প্যাডেলে) চাপ দিয়ে বোনার কাজ চালতে হ'বে। মাপ অনুযায়ী সম্পূর্ণ সোয়াব তৈরি হওয়ার পর বীম কাঠিতে গুটাতে হবে। পরে এক একটি সোয়াব কেটে দুই দিক সেলাই করে ভালোভাবে ভাঁজ করে রাখতে হবে।

## ঝাড়ন বুনন ঃ

**উপকরণাদি ঃ** ৪০″ থেকে ৬০″ ইঞ্চি মাপের তাঁত, সূতো ও কাপড় জড়ানো বীম, মাকু, ববিন, ঝাঁপ, নলী, ৩২, ৩৪, ৩৬ নং হুক, লিজকাঠি, মাপের ফিতা, কাঁচি, হাতুড়ি, বুনন সূতো ( টানার নম্বর ২।২০ ও পড়েন সূতো ১০ নং ) ইত্যাদি আবশ্যক।

**ঝাড়নের মাপ :**—২৪″×২৪″, ২৬″×২৬″, ২৮″×২৮, ৩০″×৩০″,

৩৬" × ৩৬" ইঞ্চি। ঝাড়নের দু'দিক সমান মাপেই প্রস্তুত হয়। এই ঝাড়ন প্রায় সব রকম তাঁতেই বোনা যায়; তবে চিত্তরঞ্জনে বা ঠকঠকি জাতীয় ছোট তাঁতেও বোনা যায়। তাঁতের মাপ অবশ্য ৪০" থেকে ৬০" ইঞ্চি হলেই চলবে।

**বুনন পদ্ধতি :** প্রথমে ঝাড়নের পরিমাণ ঠিক করে সেইমত নূতন সূতোর দ্বারা টানা প্রস্তুত করে বীমের সঙ্গে গুটিয়ে নিতে হয় অর্থাৎ নুড়ি খোলে পাট করে নিতে হয়। তারপর ঝাঁপ শানার কাজ শেষ করার পর 'ব' গাঁথিয়া বোনার কাজ শুরু করতে হবে।

প্রথমে ঝাড়নের প্রথম দিকে কিয়দংশ 'ব' গাঁথার নিয়মে অর্থাৎ ১, ২, নিয়মে প্যাডেল টিপে প্লেন বুনতে হবে। বোনার সময় ঘর ও সূতোর মাপ অনুযায়ী পর পর বোনার কাজ শেষ করে নিতে হয়। নলীতে বোনার সূতো পরিয়ে মাকুর সাহায্যে অতি সাবধানে বুনন করতে হবে। এই বুননের কাজ অনেকটা তাঁতে কাপড়, সোয়াব, গজ কাপড় প্রভৃতি বোনার নিয়ম মতই ঝাড়ন বুনতে হয়।

অতঃপর মাপ মত ঝাড়ন বোনার পর বীম কাঠিতে জড়াতে হয়; এবং মাপ অনুযায়ী এক একটি ঝাড়ন কেটে নিয়ে তার দু'দিক সেলাই করে নিতে হয়। তারপর এই তৈরী ঝাড়নগুলিকে সমভাবে ভাঁজ করে রেখে দিতে হবে।

**খেস বুনন :** খেশ একটি শীতের আবরণী পরিচ্ছদ। গ্রামীণ শিল্প হিসেবে এর প্রচলন করা যেতে পারে। ঘরে বসে অবসর সময়ে মা-বোনেরাও খেশ বুনতে পারেন।

**উপকরণাদি :** খেশ বুনার লম্বা ঠকঠকি ও ক্রেম ৬০" বা ৬২" ইঞ্চি, কাপড় ও সূতো জড়ানো বীম, ববিন, নলী, মাকু, হাতুড়ি, কাঁচি, মাপের ফিতা, পুরাতন কাপড়, সাদা বা রঙীন সূতো ইত্যাদিই আবশ্যক।

**প্রস্তুত করার নিয়ম :** প্রথমতঃ পুরাতন কাপড়গুলি ½" থেকে ১" পরিমাণ চওড়া করে ফালি করে নিতে হবে। খেশের মাপ অনুযায়ী নূতন সূতো প্রস্তুত করে বীমে গুটিয়ে নিতে হবে। অতঃপর ঝাঁপ ও শানার কাজ করার পর তাঁতের কাজ আরম্ভ করতে হ'বে। প্লেন 'ব' গাঁথার নিয়মে খেশের প্রথম দিকের কিয়দংশ প্লেন বোনার পর কাপড়ের ফালি দিতে হ'বে।

মাঝের ছয়টি প্লেন দিক সূতো পরিয়ে মাকুর ভিতর দিয়ে পুরানো কাপড়ের ফালি দ্বিতীয় মাকুর সাহায্যে পরপর বুনে যেতে হ'বে। ঠিক তাঁত বোনার মতই বুনতে হবে। এই বোনার সময় নিজ নিজ রুচি বা নক্সা অনুযায়ী রঙীন বা সাদা কাপড় মিশাতে হবে।

খেশ বোনার শেষ কিয়দংশ আবার প্লেন বুনে শেষ করে বীম কাঠিতে জড়াতে হবে। একটি সাধারণ খেশ তৈরি করতে হলে ৫।৬ খানি পুরাতন কাপড়ের দরকার।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## মৌমাছি পালন ( Bee-Keeping )

**ভূমিকা :** বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন অর্থনীতিতে মৌমাছি, হাঁস, মুরগী, ছাগল, শূকর প্রভৃতি পালন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আজকাল নানা কারণে অর্থনৈতিক চাপ এত বেশী যে, বাঁধা রুজি-রোজগারে চলে না। কিছু কিছু বাড়তি উপার্জনের একান্ত প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে স্বল্প মূলধনে পল্লী ও শহর-বাসিগণ ইচ্ছে করলে অন্যান্য শিল্পকর্মের সঙ্গে মৌমাছি পালন করতে পারেন। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এই মৌমাছি পালন পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়া উচিত।

**মৌমাছির কথা :** এই মৌমাছি পালনের আগে তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, জীবন-যাপন-রীতি সম্পর্কেও কিছু জানা দরকার। মৌমাছি মানব-জাতির মহোপকারী বন্ধু। এরা ফুল থেকে যে মধু আহরণ করে আনে, সেই মধু একটি পুষ্টি-কর খাদ্য। মানবজীবনে মধুর সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার মৌমাছি ফসল উৎপাদনেও সাহায্য করে। ফুলের গর্ভকেশরের পরাগ সংযোগ ঘটার পরই বীজ জন্মায় ও ফল উৎপন্ন হয়। এই মিলনের কাজ মৌমাছির দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

**জাতি বিভাগ :** সাধারণতঃ তিন জাতীয় মৌমাছি দেখা যায়। যথা—(১) ভারতীয় মৌমাছি, (২) পাহাড়ে বা বাঘা মৌমাছি ও (৩) ক্ষুদে মৌমাছি। মৌমাছি পালনের জন্য ভারতীয় মৌমাছিই সর্বশ্রেষ্ঠ। মৌমাছি, ভীমরুল, পিপড়ে প্রভৃতি সমগোত্রীয় পতঙ্গ। তবে এরা কিন্তু মাছির সমগোত্রীয় নয়।

**শ্রেণী বিভাগ :** সব মৌমাছিই আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা (১) **রাণী বা স্ত্রী মৌমাছি।** এরা আকারে বড়, পেট লম্বা, চোখ দুটি পৃথক এবং ডানা ও হুল ছোট।

(২) **কর্মী মৌমাছি**—এরাও কিন্তু স্ত্রী জাতীয় কিন্তু আকারে রাণী ও পুরুষ মৌমাছি অপেক্ষা ছোট। এদের চোখ দুটিও পৃথক, তবে এদের পায়ে থাকে চিরুণীর মত লোম। এই লোমগুলিই মধু সংগ্রহে থলির কাজ করে। এদের উদরের পিছন দিকে হুল আছে, সেই হুলের নীচে থাকে বিষ থলি। এটাই এদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার। তাই রেগে গেলে এরা হুল ফুটিয়ে দেয়।

(৩) **পুরুষ মৌমাছি**—এদের আকার রাণী মৌমাছি অপেক্ষা ছোট কিন্তু কর্মী মৌমাছি অপেক্ষা কিছু বড়। চোখ দুটি মাথার উপর মিলিত। এদের হুল নেই।

মৌমাছি দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালোবাসে। এক একটি চাকে অনেক মৌমাছিই বাসা বাঁধে। প্রত্যেক দলের বাসায় থাকে একটি মাত্র রাণী বা স্ত্রী মৌমাছি আর থাকে কিছু পুরুষ এবং অসংখ্য কর্মী মৌমাছি।

রাণী মৌমাছিরাই প্রত্যেকটি মৌমাছি পরিবারের প্রধানা। তার প্রতিপত্তিও সর্বাধিক। কেবল ডিম প্রসব করাই রাণী মৌমাছির একমাত্র কাজ। এছাড়া অন্য কোন কাজ তার নেই। একটি রাণী মৌমাছি প্রায় ২।৩ হাজার ডিম পেড়ে থাকে। কর্মী মৌমাছি রাণীকে খাওয়ায়, তার তত্ত্বাবধান করে। রাণী মৌমাছি ১ থেকে ২ বৎসর কাল ডিম পেড়ে থাকে। পুরুষ মৌমাছিরা অলস। তারা কোন কাজের ধার ধারে না, কেবল খায় দায় আর আলস্যে দিন কাটায়।

কর্মী মৌমাছিরাই যাবতীয় কাজ করে। শীতের শেষে বা বসন্তের শুরুতে নূতন রাণী পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে পরিণত হয়ে কোষ থেকে বাইরে আসে এবং তার এক সপ্তাহ পরে পুরুষ মৌমাছির সঙ্গে মিলিত হয়। তার ঠিক দু' একদিনের মধ্যেই ডিম পাড়তে আরম্ভ করে। মৌচাকের এক একটি খোপে এক একটি ডিম রাখে। কর্মী মৌমাছিরা ঐ ডিমপূর্ণ কোষ বা খোপগুলিকে মোম দ্বারা ঢেকে দেয়। কয়েক-দিন পরে আবরণ কেটে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি বের হয়। কর্মী মৌমাছি ২১ দিনে, পুরুষ মৌমাছি ২৫ দিনে এবং রাণী মৌমাছি ১৬ দিনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কর্মী মৌমাছিরা কোষ থেকে বার হওয়ার পরদিন থেকেই কাজে লেগে যায়। প্রথম দু' সপ্তাহকাল এরা মৌচাকের ভিতরেই যাবতীয় কাজ করে—যেমন, চাক পরিষ্কার, মোম নিঃসরণ, মধু রক্ষণাবেক্ষণ, বাসা পাহারা দেওয়া এবং বাচ্চাদের পরিচর্যা করা। তৃতীয় সপ্তাহে এরা বার হয়ে পড়ে বাইরের কাজে—যেমন মধু ও পরাগ সংগ্রহ করা। এদের আয়ুকাল মাত্র ৪৫ থেকে ৯০ দিন। এই কারণে মৌমাছির উপনিবেশে মৌমাছির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়।

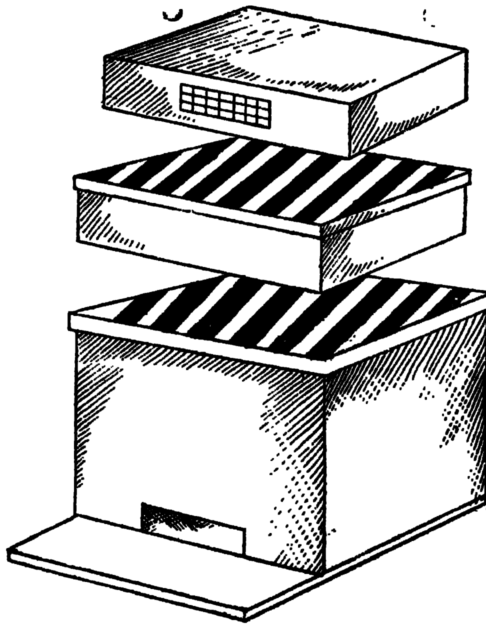
**মৌমাছির খাদ্য ঃ** মৌমাছির খাদ্য মধু। আর বাচ্চা মৌমাছিরা খায় পরাগ মিশ্রিত মধু। মৌমাছিরা মোম দিয়ে বাসা বা চাক বানায়। মৌমাছির দেহ থেকে মোম নিঃসৃত হয়ে পেটের নীচে জমা হয়। কর্মী মৌমাছিরা পা দিয়ে ঐ মোম খুটে মুখে নিয়ে সেটাকে নরম করে মৌচাক তৈরি করে, এক কিলো মোম তৈরী করতে মৌমাছিকে প্রায় ৩০—৩৫ কিলোগ্রাম মধু সংগ্রহ করতে হয়। মোম পেতে হলে মৌচাক নষ্ট করতে হয়। মৌপালন করতে হলে মৌচাক নষ্ট করাটা আদৌ সমীচীন নয়।

**লক্ষ্যণীয় বিষয় :** ডিম থেকে রাণী, না কর্মী মৌমাছি উৎপন্ন হবে, তা নির্ভর করছে লার্ভা বা শূককীট যে খাদ্য খাচ্ছে তার উপর। মৌচাকে সঞ্চিত পরাগই শূককীটগুলির খাদ্য। স্ত্রী জাতীয় যে লার্ভাটি রাজভোগ ( মধুমিশ্রিত পরাগ ) খেতে পায়, সেই রাণীতে পরিণত হয়।

## মৌমাছি পালনের সরঞ্জাম

**মৌ-বাক্স :** দুটি অংশে বিভক্ত (১) নীচের অংশ বড়—বাচ্চাঘর, এবং (২) উপরের ছোট অংশই মধুঘর। বাক্সের তলদেশ ও চাকতি বাক্স থেকে পৃথক। এর সুবিধা এই যে, ইচ্ছা মতন মৌ-বাক্সের সকল অংশ খুলে পরীক্ষা ও পরিষ্কার করা যায়।

দুই ধরণের মৌ-বাক্স পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সমতল অঞ্চলে ছোট আকারের নিউটন 'মৌ-বাক্স' সুবিধাজনক। মৌমাছির এই বাক্সগুলি আধ ইঞ্চি পুরু কাঠ দিয়ে তৈরী করা যায়। বাক্সের নীচের বাচ্চাঘর এবং উপরের মধুঘর—এই উভয়েরই ভিতরের মাপ হবে নয় ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে ৯ ইঞ্চি চওড়া। তবে



বাচ্চাঘর ও মধুঘরের উচ্চতা হবে যথাক্রমে ৬২ ইঞ্চি আর ২২ ইঞ্চি। বাচ্চাঘর ও মধুঘরের (দুটোরই) উপর ও নীচের দিকে অনাবৃত ফ্রেম লাগাবার সুবিধার জন্য বাচ্চা ও মধুঘরের দুদিকে সিকি ইঞ্চি খাঁজ থাকে। এই খাঁজে ফ্রেম ঝুলাতে হয়। বাচ্চা ঘরের নীচের দিকে মৌমাছির প্রবেশের জন্য সিকি ইঞ্চি পরিমিত স্থান ছিদ্রপথ রাখতে হয়।

**মৌ-বাক্সের অবস্থাপন:** মধ্যস্থলে ফাঁকযুক্ত একটি টেবিলে এই মৌ-বাক্সটিকে স্থাপন করতে হবে। ঐ টেবিলের পায়াগুলি জলপূর্ণ বা তৈলপূর্ণ এ্যালুমিনিয়মের বাটির উপর বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

## মৌমাছি সংগ্রহ ও পালন

মৌমাছি পালনের জন্য নিম্নলিখিত তিনটি জিনিসের একান্ত দরকার। যথা—(১) ফুলের মধু আমদানির সুযোগ সুবিধা থাকা অর্থাৎ যেখানে মৌমাছি পালন করা হবে, তার দু' মাইলের মধ্যে প্রচুর ফল-ফুলের গাছ ও সব্জী-ক্ষেত থাকা দরকার; (২) আর চাই অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে উপযুক্ত উষ্ণতাযুক্ত বাসা এবং (৩) মোম নিঃসরণী প্রচুর সংখ্যক কর্মী মৌমাছি। এই ত্রিবিধ সুবিধাই ফাল্গুন চৈত্র মাসেই পাওয়া যায়। তখনই নূতন মৌচাক বসানোর ব্যবস্থা করাটাই বিধেয়। রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড় থেকে এই মৌ-বাক্সকে রক্ষা করাটাই মৌ-পালকের প্রাথমিক কর্তব্য।

**মৌমাছি সংগ্রহ:** নির্ভরযোগ্য স্থান থেকে ৫।৬ খানি চাকযুক্ত মৌমাছি ও ডিমপূর্ণ চাক কিনতে হবে। কেনার সময় দেখতে হবে একটি রাণী মৌমাছি যেন ঐ চাকে থাকে। বায়ু চলাচল করে এমন একটি মৌমাছি আনার জালে ঢাকা বাক্স করে ঐ চাকগুলি এনে মৌবাক্সের উপর রাখতে হবে। পথের ঝাঁকুনির জন্য মৌমাছিদের কষ্ট হয়। সেইজন্য সদ্য আনা মৌমাছিদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেওয়া কর্তব্য। এক চামচ চিনি বা সিরাপ এই সময় মৌমাছি আনার জাল ঢাকা জায়গার মধ্য দিয়ে মৌমাছিদের খেতে দিতে হবে। তার আধ ঘণ্টা পরে মৌ-বাক্সে ঐ চাকগুলি স্থানান্তরিত করতে হবে।

প্রথম কয়েক দিন হয় তো মৌমাছির সংখ্যা বৃদ্ধি না হতে পারে। সাধারণতঃ মৌমাছি আনার মাস খানেক পরেই মৌমাছির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম প্রথম মৌমাছিদের চিনির সিরাপ খেতে দেওয়া উচিত। ৩৫০ গ্রাম বা ১ পাইণ্ট গরম জলে ১ কিলোগ্রাম দানাদার চিনি গুললেই ভালো সিরাপ তৈরী হবে। সেই সিরাপের সঙ্গে ১ গ্রেণ থাইমল মিশিয়ে দিলে সিরাপটি নষ্ট হ'বে না। তা' বেশ কয়েকদিনের মৌমাছিদের খোরাক হবে।

প্রত্যেক মৌবাক্সে কমপক্ষে ৪।৫টি মৌমাছিপূর্ণ চাক থাকা আবশ্যক। প্রতি বাসার মৌমাছিদের একটি নিজস্ব বিশেষ গন্ধ আছে। ঐ গন্ধ শুঁকেই মৌমাছিরা আপন আপন বাসার মৌমাছিদের চিনতে পারে।

**দুই বাসার মৌমাছিদের একত্রীকরণ :—**

দুই বাসার উপনিবেশের দুটি উপায়ে মিলিত করা যেতে পারে। যথা—(১) স্বাভাবিক সান্নিধ্য ঘটিয়ে (২) কৃত্রিম উপায়ে। প্রথম পন্থাটি একটু সময়সাপেক্ষ, দ্বিতীয়টি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবলম্বিত হতে পারে ; তাই দ্বিতীয় পদ্ধতির কথা এখানে বলছি।

দু'টি শিবিরের মৌমাছিদের একত্র করতে হলে, জলের সঙ্গে সামান্য চিনি গুলে তাতে কয়েক ফোঁটা পিপারমেন্ট তৈল বা সুগন্ধি এসেন্স মিশ্রিত করে নিয়ে সেই জল পিচকারী করে সন্ধ্যাবেলায় দু'টি মৌবাক্সে ছিটিয়ে কাগজ চাপা দিতে হ'বে। এর ফলে দুটি বাসার গন্ধ এক হয়ে যাবে। তখন বাসা বদল করানোর কোন অসুবিধা হবে না। ধুনার ধোঁয়া দিয়ে গন্ধ নষ্ট করে দিয়েও বিভিন্ন মৌ-বাক্সের মৌমাছিদের মিলন ঘটানো যায়।

**মৌমাছির উপনিবেশ বিভাগ :—**

মৌবাক্সে মৌমাছির সংখ্যা অতিরিক্ত হওয়ায় স্থানাভাব ঘটলে, মৌমাছির উপনিবেশ ভাগ করা উচিত। অন্যথায় মৌমাছিদের ঝাঁক ছাড়া প্রবৃত্তি দেখা দিতে পারে। ঝড় বৃষ্টির দিন ছাড়া যে কোন সন্ধ্যাকালে ঐ কাজ করা যেতে পারে।

বাসা-বদলের সময় ঐ মৌবাক্স থেকে দু'খানি ডিম ও মৌমাছিযুক্ত চাক এবং একখানি পরাগ ও মৌযুক্ত চাক নিয়ে আরেকটি খালি বাক্সে রাখতে হবে। তারপর ঢাকনি চাপা দিয়ে পুরাতন মৌবাক্স থেকে প্রায় ৩০০ হাত দূরে সরিয়ে রাখতে হ'বে। রাণীকে পুরানো বাক্সে রাখতে হ'বে। নূতন মৌবাক্সের কর্মীরা নূতন রাণী উৎপাদন করবে। পু'রানো মৌবাক্স থেকে একটি রাণীকোষ নূতন মৌবাক্সের চাপে পিন দ্বারা আটকিয়ে দিলে নূতন রাণী উৎপাদন আরও তাড়াতাড়ি হ'বে। উপনিবেশ বিভাগের পর মৌমাছিদের চিনির রস খেতে দিতে হয়।

**মৌচাকের যত্ন :** পিঁপড়ে, মোম পোকা প্রভৃতির উপদ্রব হ'লে মৌমাছিরা অন্যত্র চলে যেতে পারে। তা'ছাড়া যে স্থানে মৌবাক্স রাখা হয়েছে, সেখানে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুলের মধু না পাওয়া যায়, তা হ'লেও মৌমাছিরা বাসা ত্যাগ করে চলে যায়। এই কারণে যে সময় ফুল কম ফোটে, তখন মাঝে মাঝে মৌমাছিদের খাবার জন্য চিনির রস দেওয়া উচিত।

এই-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, পিঁপড়ে ব্যতীত মোম পোকা, মাকড়সা, আরশুলা, উইচিংড়ী, টিকটিকি প্রভৃতি মৌমাছির শত্রু। মোম বা মথ পোকা নিশাচর। বর্ষাকালেই মোম পোকার উপদ্রব হয়। এই পোকারা মৌচাকের

ভিতর সুড়ঙ্গ কেটে ডিম পেড়ে মৌমাছিদের উৎখাত করে। মোম পোকার দ্বারা আক্রান্ত হলে সমস্ত চাকটি সূতার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। প্রথমে ঐ আক্রান্ত চাকটিকে বার করে মৌমাছিগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঐ চাক রৌদ্রে দিতে হ'বে। একটি সরু কাঠি বা তার দ্বারা গুটির তুলার জাল ও সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে পোকাগুলোকে বার করে মেরে ফেলতে হবে। চাকটি যদি জীর্ণ না হয়ে গিয়ে থাকে, তা' হ'লে পরিষ্কার করার পর রোদে দিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

**মৌ-বাক্স অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার নিয়ম :** মৌমাছিসমেত মৌবাক্স যদি অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয়, তা হ'লে প্রতিদিন দু'ফুট করে সরালে মৌমাছিদের বাসা চেনার কোন অসুবিধা হয় না। একদিন বেশীদূর স্থানান্তরিত করতে হলে, সন্ধ্যার পরেই তা' করা উচিত। নূতন জায়গায় বসিয়ে মৌবাক্সের প্রবেশপথে এক ফালি ৪" ইঞ্চি লম্বা ও ২" ইঞ্চি চওড়া কাঠ হেলিয়ে রাখতে হবে। কাঠের দু' ধারে ফাঁক থাকবে। মৌমাছিরা ঐ ফাঁক দিয়ে যাতায়াত করবে এবং তারা যে নূতন স্থানে এসেছে, তাও বুঝতে পারবে।

## মধুনিষ্কাশন

মধু নিষ্কাশন-যন্ত্রের সাহায্যেই মধু নিষ্কাশন করাই সমীচীন। এর দ্বারা প্রথমতঃ মৌচাক অক্ষত রেখেই মধু বার করা যায়। মধুপূর্ণ চাকগুলো ঐ যন্ত্রে লাগিয়ে ঘোরালেই অপকেন্দ্র (কেন্দ্র থেকে দূরে অপসারণ দ্বারা) শক্তির সাহায্যে চাকের কোষগুলি থেকে মধু বের হয়ে আসে।

**মধুনিষ্কাশনের যন্ত্র :** একটি ১৫" ইঞ্চি উচ্চতা ও ১ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট ড্রামের মধ্যে একটি লৌহদণ্ড (৩ সূতা মোটা লোহার রড) বেষ্টন করে একটি সম চতুষ্কোণ মাপের খাঁচা ঘুড়ির লাটাইয়ের ন্যায় সংলগ্ন করানো থাকে। ঐ যন্ত্রস্থ হাতলটি ঘুরালে খাঁচা সমেত দণ্ডটি লাটাই-এর মত ঘুরতে থাকবে। আর এই ঘূর্ণনের ফলেই চাকের মধু বার হয়ে আসে।

**মধু নিষ্কাশনের পদ্ধতি :** প্রথমে মধুপূর্ণ চাক মৌবাক্স থেকে বার করে নিয়ে কোষগুলির মোম ছুরি দিয়ে চেঁচে অনাবৃত করতে হবে। এইভাবে মোম অপসারিত হলে, চারখানি মধুপূর্ণ চাক ফ্রেম সমেত মধু নিষ্কাশক যন্ত্রের খাঁচার মধ্যে বসাতে হবে। খাঁচার ভিতর চারপাশে চারটি ফ্রেম রাখতে হবে।

তারপর যন্ত্রের হাতল ঘুরালেই চাকগুলি থেকে মধু বেরিয়ে পাত্রের মধ্যে পড়বে। এইভাবে চাকগুলির একদিকের মধু বার হলে, ফ্রেম চারটিকে আবার উল্টে বসিয়ে নিয়ে পুনর্বার হাতল ধরে ঘুরাতে হবে। এর ফলে অপর পাশের মধুও বার হয়ে আসবে। মধু নিষ্কাশনের পর চাকগুলোকে পুনরায় মৌবাক্সে বসিয়ে পূর্বের মত ব্যবহার করা যাবে।

**সতর্কতা:** মধু নিষ্কাশনের পূর্বে ও পরে মৌমাছিরা যাতে ভীতত্রস্ত হয়ে মৌবাক্স পরিত্যাগ করে পলায়ন না করে, এইজন্য অতি সন্তর্পণে ক্ষিপ্র হস্তে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি মধু-নিষ্কাশন কার্য সমাধা করতে হবে। একই ব্যক্তির দ্বারা সব সময় মৌ নিষ্কাশন করানো উচিত। তার ফলে ঐ ব্যক্তির ক্ষিপ্রকারিতা ও কৌশল যত আয়ত্ত হয়, ততই মধু নিষ্কাশনের সময় মৌমাছিরা কম শঙ্কান্বিত হয়।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

## শিক্ষার প্রসারণ ( Extension of Education )

লেখাপড়া শেখার দু'টি দিক আছে। যথা—অধ্যয়ন আর কৃত্য। প্রথমটির মাধ্যমে আমরা জ্ঞান আহরণ করি, দ্বিতীয়টিতে আমরা করি অর্জিত বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ। এই পড়া আর করা—এ দু'টি ধারার সমন্বয়ই তো প্রকৃত লেখা-পড়া। কাজেই একটি বাদ দিয়ে অন্যটি কেবল অসম্পূর্ণ নয়, অকেজোও বটে। তাই মানুষ গড়ার শিক্ষায় ও দুটোরই একান্ত প্রয়োজন। একটি ইংরেজি প্রবচনেও ঐ কথার প্রতিধ্বনি আছে। প্রবচনটির মর্মকথা এই: Reading makes a man, half man, writing makes a man perfect. অর্থাৎ নিছক কেতাবী-জ্ঞান মানুষকে পরিপূর্ণ করে না, ব্যবহারিক নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে সে থেকে যায় আধা মানুষ হ'য়ে। অন্যদিকে লেখা অর্থাৎ ব্যবহারিক জ্ঞানই তাকে গড়ে তোলে ত্রুটি-হীন পরিপূর্ণ মানুষরূপে। নিছক জানার মধ্যে যে ফাঁক থেকে যায়, যে সন্দেহের অবকাশ থাকে, লেখার অভ্যাস সেগুলিকে দূর করে দিয়ে তাকে সন্দেহাতীত নির্ভুল লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

লেখাটা ব্যবহারিক। অভ্যাস সাপেক্ষ। তার কৃত্যে আছে যে অনুশীলন, তার মাধ্যমে হাতের সঙ্গে মগজের সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। সেই সঙ্গে আর একটি মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সেটা রূপ-রূপান্তরের ব্যাপার। প্রতিনিয়ত আমাদের মনে যে ভাব ও ভাবনা জমা হ'চ্ছে তা আত্ম-প্রকাশ করতে চাইছে কোন কোন না কোন কর্মে। যতক্ষণ না তা হ'চ্ছে, ততক্ষণ মনের মধ্যে কি অস্থিরতা! তাই মানুষের ধ্যান ধারণা চাইছে কৃত্যে রূপান্তরিত হ'তে। লেখার মধ্য দিয়ে মনের ভাবনা সেই পথ খুঁজে পায়। এটাই লেখার সেই কৃত্যরূপ।

এই কারণে পুঁথিগত বিদ্যাটা এক পেশে। তা দিয়ে হয় তো মন ভরে, কিন্তু প্রয়োজন মেটে না। অথচ যে জীবনের আয়োজন যেমন, সে জীবনের প্রয়োজনও তেমনি। কেতাবী-শিক্ষা আমাদের জীবনের এই আয়োজন আনুপাতিক কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। এই কারণে ভাবনা-মুখী জ্ঞানকে কিভাবে কর্মমুখী করা যায় রবীন্দ্রনাথ তার একটি সুন্দর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বলেছেন যে, আলো সম্বন্ধে শত শত বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিলেই আলোর স্বরূপ আরও স্পষ্ট হয়। এর নামই তো শিক্ষার প্রসারণ। অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগের মাধ্যমে আরও জীবনমুখী এবং কার্যকরী করে তুলতে হ'বে। উদাহরণস্বরূপ উদ্যান-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, শল্য-বিদ্যা, শিল্প-সাহিত্য এবং পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে পারি। এ গুলোর কোনটাই বই পড়ে শেখা যায় না। শিখতে হয় হাতে কলমে কাজ করে। তারজন্য প্রয়োজন পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ আর গবেষণার।

এ হেন পুঁথিগত শিক্ষাকে কি ভাবে প্রয়োগ-নৈপুণ্য-সার্থক করা যায়, তার জন্য একাধিক শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। যেমন—(ক) **অনুশীলন-শিবির** (খ) **কর্মশালা** (গ) **সাহিত্য-বিনোদন শিবির** এবং **অভিপ্রদর্শনী**। এই সব অনুশীলনী কেন্দ্রে কিভাবে শিক্ষার প্রসারণ ঘটবে, সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক।

**অনুশীলন শিবির :** এই অনুশীলন শিবির দু'টি ভাগে বিভক্ত হ'বে। এক হবে তাত্ত্বিক আলোচনার বিশেষ শ্রেণী, দ্বিতীয় থাকবে গবেষণার ব্যবস্থা। এই তাত্ত্বিক আলোচনার বিশেষ শ্রেণীতে এমন সব বিষয় নিয়ে শিক্ষক মহাশয়রা আলোচনা করবেন, যে সব বিষয় শ্রেণী-কক্ষের পঠন-পাঠনের পরেও ছেলেরা বুঝতে পারেনি। সেই অধীত বিষয় কতটা তত্ত্ব-নির্ভর তথ্য হলো, তা' ছাত্ররা বিভিন্ন বই পত্তর ঘেঁটে যাচাই করে দেখে নেবে। তারপর ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে

আলোচনা করে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসবে। এখানেই—বিশেষ করে—কেতাব নির্বাচন আর শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে শিক্ষক মহাশয়রা সাহায্য করবেন। অন্যদিকে ভূগোল-বিজ্ঞান-নৃতত্ত্ব প্রভৃতির গবেষণা সাপেক্ষ বিষয়গুলির পরীক্ষার সুযোগ-সুবিধা থাকবে এখানে। যেমন ধরা যাক, বৈদ্যুতিক কলিং বেল নির্মাণ-প্রণালী সম্পর্কে ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকে যা' পড়েছে, সেই অভিভাবনানুসারে তারা এই অনুশীলন শিবিরে সেটা হাতেকলমে তৈরি করবে। এইভাবে জ্ঞান ও অনুশীলনের যথার্থ সমন্বয় ঘটলে, সেটাই হ'বে শিক্ষার আসল প্রসারণ। এইজন্য অনুশীলন শিবিরে অবশ্যই থাকবে একটি বহু গ্রন্থ-সমন্বিত পাঠাগার ও একটি গবেষণা-গার। এইভাবে ছাত্রদের জানা তত্ত্ব, অনুশীলন-শিবিরে প্রয়োগ সাফল্যে সত্য হ'বে।

**কর্মশালা :** নানা-বিষয়-প্রকল্পের কাজ হ'বে কর্মশালায়। এখানে ভূগোল, বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে যন্ত্র-বিদ্যার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম থাকবে, যেখানে ছাত্ররা কমপক্ষে সপ্তাহে তিন দিন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে হাতে কলমে কাজ করবে। শিক্ষণ-সম্ভাবনাময় যে বিষয়ের যতটুকু ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তক থেকে




কর্মকেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কাজ করছেন

পড়বে, তারই এক একটা বিষয়ভিত্তিক প্রকল্প-রচনা করে নিয়ে ছাত্ররা শিক্ষক মহাশয়দের সাহায্যে কাজ করবে। এই প্রকল্পগুলি নানাপর্ব-ভিত্তিক হ'তে পারে। অর্থাৎ শিক্ষা-বর্ষের তিন পর্বের উপযোগী তিনটি সময়-কালীন শিক্ষা-প্রকল্প রচিত হতে পারে। তাকে আবার মাসিক, সাপ্তাহিক—থেকে শুরু করে, দৈনন্দিন কার্য

সূচী ভুক্তও করা যেতে পারে আর নানা বিষয়ের শিক্ষোপকরণ তৈরির কারখানা হবে এই কর্মশালাগুলি। এখানে ছাত্ররা তৈরি করবে ইতিহাস, ভূগোল-বিজ্ঞান। শরীর-বিদ্যা, কীট-পতঙ্গ-প্রাণী বিষয়ক নানা ধরণের চার্ট, পোষ্টার, মডেল, মানচিত্র বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। বই পড়ে, বই ঘেঁটে অনেক ভেবে চিন্তে ছেলেরা এই সব শিক্ষোপকরণ নির্মাণ করবে। তার ফলশ্রুতি হিসাবে এক দিকে যেমন বিদ্যালয়ের শিক্ষা-উপকরণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে তেমনি ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধির ক্রমবিস্তার ঘটবে। এইভাবে বিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত কর্মশালাগুলি ছাত্রদের শিক্ষার-প্রসারণ ঘটাবে।

**সাহিত্য বিনোদন-শিবির (Literary workshop) :** সাহিত্য-বিনোদন-শিবিরে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হ'বে ছাত্রদের প্রবণতাগুলিকে। বিদ্যার্থীদের মধ্যে যে সৃজনী শক্তি রয়েছে যে-সাহিত্য-প্রীতি রয়েছে, তার অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে এই সব কেন্দ্রে। সাহিত্য-পুস্তক রচনা, নাটক-কবিতা-প্রবন্ধ লেখার তালিম দেওয়া হ'বে এই বিনোদন-শিবিরে। তা-ছাড়া অভিনয়, আবৃত্তি শেখানোর ব্যবস্থা। সাহিত্য-পাঠ্যপুস্তকের কোন একটি বিষয়, ইতিহাসের কাহিনী, কোন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে অবলম্বন করে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে নাটক রচনা করে মঞ্চস্থ করতে পারে, সে দিকে বিশেষ নজর দেবেন সাহিত্য-বিনোদন শিবিরের শিক্ষক-পরিচালকরা। অভিনয়ের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম আর উপকরণ প্রস্তুত, নাটক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করবে বিদ্যার্থীরা। কোন যুগের মানুষ কি ধরণের পোষাক পরত, কি রকম হাতিয়ার, উপকরণ, তৈজসপত্র ব্যবহৃত হত, ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, তা' লিপিবদ্ধ করবে শিক্ষার্থীরা। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত পাঠ্য কবিতা সঠিকভাবে আবৃত্তি করানোর মাধ্যমে ছাত্রদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া, স্মৃতিশক্তি-বর্ধন, রস-বোধ জাগ্রত করা প্রভৃতি কাজ সাধিত হ'বে এই বিনোদন শিবিরে।

**অভিপ্রদর্শনী :** একাধারে তালিম দেওয়া-নেওয়ার মহড়া চলবে অভিপ্রদর্শনী শ্রেণীতে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যাঁরা পারদর্শী—যেমন নাম করা সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, খেলোয়াড়, চিকিৎসক প্রভৃতি—ডেকে আনতে হ'বে অভিপ্রদর্শনের জন্য। এই আহ্বানে বিশেষজ্ঞ যাঁরা আসবেন, তাঁরা নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা, উদ্যম ও সাফল্যের কথা কেবল বর্ণনা করবেন না, সেই সেই বিভাগে সাফল্য লাভের উপায় বাতলে দেবেন। প্রেরণা যোগাবেন ছাত্রছাত্রীদের মনে।

যশস্বী শিক্ষাবিদ্‌রা আদর্শ পাঠদান করে ছাত্রদের শোনাবেন, পঠন পাঠনের কলাকৌশল সমধর্মী শিক্ষকদের। খেলোয়াড়, অভিনেতা, আবৃত্তিকাররা মাঠে নেমে মঞ্চে উঠে দেখিয়ে দেবেন কিভাবে কি করতে হয়। তারপর সেগুলির কতটা ছেলে-মেয়েরা গ্রহণ করতে পেরেছে, তা' পরীক্ষা করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের একে একে মাঠে মঞ্চে নামাতে হ'বে। যারা অনুকরণ ও অনুসরণে সক্ষম হবে তাদের উৎসাহিত করতে হ'বে। এবং নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থাও করে দিতে হবে। আর যারা সফলকাম হবে না, তাদের তালিমের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিতে হ'বে। যাতে তারা জড়তা, সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঠে, আস্তে আস্তে খেলাধুলায়, অভিনয়ে। সাহিত্যসাধনায় দক্ষতা দেখাতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন বোধে পিছিয়ে পড়া, ছাত্রছাত্রীদের আলাদা আলাদা দলে ভাগ করে নিতে হ'বে। এক দলের সঙ্গে অন্য দলের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হ'বে। সকলের মিলিত সাফল্যে যে দল সর্বোচ্চ নম্বর পাবে, তাদের উৎসাহ দেওার জন্য পুরস্কৃত করতে হ'বে। এতে ব্যক্তিগত এবং দলগত অনুশীলনের জন্য যা' যা' করণীয়, তার অনেকখানিই করে নেবে ছাত্ররা। কারণ যখন শিক্ষার্থীরা দেখবে যে, ব্যক্তিগত ছাত্রছাত্রীদের অসাফল্যে যখন দলগত ভাবে তাদের পরাজয় ঘটছে, তখন সেই সেই দলের বিদ্যার্থীরা দলগতভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে, তার ফলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা যখন সামনের সারিতে এগিয়ে যেতে পারবে, তখনই হ'বে শিক্ষার প্রসারণ সার্থক।



# দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### বিদ্যালয় বাগিচা—টবে চাষ ( School garden—Pot Culture )

**ভূমিকা :** গৃহ উদ্যান সম্পর্কে আগেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়ে—যেখানে উদ্যান চর্চার কোন সুযোগ নেই, সেই সব বিদ্যালয়-পরিবেশ-সজ্জার জন্য কি বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে পারে এখানে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেই বিকল্প-ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ টবের বাগান করা। আজকাল আমাদের দেশে টবে নানাবিধ ফুল ও পাতাবাহারী বর্ষজীবী এবং বহুবর্ষজীবী গাছের চাষ যেন ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এমন কি টবেতেই বীজ ও কলম তৈরির দ্বারা বিভিন্ন গাছের প্রস্তুত করার পদ্ধতিও চালু হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে গাছ লাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের আধার—যেমন মাটির টব, টিন বা কাঠের বাক্সও ব্যবহৃত হ'চ্ছে। জল-নিকাশের সুবিধার জন্য এই সব পাত্রের তলদেশে একাধিক ছিদ্র রাখা হয়। মাটির টবগুলো অবশ্য বাজারে কুমোরের দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়। অর্ডার দিয়েও বিশেষ গঠনের বড় আকারের টবও বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। মাটির গুণাগুণের উপরই নির্ভর করে টবের স্থায়িত্ব। নোনা মাটিতে তৈরী মাটির টব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। ঘন্টাকৃতি টবগুলি যেমন মজবুত, তেমনি বহুদিন স্থায়ী হয়। আবার গাছের প্রকৃতি ও আকৃতি অনুসারেই টবেরও গঠনাকৃতির তারতম্য ঘটে।

**টব রক্ষণের উপায় :** টবের উপরই কৃত্রিম বাগানের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। খালি টবকে ফাঁকা জায়গায় ফেলে রাখা ঠিক নয়; কেন না, বেশী রোদ বৃষ্টিতে টব খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। সেই কারণে খালি টবের মাটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে, কোন ছায়াময় স্থানে কিম্বা ঘরের মধ্যে বা বারান্দায় রেখে দেওয়া উচিত।

**বীজ বপনের উপযোগী টব :** বীজ বপনের জন্য একটু আলাদা ধরণের চ্যাপ্টা প্রশস্ত টব ব্যবহৃত হয়। এই বিশেষ ধরণের টবের তলদেশে জল-নিষ্কাশনের জন্য থাকে দু তিনটি ছিদ্র। বীজ বপনের জন্যও টবেই মাটি প্রস্তুত করতে হয়। সেজন্য দোআঁশ মাটি, বালি, পাতা-পচা সার, পচা গোবরের সার, হাড়ের গুঁড়ো, চুন, সুরকি, ইট, ময়লার গুঁড়ো প্রভৃতি আবশ্যক। এই সব উপাদানগুলির প্রত্যেকটিই বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করে। যথা—ইট-বালি-সুরকি মাটি আলগা রেখে জল-নিকাশের সুবিধা করে দেয়। আবার পাতাপচা সার মাটিকে বেশ ফাঁপা রাখে, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি করে মাটির জলধারণের ক্ষমতা। তদুপরি পাতা-পচা-সার মাটির তাপমাত্রা সংরক্ষণে সাহায্য করে। অন্যদিকে চুন মাটির অম্লত্ব নিবারণে সাহায্য করে। আবার গোবর সার গাছের জন্য

সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় খাদ্য। সর্বোপরি দো-আঁশ মাটিতে গাছের শিকড় সহজেই বাড়তে পারে। এ সব কারণে বিভিন্ন প্রকার গাছের চারার চাহিদা অনুযায়ী পরিমাণমত দো-আঁশ মাটি, বালি, পাতা-পচা সার, গোবর সার প্রভৃতি একত্রে মিশিয়েই টবের জন্য মাটি তৈরি করে নিতে হবে।

**টব ভর্তি করা :** ঐভাবে মাটি মিশ্রিত হলে, তা নিয়ে টবগুলি ভর্তি করতে হয়। টব ভর্তি করার আগে প্রতিটি টবের তলদেশে ইট কুচি, কাঁকর, চুনসুরকির খণ্ড অথবা কয়লার গুঁড়ো প্রভৃতি ১" ইঞ্চি বা ২.৫ সেন্টিমিটার আন্দাজ বিছিয়ে দিতে হবে। এতে জল নিষ্কাশণের সুবিধা হয়। তার উপর বিছিয়ে দিতে হয় নারিকেলের ছোবড়া, শুকনো পাতা কিম্বা শুকনো মস বিছিয়ে দিতে হয়। এর উপর হালকা সারযুক্ত মাটি দিলে সে মাটি ধুয়ে বেরিয়ে যাবে না। মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি টব এমনভাবে ভর্তি করতে হবে, যেন টবের উপরিভাগ ½" ইঞ্চি বা ১½—২½ সেন্টিমিটার স্থান খালি থাকে। তা না হলে, একটু জল দিলেই, তা উপচে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

**মাটি ভরার পরবর্তী কাজ :** টব বা বাক্সে পূর্বোক্ত উপায়ে মাটি ভর্তি করার পর, পাত্রগুলোকে বেশ ভালভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে মাটিটাকে সমতল করে নিয়ে তারপর হাতের তালু দিয়ে মাটির উপর ঈষৎ চাপ দিয়ে বীজবপন করতে হবে। টবে দু ভাবেই বীজ বোনা যেতে পারে। যথা—টবের মাটির উপর সারিবদ্ধভাবে, অথবা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যেতে পারে। বীজবপন অন্তে ঝুরো মাটি অথব পাতাপচা-সার দিয়ে বীজগুলো ঢেকে দিতে হয়। চারাগুলো একটু বড় হলেই বিকালের দিকে অন্য টবে স্থায়ীভাবে রোপণ করতে হবে।

**টব-পরিবর্তন :** টবে সাধারণতঃ দু'রকমের গাছ লাগানো যেতে পারে। যেমন—**বর্ষজীবী, বহুবর্ষজীবী**। বর্ষজীবী গাছগুলি নিয়ে তেমন কোন ভাবনা নেই। তবে বহুবর্ষজীবী গাছের চাষ করতে হ'লে মাঝে মাঝে মাটি বদলে দিতে হয়। নতুবা এক টব থেকে অন্য টবে নূতন করে রোপণ করতে হয়। সাধারণতঃ তিনটি কারণে টবের মাটি পরিবর্তন করাটাই একান্ত আবশ্যক। যথা—প্রথমতঃ বহুবর্ষজীবী গাছগুলি—বিশেষ করে—বড় হওয়ার পর এত অধিক শিকড় বিস্তার করে যে, তখন সেই টবে আর স্থান সঙ্কুলান হয় না, প্রয়োজন হয় অপেক্ষাকৃত বড় টবের। দ্বিতীয়তঃ, টবের মাটি অনেক দিনের হলে, তা' অনেক সময় শক্ত হয়ে খারাপ হয়ে যায়। তখন মাটি বদলের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। তৃতীয়তঃ টবে সার দেওয়ার দরকার হলে, গাছগুলির শিকড় ছাটাই করে, মাটিগুলো বেশ মিহি করে ভেঙে দিয়ে, আবার ঐ টবেই রোপণ করতে হয়।

**টব পরিবর্তনের সময় :** ভারতবর্ষের এই টবে-বাগান নিয়ে তেমন মাথা ঘামানো হয়নি। তাই এখানে টব-পরিবর্তন সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট বিশেষ সময় নেই তবে সাধারণতঃ খারিফ বা গ্রীষ্মকালীন মরশুমী গাছের টব ফেব্রুয়ারী মাসে, কিম্বা গরম

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা জুনমাসের শেষের দিকে পরিবর্তন করতে হয়। শীত বা রবি মরশুমের গাছের টব নভেম্বরে পরিবর্তন করতে হয়।

**টব পরিবর্তনের উপায়ঃ** টব-পরিবর্তনের ঘণ্টা খানেক আগে জল দিয়ে টবের মাটি ভিজিয়ে দিলে, সহজেই গাছটি তোলা যাবে। অনেক সময় টবের মাটি এমন কঠিন হয়ে বসে যায় যে, তখন সেই টবের গাছ সহজে তোলা যায় না। এইসব ক্ষেত্রে গাছকে বেশী টানাটানি না করে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করতে হবে। টবটিকে প্রথমে উল্টে দিতে হবে। তারপর ডান হাতের মধ্যমা তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে গাছের গোড়াটা ধরতে হবে। অতঃপর বাঁ হাত দিয়ে টবের পশ্চাৎভাগ ধরে সাবধানে ঝাঁকুনি দিলে, অথবা টেবিলের কোণায় বা উঁচু দেওয়ালের উপরে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠুকলে, টবের আকারে মাটি সমেত গাছটা বার হয়ে আসবে। ওভাবেও যদি না হয়, তবে টবের তলদেশের ছিদ্র দিয়ে কাঠি প্রবেশ করিয়ে মাটিকে ঠেলা দিলেই, গাছটা টব থেকে বার হয়ে আসবে। এত কাণ্ড করেও যদি কৃতকার্য না হওয়া যায় তবে টবটাকে ভেঙ্গে ফেলে, গাছটাকে উঠিয়ে নূতন টবে বসাতে হবে। টব-পরিবর্তনের সময় যাতে আঘাত না লাগে অথবা আঘাত লেগে যাতে গাছের ক্ষতি না হয়, সেজন্য কয়েকদিন গাছটিকে দিনের বেলায় অন্ধকার জায়গায় রাখতে হবে। আর রাত্রিকালে শিশির খাওয়ানোর জন্য ফাঁকা জায়গায় বার করে দিতে হবে।

**টবে জল সেচনঃ** টবের গাছে পরিমাণ মত যে জল সেচন করা হবে, সেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল নিষ্কাশণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। জল সেচনের পরিমাণ খুব কম হ'লে, গাছগুলির বৃদ্ধি ভালো হয় না। ফলে গাছগুলি খর্বাকৃতির হয়। পক্ষান্তরে জলের পরিমাণ বেশী হলে গাছের গোড়া পচে যাওয়ার ফলে গাছগুলি মরে যায়। সেই জন্য পরিমিত জল সেচনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। জল সেচনের তারতম্য নির্ভর করে গাছের বৃদ্ধির উপর। এই কারণে যে সময়ে গাছের বৃদ্ধি হয় না, সে সময় গাছের জীবন ধারণের উপযোগী সামান্য পরিমাণ জল দিতে হয়। কিন্তু গাছের যখন বৃদ্ধির সময়, তখন অধিক পরিমাণে জল সেচনের আবশ্যক।

**ছোট গাছ ও বীজতলায় জল সেচনঃ** জল সেচনের পরিমাণ ও ব্যবস্থা গাছের চেহারার উপর নির্ভর করে। যেমন ছোট ছোট চারা গাছে অথবা বীজতলায় অতি সূক্ষ্ম ঝাঁরির সাহায্যে জল দিতে হয়। টবের গাছের গোড়ায় জোরে জল ঢালতে নেই। কারণ ঐভাবে জল দিলে বড় গাছের শিকড় বার হয়ে পড়ে এবং মাটি থেকে গাছের খাদ্য ধুয়ে বার হয়ে যেতে পারে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার গাছের ফুল, পাতা ধুয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। ওতে গাছের রান্নাঘর যে পাতা, তার কাজের সুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ টবের গাছের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

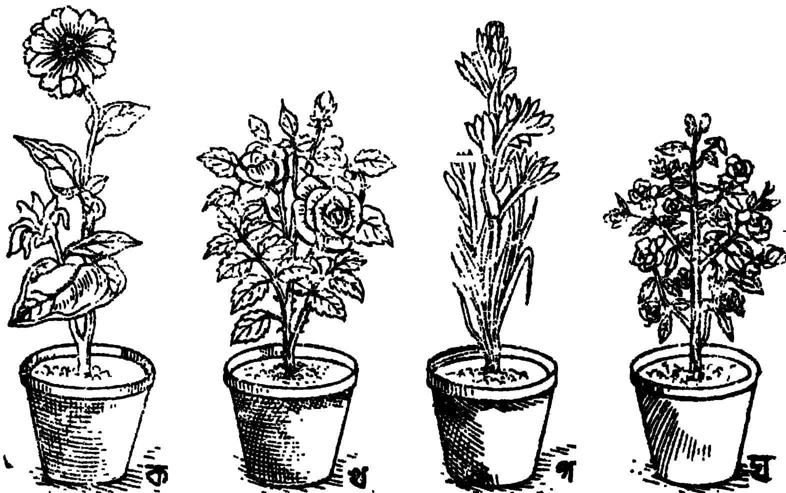
**ব্যবহারিক নির্দেশঃ** ছাত্ররা যাতে হাতে কলমে শিক্ষা করতে পারে, সেজন্য প্রত্যেকটি ছাত্রের উপর কয়েকটি টবের বপন-রোপণের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। কিভাবে টবের মাটি তৈরি করতে হয়, কেমন করে টবে মাটি ভরার পর কিভাবে

বীজ বপন বা বৃক্ষ রোপণ করতে হয়—শিক্ষক মহাশয়রা তার অভিপ্রদর্শন করবেন। প্রয়োজন বোধে মাঝে মাঝে দেখবেন ছাত্ররা ঠিকমত টবের গাছের পরিচর্যা করছে কিনা।

**ঝুলন্ত উদ্যান:** যেখানে একান্তই স্থানাভাব, সেখানে ঝুলন্ত বাক্সে, প্লাষ্টিকের রঙিন সোখীন টবে, ফাঁপা মোটা বাঁশের চোঙে নানা ধরনের মরশুমী ফুলের গাছ লাগানো যেতে পারে। অফিস ঘরের সামনের বারান্দায়, করিডোরের দু'পাশে, দো-তলার ব্যাল্‌কনিতে মজবুত ফ্রেমে বসিয়ে শক্ত তার দিয়ে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই সব ঝুলন্ত বাক্সাদির উপযোগী কতকগুলি মরশুমী ফুলের নাম এখানে দেওয়া গেল। যথা—ন্যাশ-টারসিয়াম, পিটুনিয়া, জিনিয়া, ফ্লক্স, লিনিয়ারিস, লোবেলিয়া, ক্লায়েন্থাস, টোরোনিয়া, পর্টুলেখা, টেন-ও-ক্লক ইত্যাদি মরশুমী ফুল ঝুলন্ত টবে লাগানো যেতে পারে।

**টবে লাগানোর উপযোগী মরশুমী ফুল:** এখানে টবে লাগানোর উপযোগী কতকগুলি মরশুমী ফুলের ঋতু অনুযায়ী একটা তালিকা নিচে দেওয়া গেল:—

**(১) শীতকালে**—ক্যালেণ্ডুলা, কারনেশন, ডায়েন্থাস, এন্টিরিনাম, এষ্টার, ক্রাবুকিয়া, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলগাছ টবে রোপণ করা যায়। আর ফুলদানি সাজানোর জন্য চন্দ্রমল্লিকা, এন্টিরিনাম, ডালিয়া, কস্‌মস্‌, কর্ণফ্লাওয়ার, লার্কস্পার, গাঁদা, ডায়েন্থাস, ক্যালেণ্ডুলা, কারনেশন, প্যান্সি, ফ্লক্স, সেণ্টাউরিয়া, জিপ্‌সোফিলা, ক্যাণ্ডিটাফট ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।




টবে কয়েকটি মরশুমী ফুলের চারা

**(২) গ্রীষ্মকালে**—জিনিয়া, পেরেনিস, পিটুনিয়া, পর্টুলেকা, নিকোসিয়ানা, লাইনারিস প্রভৃতি ফুল গাছের চাষ টবেই করা যায়। টব জাত ফুলের মধ্যে জিনিয়া,

হলদে কস্‌মস্‌, সানফ্লাওয়ার, টিথোনিয়া, করিওপসিস্‌, গমফ্রেনা, গাইলারডিয়া, হেলিয়াস্থাস ইত্যাদি ফুল দিয়ে ফুলদানি সাজানো যায়।

**(৩) বর্ষাকালে**—কক্‌স্‌ কোম্ব, জিনিয়া, দোপাটি টোরোনিয়া প্রভৃতি ফুল গাছ টবে চাষ করা যায়। ফুলদানি সাজানোর জন্য গাইলরেডিয়া, গমফ্রেনা, জিনিয়া, সানফ্লাওয়ার, হেলিয়াস্থাস প্রভৃতি ফুল ব্যবহার করা যেতে পারে।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## বাড়ীতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী

**ইতিহাস ঃ** কাগজ আবিষ্কারের ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। তবে কোথায় যে সর্ব প্রথম কাগজের প্রচলন হয়, সে কথাও জানা যায় নি। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, চীন দেশেই কাপড়জাত এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়েছিল। তখন পর্যন্ত ভারতীয়রা ভূর্জর পত্র অথবা তালপাতায় লেখাপড়ার যাবতীয় কাজ চালাতেন। মিশর দেশে প্যাপিরাস গাছের ছালই লিখন কার্যের জন্য ব্যবহৃত হ'ত। আসলে কাগজের প্রথম সৃষ্টি চীন দেশে। সেই কাগজ তৈরির প্রণালী আরববাসিগণই বিভিন্ন দেশে চালু করেন। স্পেন দেশীয় মুরগণই ইওরোপে ঐ কাগজ প্রবর্তন করেন। বহু প্রাচীন কালে আমাদের দেশে হাতে তৈরি তুলট কাগজেই কোষ্ঠি এবং নিমন্ত্রণ পত্রাদি লেখার রেওয়াজ ছিল। এখনও তিব্বত ও নেপালে এই হস্ত প্রস্তুত কাগজের প্রচলন দেখা যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কাগজ আবিষ্কৃত হয়েছে।

**উপাদান ঃ** সাধারণতঃ ছেঁড়া কাপড়, পুরাতন কাগজ, পাট, শণ, কাঠ, বাঁশ, ঘাস, কলার বাস্‌না প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য থেকে হরেক রকম কাগজ তৈরি হয়। দেশীয় হাতে তৈরি কাগজের মধ্যে তুলট কাগজই প্রধান।

**প্রস্তুতপ্রণালী ঃ** কাগজের ভালোমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে উপাদানের উপর। যে জিনিসের দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হবে, সেগুলিকে বেছে পরিষ্কার করে নিতে হয়। ছেঁড়া কাপড় বা কাগজ থেকে কাগজ প্রস্তুত করতে হ'লে সেগুলিকে পৃথকভাবে খণ্ড খণ্ড করে কেটে উদুখল, হামানদিস্তা কিম্বা ঢেঁকিতে কুটে নিয়ে, জলমিশ্রিত করে মণ্ডবৎ করতে হয়। বার কয়েক ঐরূপ করলে মণ্ডগুলি ক্রমশঃ পরিষ্কার সাদা হয়ে আসবে। পরে লোহার তার দ্বারা নির্মিত চালুনির মত একটি ছাঁচে ঐ মণ্ডের সঙ্গে সামান্য সর্জন তেল মিশিয়ে সমানভাবে স্থাপন করতে হবে। মণ্ডটি বিস্তৃত হলে, ওর মধ্যস্থিত জলীয় ভাগ ঐ চালুনির ছিদ্র পথে ঝরে পড়বে; তারপর ওটাকে কোন এক সমতল আধারে

স্থাপন করতে হবে। অতঃপর ঐ ভাবে আবার ছাঁচে মণ্ড দিয়ে আর একটি কাগজ তৈরি করে প্রথমটির উপর রাখতে হবে। এইভাবে অনেকগুলি কাগজ স্থাপিত হ'লে, তার উপর কোন ভারি তক্তা বা ঐ জাতীয় কোন জিনিস চাপিয়ে রাখলে, সমস্ত জলীয় অংশ বার হয়ে যাবে। চাপ দেওয়ার পরিবর্তে বেল্‌নার সাহায্যেও ঐ সমভাবে বিছানো পদার্থকে রুটি বেলার মত করে বেলে নেওয়াও যায়। ঐভাবে সবগুলোর জল নিষ্কাশিত হলে, তখন একটি একটি করে রোদ্রে শুকিয়ে নিলেই কাগজ প্রস্তুত হবে। জলে মণ্ড গুলবার সময় তাতে যে রঙ মেশানো হবে কাগজও সে রঙের হয়।

**তুলট কাগজ:** প্রস্তুত করার প্রণালী সাধারণ কাগজের মতই; তবে ঐ সঙ্গে সামান্য পরিমাণ তেঁতুলের মণ্ড ও হরিতালাদি রং মিশিয়ে নিয়েই তুলট কাগজ তৈরী করা যায়। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই এই কাগজ ব্যবহার করতেন। এর সঙ্গে হরিতাল মেশানো থাকায় সহজে পোকায় কাটে না।

**পার্চমেণ্ট পেপার:** ছাগ ও মেষের চামড়া দিয়ে পার্চমেণ্ট কাগজ তৈরী হয়। প্রথমে, চামড়াগুলোকে ভালভাবে লোমশূন্য করে নিতে হবে এবং চূণের জলে বেশ কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে ঐ জলে ভেজা চামড়া জল থেকে তুলে এনে চামড়া থেকে মাংসের অংশ ভালভাবে চেঁচে তুলে ফেলে দিতে হবে। পরে ঝামা দিয়ে ঘসে ভাল করে মেজে মসৃণ করলে পার্চমেণ্ট পেপার তৈরী হবে। এ খুব দামী কাগজ; এ জাতীয় কাগজে মূল্যবান দলিল ও ডিপ্লোমা লেখা হয়।

**কৃত্রিম পার্চমেণ্ট পেপার:** উপাদান একখানি সাদা কাগজ আর উগ্র সালফিউরিক এসিড ও এমোনিয়া মিশ্রিত জল। এবার কাগজখানিকে ঐ উগ্র সালফিউরিক এসিডে আধ মিনিট ডুবিয়ে তুলে নিতে হবে। অতঃপর অল্পপরিমাণ এমোনিয়া মিশ্রিত জলে ঐ কাগজ ডুবিয়ে শুকিয়ে নিলেই কৃত্রিম পার্চমেণ্ট পেপার তৈরি হবে।

**ট্রেসিং পেপার:** উপাদান সামান্য: এক দিস্তা কাগজ, আর ক্যানেডা ব্যলসম ও তার্পিন তেল সমভাবে মেশানো বার্নিস। সমভাবে মেশানো ঐ বার্নিসটি তুলি বা স্পঞ্জ দ্বারা ঐ দিস্তা কাগজের একটিতে বেশ করে মাখাতে হবে। তারপর ঐ কাগজখানিকে অন্যত্র শুকাতে দিয়ে, পরের কাগজটিতে ঐভাবে বার্নিশ মাখাতে হবে। ঐ ভাবে এক এক করে বাকী কাগজগুলিকে ট্রেসিং পেপারে পরিণত করতে হবে।

**কার্বন পেপার:** কার্বন পেপার অনুলিপি লিখনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এর অন্য নাম কপিং পেপার। প্রস্তুত প্রণালী—মসিনা বা রেড়ির তেলের সঙ্গে ভুষা কালি, ইণ্ডিগো কারমাইন, আল্ট্রামেরিণ, অথবা প্যারিস ব্লু,—এদের যে কোন একটি বা দু-তিনটি মিশিয়ে, তার সঙ্গে গ্রেন সোপ পরিমাণ মত মিশিয়ে নিলে যে বার্নিস তৈরি হবে, তা ব্রুস বা তুলির সাহায্যে কোন সাদা শক্ত কাগজের উপর লাগালেই কার্বন পেপার প্রস্তুত হবে।

**ফিল্টার পেপার:** ১০৪৩৩ স্পেসিফিক গ্রাভিটীর নাইট্রিক এসিডে কাগজ ডুবিয়ে নিয়ে পরিষ্কার জলে ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই ফিল্টার কাগজ প্রস্তুত হবে।

**ব্লটিং পেপার ঃ** ১০০ ভাগ অকজ্যালিক এসিডের সঙ্গে ৪০০ ভাগ এলকোহল মিশিয়ে সেই জলে সাদা কাগজ উত্তমরূপে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিলেই ব্লটিং কাগজ তৈরি হবে।

**ওয়াটার প্রুফ্ পেপার ঃ** ২ ভাগ বোরাক্স ও ২ ভাগ সেলাক, ২০ ভাগ জলে মিশিয়ে সাদা কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। স্পঞ্জ বা ব্রাসর দ্বারা কাগজে মাখিয়ে নিয়ে শুকাতে হবে। শুষ্ক হওয়ার পর নরম ব্রাস দিয়ে পালিস করলে, সে কাগজ আর নষ্ট হয় না।

**শিরীষ কাগজ ঃ** প্রথমে কয়েক টুকরো শিরীষ কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজাতে হবে। শিরীষটা বেশ নরম হলে, নরম আঁচে বসিয়ে গলিয়ে নিতে হবে। গরম থাকতে থাকতে একটা মোটা কাগজের উপর ঐ শিরীষ আঠাটা বেশ করে মাখাতে হবে। অতঃপর ঐ অবস্থায় শিরীষ মাখানো কাগজটার উপর কাঁচ চূর্ণ ছড়িয়ে দিলেই শিরীষ কাগজ তৈরি হবে।

**ঘরে তৈরি কাগজের ব্যবহার** (Home made paper for school use) : বর্তমানে যখন দেশ জুড়ে কাগজের অনটন চলছে, তখন বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে যাতে কাগজ তৈরি হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এভাবে ব্যাপক প্রচেষ্টা নেওয়ার ফলে যদি বিদ্যালয়গুলির কাগজের অভাব কিছুটা মেটে, সেটা কম বড় লাভ নয়। এই ভাবে যদি বিদ্যালয়গুলিতে অদূর ভবিষ্যতে কাগজের স্বয়ম্ভরতা আসে, তবে বিদ্যালয়গুলির অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে। সেটা কম বড় অর্থনৈতিক লাভ নয়।

তা' ছাড়া একদা শান্তিনিকেতনে আদর্শগত ভাবে যেমন—চিঠিপত্র বা, নিমন্ত্রণলিপি ছাপা, প্রশংসা পত্র শিক্ষা চর্চা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য কর্মের পত্রিকাদি শ্রীনিকেতনে প্রস্তুত কাগজেই মুদ্রিত হতো। শান্তিনিকেতনের নিজস্ব আভিজাত্য হিসাবে ঐ প্রথা দীর্ঘদিন চালু ছিল। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ যদি আদর্শ হিসাবে কাগজ তৈরী করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তা হ'লে যে কেবল বিদ্যালয়ের কাগজের অনটন কিছুটা মিটবে তা নয়, হস্ত প্রস্তুত কাগজ-শিল্পের উৎকর্ষ ও প্রসার ঘটবে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## বই বাঁধাই ( Book binding )

**ইতিহাসঃ** বই অমূল্য সম্পদ। যে দিন থেকে মানুষের মনে এই বোধ জন্মেছে, সেদিন থেকে শুরু হয়েছে বই-এর যত্ন, ঝাড়া-মোছা-বাঁধাই। কোন্ দেশে কবে থেকে যে বই বাঁধানো আরম্ভ হ'য়েছে, তার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই মাত্র জানা গেছে যে, চামড়ার মোড়ক দিয়ে বই-পুঁথিপত্তর সংরক্ষণের প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছে চীন দেশে। প্রাচীন ভারতের আর্যরা তুলট কাগজে লেখা পুঁথির পাণ্ডুলিপিগুলি বেঁধে রাখতেন পাতলা কাঠের ফলক দিয়ে। মিশর দেশে নাকি গালার তৈরি পেটিকার মধ্যে সযত্নে ধর্মগ্রন্থাদি রাখা হ'তো। তিব্বত, চীন, মিশর, ব্যাবিলনের মত প্রাচীন ভারতে নালন্দা ও বিক্রমশীলার গ্রন্থাগার ছিল বিখ্যাত। সেখানে নিশ্চয় কেতাব সংরক্ষণের নিমিত্ত কোন-না-কোন উপায়ে ঝাড়াই বাঁধাই হ'তো। প্রকৃত প্রস্তাবে বই বাঁধানোর ব্যাপারটা একটা শিল্প-রূপ নেয় আমেরিকায়—প্রায় দু'শ বছর আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বই বাঁধানোর নবাধ্যায় বিরচিত হয় আমেরিকায়। তখনই দেখা গেল যে, দপ্তরীখানা রীতিমত দপ্তর খুলে বসেছে। তখন সে আর ফোঁড়াই বাঁধাই মাত্র নয়, সে এক অন্য ব্যাপার। সেলাই-বাঁধাই-এর সে কি জহুরীপনা। বই বাঁধানোর নানা কলাকৌশল আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আজকে বই বাঁধানোর জগৎ সেই অবজ্ঞার নোংরা পরিবেশ নয়, তা এখন পরিণত হয়েছে রীতিমত এক প্রতিষ্ঠানে।

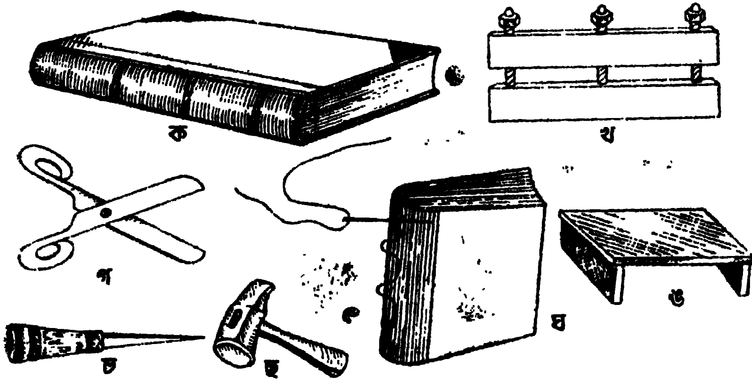
স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলকে যখন কোন না কোন অঞ্চল-সম্প্রসারণ দপ্তরের আওতায় আনা হয়েছে, তেমনি প্রায় গ্রামে-গঞ্জে স্থাপিত হয়েছে গ্রামীণ পাঠাগার। ফলে সেই সব গ্রন্থাগারের হাজার হাজার বই সংরক্ষণের জন্য বই-বাঁধাই-এর প্রয়োজন ও চাহিদা বেড়ে গেছে বহুগুণে। এখন এই বই বাঁধাইকে লাভজনক পেশা হিসাবে অনেকে গ্রহণ করেছে। শহরাঞ্চলে এই শিল্পের প্রসার আরও অনেক বেশী। আমরা এখানে বই বাঁধাই-এর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

**সাধারণ বই বাঁধাই :**—কোন বই বাঁধতে গেলে তার প্রাথমিক কিছু কাজ আছে। প্রথমে যে বই বাঁধতে হবে তা কত ফর্মার বই আগে জেনে নিতে হবে। সাধারণতঃ প্রেস থেকে ৮ পাতা বা ১৬ পাতায় এক একটা ফর্মা ছাপা হয়ে থাকে। সেইমত যত ফর্মার বই হবে তার ফর্মাগুলো প্রথমে পর পর ভেঁজে নিতে হবে। ভাঁজার সময় দেখে নিতে হবে পাতার নম্বরগুলো ঠিক পর পর ভাঁজা হয়েছে কিনা। প্রতি ফর্মার প্রথম পাতায় নিচের দিকে একটা নম্বর দেওয়া থাকে, সেটাই ফর্মার নম্বর। ১৬ পেজী বা ৮ পেজী ফর্মা ভাঁজা হলে ঐ ফর্মা নম্বরটা সব সময় সামনের দিকে

থাকবে। তাহলেই বুঝতে পারা যাবে যে ফর্মা ঠিক ভাঁজা হয়েছে। এখন সব ফর্মা ভাঁজা হয়ে গেলে ফর্মাগুলো নম্বর হিসাবে পর পর সাজিয়ে লাইন দিয়ে বসাতে হবে। যেমন প্রথমে বই-এর টাইটেলের ফর্মা থাকবে তারপর ক্রমান্বয়ে ২, ৩, ৪, ৫ থেকে শেষ ফর্মা পর্যন্ত বসবে। এখন এই সব ফর্মাগুলোকে পর পর তুলে গুছিয়ে রাখলে একটা বই হবে। তখন সেই বইকে সুতো দিয়ে সেলাই কিম্বা তার দিয়ে (ষ্টিচ সেলাই) সেলাই করা হয়ে থাকে। বইগুলো সেলাই হয়ে গেলে পুটে আঠা লাগিয়ে ছাপা মলাট (কভার) দিয়ে মুড়তে হয়। পরে বইগুলো "কাটিং মেসিনে" সেরা, পাইন ও লব এই তিন দিক কেটে দিতে হয়।

**বাঁধাই-এর উপকরণ ঃ** এই বই বাঁধাই-এর কাজে হাত দিতে গেলে প্রথমেই দরকার হবে উপকরণাদির। এই উপকরণাদির প্রধান যন্ত্রপাতি হিসাবে লাগবে ধারাল ছুরি, কাঁচি (ছোট ও বড়), সূঁচ, কাঠের তক্তা, সুয়া, লোহার প্লেট, ফোল্ডার, স্কেল, কাটিং মেসিন, ষ্টিচিং মেসিন ইত্যাদি।

**বাঁধাই** (binding) ঃ ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেইভাবে বই-এর তু'প্রান্তের তু'দিকে ১" ইঞ্চি পরিমাণ বাদ দিয়ে ১।২ ও ৩ যথাক্রমে তিনটি বিন্দু চিহ্ন দিতে হবে। এই বিন্দু তিনটিকে সুয়া দ্বারা তিনটি ছিদ্র করে নিয়ে ১নং ছিদ্র দিয়ে সূচে ভরা সুতো




ক—বাঁধান বই। খ—সেকেল্গা। গ—কাঁচি। ঘ—বই সেলাই পদ্ধতি। ঙ—তক্তি। চ—সুয়া। ছ—হাতুড়ি।

নিয়ে ২-এর মধ্য দিয়ে সোজা উপরে উঠিয়ে ৩নং ছিদ্রে প্রবেশ করাতে হবে। তৎপরে ঐ সুতাটিই আবার ঘুরিয়ে ১ নম্বরের মধ্য দিয়ে আবার উপরে উঠিয়ে নিলেই বই-এর সেলাই করা হবে। এখন এই ১নং সুতার উভয় প্রান্ত চাপ দিয়ে টেনে ডবল গিট দিয়ে বাঁধলেই সেলাই-এর কাজ শেষ হবে।

**প্রস্তুত প্রণালী ঃ** ছোট অথবা পুরাতন বই বাঁধাই করতে হ'লে প্রথমতঃ বইটি সমস্ত পুরাতন সেলাই কেটে ফেলে নূতন সেলাই করতে হবে, কোন পাতা ছেঁড়া

থাকলে অয়েল পেপার দ্বারা চিটিয়ে নিতে হবে। তৎপর বই-এর মাপ অনুযায়ী সাদা কিংবা ব্রাউন পেপার দু'ভাঁজ করে কেটে নিয়ে সাধারণ একটি (ডেবরা) পোস্তানী তৈরি করে নিতে হবে। এই কাগজ দু'খানি বই-এর দু'দিকের সেলাই ঘেঁষে আঠা দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে। একে বলে সাধারণ পোস্তানী।

অতঃপর বই-এর মাপে দরকার হলে সামান্য একটু বড় রেখে দু'খানি পেষ্ট বোর্ড কেটে নিতে হবে। বোর্ড দু'খানিতে আঠা মাখিয়ে বই-এর গোড়ার দিকে এক বা দু'ইঞ্চি বাদ দিয়ে উভয় দিকের পোস্তানীর উপর লাগিয়ে চাপ দিয়ে রাখবে। তৎপরে বাঁধাই কাপড় বা রেক্সিন মাপ মত কেটে নিয়ে আঠা মাখিয়ে বই-এর গোড়ায় লাগিয়ে দিতে হবে এবং রঙিন মার্বেল পেপার বোর্ডের উপর উভয় দিকে লাগিয়ে চাপ দিয়ে রাখতে হবে। বাঁধানো বইখানি যখন উত্তমরূপে শুকিয়ে যাবে, তখন কাটিং মেসিনে তিন দিক কেটে নিতে হবে।

**বোর্ড বাঁধানো খাতা ঃ** এক্সারসাইজ খাতা, বাঁধাই খাতা, নোট বই প্রভৃতি নানা রকমের বোর্ড বাঁধাই বাইণ্ডিং খাতা থাকে। এই সব খাতা তৈরি করতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপকরণ ও যন্ত্রপাতির আবশ্যক।

**যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি ঃ** সুয়া, কাঁচি, হাতুড়ি, সূঁচ, ছুরি, ফোল্ডার, কাঠের তক্তা, স্কেল প্রভৃতি এবং ফুলস্কেপ কাগজ, সাদা, লাল পিজবোর্ড, বাঁধাই কাপড়, রঙিন মার্বেল কাগজ, সরু সূতা, ব্রাউন কাগজ, বালির কাগজ, তুঁতে মিশ্রিত ময়দার আটা ইত্যাদি।

**প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ** সাদা অথবা রুলটানা এক দিস্তা কাগজ নিয়ে প্রয়োজন মত ২ ভাঁজ বা ৪ ভাঁজে খাতার মাপে ভাঁজ করতে হবে। প্রতি ভাঁজে ৪ কিম্বা ৬ তা হিসেবে একত্র করতে হবে। একে **জুস** বলে। জুসগুলি ফোল্ডারের দ্বারা সামান্য একটু ঘসে নিতে হবে। পরে কাঠের তক্তার উপর রেখে খাতা সেলাই আরম্ভ করতে হবে। জুসগুলি সেলাই করার সময় প্রথমে উপর এবং নীচের দিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ মার্জিন বাদ দিয়ে চারটি ঘর করতে হবে। মাঝখানের ঘর দুটি সরু **তচমার** মাপে হবে। আধ ইঞ্চি চওড়া ও মাপ মত লম্বা এক টুকরা বাঁধাই কাপড় অথবা শক্ত কাগজকে **তচমা** বা **ফ্যাপ** বলে। এইবার প্রথম জুসটির প্রথম ঘর থেকে সূচে ভরা সূতা গলিয়ে দ্বিতীয় ও ও তৃতীয় ঘরের তচমাটিকে কেন্দ্র করে চতুর্থ ঘরে সেলাই করে যেতে হবে।

এক সঙ্গে সবকটা জুস পরপর সাজিয়ে নিয়ে "তচমা" মাপ মত এবং সেলাই-এর ঘর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ করে লিখে দাগিয়ে নিলে কাজটা প্রথম শিক্ষার্থীদের শেখার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। প্রথম সূতা ভরা সূচটি বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে ১নং দাগ দেওয়া পথে, তারপর ২নং দাগ পথে বাইরে বের করে এনে আবার ৩নং দাগ দেওয়া পথে ভিতরে ঢুকিয়ে ৪নং দাগ দেওয়া পথে বাইরে বের করে এনে ৫নং পথে ভিতরে সূচকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে শেষ বারের মত ৬নং দাগ পথে বাইরে আনতে হবে। প্রথম ১নং দাগের ছিদ্রপথে সূতোর সামান্য খেই বার করে রাখতে

হবে। অতঃপর ৬নং দাগের নিচে যে জুস রাখা হয়েছে, তার পাশের ছিদ্রপথ দিয়ে সুচ ঢুকিয়ে দিয়ে অনুরূপভাবে সেলাই করে শেষে ১নং জুসের ১নং সুতার খেই-এর সঙ্গে কসে বেঁধে দিতে হবে। ঐ ভাবে প্রথম দ্বিতীয় জুসের মাপে ও নিয়মে পরপর একটা একটা করে জুস নিয়ে অনুরূপ ভাবে সেলাই করে যেতে হবে। প্রত্যেক জুসের সেলাই-এর পরে নিচের এক একটি জুস ধরে প্যাচ ( গিঁট ) তুলে দিতে হবে। সেলাই সমাপ্ত হলে ডবল গিঁট দিয়ে সুতা কেটে ফেলতে হবে। নতুন পুস্তকাদি ও এইভাবে সেলাই করতে হয়।

**তচমা আটকানোর নিয়ম :** এবার তচমা দু'টোর সুতা ভালো করে কসে এঁটে নিয়ে তচমার উপর আঠা লাগিয়ে পিজবোর্ডের সঙ্গে সেঁটে দিতে হবে। বই বা খাতার মলাটের জন্য যে বোর্ড দু'টি আগেই কেটে রাখা হয়েছিল, সে দুটিকে পিজবোর্ডের ভিতর দিকে আঠা দিয়ে এঁটে দিতে হবে। তারপর বই বা খাতার মাপের ডবল মাপের কাগজ ভাঁজ করে ভিতরে বোর্ডের সঙ্গে এমন ভাবে লাগাতে হবে, যাতে তচমা দু'টোই ঐ কাগজটার নিচে থাকে। ঐ কাগজটার নাম **আস্তর**। এই আস্তরের একটা দিক বোর্ডের সঙ্গে সাটা থাকবে। অন্য দিক বইয়ের অংশের সঙ্গে দু' ইঞ্চি আঁটা থাকবে। খাতা বা বইয়ের মাপে কাটা এক পাউণ্ড ওজনের বোর্ড বই বা খাতার উভয় দিকের গোড়ার দিকে সামান্য মার্জিন বাদ দিয়ে বোর্ড দু'খানি লাগাতে হবে। ঐ বোর্ডের মাপ অনুযায়ীই বাঁধাই কাপড় বা রেক্সিন কেটে নিয়ে আঠা মাখিয়ে বোর্ডের উপর লাগাতে হবে। এরপর ঐ বোর্ড দু'টোর উপর পছন্দমত রঙিন মার্বেল কাগজ উভয় পিঠে লাগাতে হবে। বোর্ডের উপর কোণা কেটে নিয়ে বসালে মলাটের সৌন্দর্য অনেক বাড়বে। উত্তমরূপে মার্বেল কাগজ রেক্সিন-কোণ সম্বলিত করে লাগানোর পর, খাতা বা বইটিকে চাপে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর ভালো ভাবে শুকিয়ে গেলে, কাটিং মেসিনে তিন পাশ ছেঁটে নিতে হবে।

## চামড়া বাঁধান বই

**যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি :** সূঁচ, সূয়া, ছোট বড় কাঁচি, হাতুড়ি, হাত-করাত, নিরুণী ( চামড়া কাটা ও ছাঁটার জন্য ), ফোল্ডার, ( বাঁশ, হাড় কিম্বা প্লাষ্টিকের ), কাঠের স্ক্রু বা সেকেল্লা ( চাপ দিয়ে খাট কাটতে বা বই বাঁধাবার পর প্যাকিং কাজের জন্য ), স্কেল, স্প্রিং ডিভাইডার, শ্বেত পাথর, লোহার প্লেট ও তক্তা ইত্যাদি আবশ্যক। তা ছাড়া পেপার কাটিং মেশিন, পিচবোর্ড ( ১॥—২॥ পাউণ্ড ওজনের ), ডবল ক্রাউন কাগজ ( ২৪ বা ৩২ পাউণ্ড ওজনের ), বাঁধাই কাপড়, রেক্সিন, চামড়া (ভেড়ির), মার্বেল কাগজ, ব্রাউন পেপার; সূতা, ময়দা, তুতে, কড়াই এবং আঠা রাখার পাত্রের ও প্রয়োজন্।

**সেলাই ও বাঁধাই পদ্ধতি :** সাধারণতঃ তিন ঘরে বা চার ঘরে ফোঁড়া

সেলাই, তমচা ও ডুরি জুস সেলাই বা লেই পেটা সেলাই ছাড়া চামড়ার বই বাঁধান হয়। প্রথমতঃ বইয়ের পুটে ৪টি ঘাট কাটতে হয় এবং মাঝখানের ঘর দুটিতে সরু সুতলী দিয়ে ডুরি বসিয়ে নিতে হয়। বই-এর প্রথম দিক থেকে ২।৩টি জুস একত্র করে এক একটি ডুরিকে কেন্দ্র করে ঠিক কোণাকুণিভাবে আঙুলের চাপ রেখে সেলাই করতে হয়। পরবর্তী এক গোছা **সেকসন** নিয়ে সেলাইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আঠা দ্বারা সংযুক্ত করে নিতে হয়।

এইভাবে প্রত্যেক গোছা কাগজের বা সেকসনের একাংশের সঙ্গে একই নিয়মে সমভাবে সুতা টেনে চাপ দিয়ে সেলাইয়ের সাহায্যে সংযুক্ত করে, নিতে হয়। এই সেলাইকেই লেপটা সেলাই বলে।

এবার সাদা কাগজ বইয়ের মাপে ভাজ করে সাধারণ পোস্তানী বা ডবল পোস্তানী তৈরি করে নিতে হয়। এই পোস্তানী দুটি বইয়ের পুট ঘেঁসে সেলাইয়ের উপর আঠা লাগিয়ে জুড়ে দিতে হয়। আর পোস্তানী লাগাবার পরে বইটির পুটে আঠা দ্বারা আস্তর লাগিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপরে বই-এর সেরা, পাইন ও লব—এই তিন দিক কেটে নিতে হবে।

বই কাটার পরে বই-এর পুটটি ধীরে ধীরে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গোল করে নিয়ে সেকেণ্ডারের মধ্যে চাপ দিয়ে ধরে বই-এর দু'দিকে একটু উঁচু ব্যাকিং করবে। এখন বই-এর দু'দিকে ডুরির সঙ্গে বোর্ড গেঁথে পুটের সমান করে লাগাতে হবে। তৎপরে বোর্ড দু'টির তিন দিক সামান্য একটু বড় করে কেটে ফেলতে হবে।

বইয়ের গোড়ার মাপ অনুযায়ী পুটে তিন ভাঁজ করে মোটা কভার কাগজ দিয়ে খোল তৈরি করে লাগিয়ে দিতে হবে। ইচ্ছে করলে মোটা কাগজের উপর চারটি বা পাঁচটি সমান ভাঁজ করে বোর্ডের সরু কুচি লাগাতে পারা যায়। সাধারণ কথায় একে বাত্তি বলে। চামড়াটা ভালো ভাবে জল ছিটিয়ে পিটিয়ে পাতলা করে এবং নিসকর্দার সাহায্যে ধারগুলোও একটু চেঁচে পাতলা করে নিতে হয়। তৎপরে পছন্দমত স্পিরিট গুলে নিয়ে বেশ ভালো করে ঘসে চামড়ায় লাগাতে হবে।

অতঃপর চামড়ায় আঠা মাখিয়ে বইয়ের পুটে কোণায় লাগিয়ে দিতে হবে। পরে আবার ২।৩ বার চামড়ার উপরে ন্যাকড়া দিয়ে বেশ করে ঘসে পালিশ করতে হবে। চামড়ার সমান করে বোর্ডের উপর মার্বেল কাগজ, বাঁধাই কাপড় অথবা রেক্সিন মাপ মত কেটে আঠা মাখিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। একটু বাদে ভিতরের পোস্তানীতে আঠা দিয়ে সেঁটে চাপে রাখতে হবে। প্রয়োজন বোধে বইটির গোড়ায় সোনার জল দিয়ে নাম লেখা বা ডিজাইন তোলাও যেতে পারে।

আবশ্যক হলে নমুনা বই দেখে বা অভিজ্ঞ বাঁধাই-শিল্পীর পরামর্শ নেওয়াটা যুক্তি-যুক্ত হবে। চেষ্টা করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বিভাগ থেকে সুলভে চামড়া, ব্যবসায়-ঋণ এবং সহজ কিস্তিতে পাওয়া যেতে পারে।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## বিদ্যালয়ের সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনা

## Running a School Co-operative store

**ইতিহাস :** বিদ্যালয়ে সমবায় শিক্ষার প্রবর্তনের বয়স খুব বেশী নয়। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বৃত্তি-মূলক শিক্ষা-পরিকল্পনা রূপায়িত হয় খোদ আমেরিকায়। তখনও কেবল বৃত্তি-মূলক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা নিয়ে ইওরোপের শিক্ষাবিদরা ব্যস্ত। শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উৎসাহী কর্তৃপক্ষরা শিল্প-শিক্ষার-বিষয়-ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। আমেরিকার শিক্ষাবিদরা তখন পদক্ষেপ করছেন আর এক ভাবনার জগতে। কয়েকটি প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়েছে সমবায় ভাণ্ডার। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দস্তুরমত দাঁড়ি পাল্লা নিয়ে বেচাকেনায় মশগুল।

তখন আমেরিকায় এক অভাবনীয় শিল্প সম্প্রসারণের ফলে, সাড়া পড়ে গিয়েছিল তদানীন্তন সমাজ-জীবনের প্রতিটি স্তরে। সে সম্প্রসারণ ঘটেছিল শিল্প-ব্যবসায় ও কৃষি-শিল্পের ক্ষেত্রে বিগত ১৮৬০ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সাহায্য লাভ করে ১৮৬২ সালের মোরিল আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ( Morill Act )। এই আইনে সুপারিশ করা হলো যে, মহাবিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষা-সুব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হলে বে-সরকারী জমিও কলেজ কর্তৃপক্ষ দখল করতে পারবেন। এই ব্যবস্থার পর ১৯১৭ সালে **স্মিথ হ্যাস্ অ্যাক্ট্** ( Smith Hughas Act 1917 ) বৃত্তি মূলক শিক্ষা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় কৃষি-শিল্প-ব্যবসা এবং গৃহশিল্পাদি কর্মসমূহকে। এখন এই সমবায় আন্দোলনই আমেরিকার বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে distritbutive education সংস্থারূপে কায়েম হয়ে বসেছে।

**ব্যবস্থাপনা :** উল্লিখিত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, আমেরিকায় সমবায় আন্দোলনের যা' কিছু ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন, তা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংযোগিতায় একজন সংযোগকারী-শিক্ষকের ( teacher co-ordination ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে একটি করে বিদ্যালয় সমবায় ভাণ্ডার খোলার আগে, অনেকগুলি প্রাথমিক কৃত্য আছে। সেগুলি সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত না হলে, আনুষঙ্গিক কোন ব্যবস্থাপনার কাজে হাত দেওয়াই যাবে না। তাই সে সম্পর্কে প্রথমেই এখানে আলোচনা করা যাক। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, জনসাধারণের অর্থে একটি বিদ্যালয় সমবায় ভাণ্ডার ( school Co-operative store ) পরিচালনা করতে গেলেই, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে একটি বিধিসম্মত **'কার্যকরীসমিতি'** গঠন করতে হবে। এই নির্বাচিত কার্য সমিতি

অতি অবশ্যই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত প্রতিনিধিমূলক (৫ থেকে ৭ জন সভ্য সম্বলিত) একটি সংস্থা হওয়া উচিত। এই কার্যকরী সমিতির ৭ জন সভ্যের মধ্যে পদাধিকার বলে যথাক্রমে প্রধান শিক্ষক হবেন সভাপতি আর শিক্ষক সংযোজক হবেন আহ্বায়ক সচিব। আর থাকবে ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি। তা ছাড়া থাকবে তিন জনের একটি **হিসাব পরীক্ষক সমিতি**। এই সমিতির তিন জন প্রতিনিধি, একজন শিক্ষক সহ আর দু'জন ছাত্র প্রতিনিধি ছাত্রদের দ্বারা ভোটে নির্বাচিত হবে। এই হিসাব পরীক্ষক সমিতিকে প্রতিমাসের ১৫ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে তিন জন সভ্য সম্বলিত বাজেট উপসমিতির নিকট। এই বাজেট কমিটিই তৈরি করবে আয়-ব্যয়ের একটি খসড়া পরিকল্পনা। হিসাব-পরীক্ষকদের বিবরণী অনুসারে বাজেটের আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ নির্ধারিত হবে।

এই প্রসঙ্গে সব চেয়ে বড় করণীয় কাজ হ'চ্ছে দুটি, যার উপর সমবায় ভাণ্ডারের আয়ুষ্কাল বহুলাংশেই নির্ভর করবে। যথা—(১) এই নব গঠিত বিদ্যালয়-সমবায় ভাণ্ডারের নাম **ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুসারে রেজেস্ট্রি করে নিতে হবে**। এবং (২) **প্রণয়ণ করতে হবে একটি পরিচালনার সংবিধান।**

**অন্যান্য শাখা :** এই সমবায় ভাণ্ডারে থাকবে চারটি শাখা। যথা—(ক) কৃষি-শিল্প বিপনি, (খ) মণিহারি বিপণি, (গ) ক্যানটিন এবং (ঘ) মজুত ভাণ্ডার। প্রথম দু'টি শাখার কাজ হবে বিদ্যালয়ের কৃষি-শিল্পজাত যাবতীয় সামগ্রী বেচাকেনা করা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন খাতা, পেনসিল থেকে নানা প্রসাধন সামগ্রী। ছাত্র-পরিচালিত ক্যানটিন বিদ্যালয়ের যাবতীয় ছাত্র শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের সুলভে চা-জলখাবার সরবরাহ করবে। আর মজুত ভাণ্ডারে বিদ্যালয়ে উৎপন্ন যাবতীয় শিল্প ও কৃষিজাত শস্য দ্রব্যাদি। ঋতুর উপযোগী ভালো বীজ, সার, যন্ত্রপাতি সব সময় মজুত-ভাণ্ডারে জমা থাকবে। বিক্রয় লব্ধ যাবতীয় টাকাই ব্যাঙ্কে বিদ্যালয়ের পাশ বই-এ জমা দিতে হবে। এই বইটি দেখা শোনা করবেন সংযোজক শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যুগ্মভাবে।

**শাখাগত প্রধান কর্তব্য :** এই সমবায় ভাণ্ডারের প্রতিটি শাখার কর্মিগণ অতি অবশ্যই কাঁচা মাল বা রসদাদি সংগ্রহ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত সমবায়িকা, এবং কৃষি-শিল্প দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন যাতে সুলভে ভালো জিনিস পাওয়া যায়। ক্যানটিনের জন্য Ration card করিয়ে নিতে হবে, নচেৎ ক্যানটিন চালানো সম্ভবপর হবে না।

**অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা :** মূলধনই সমবায় ভাণ্ডারের প্রাণশক্তি। কম পক্ষে হাজার ছয়েক টাকা লগ্নি করতে না পারলে সমবায় ভাণ্ডারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যাবে না। কাজেই জানতে হবে কিভাবে কোন্ উৎস থেকে সমবায় ভাণ্ডারের তহবিলে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হবে। অর্থ সংস্থানের দু'টি পথ খোলা আছে। যথা—বিদ্যালয়ের যাবতীয় ছাত্র-শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের সমবায় ভাণ্ডার

সমিতির সভ্য করে নিয়ে। সভ্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের ২ টাকা করে ভর্তি ফি জমা দিতে হবে। ৫।১০, বা তদূর্ধ্ব টাকা যাঁরা জমা দেবেন, তাঁদের লভ্যাংশের একটা নির্দিষ্ট হারে শেয়ার দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রতিটি সভ্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, সমবায় ভাণ্ডার ভিন্ন অন্য কোথা থেকেও সামান্য একটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও কেনা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ **স্মল ইণ্ডাস্ট্রি স্কিমের** আওয়াতার মধ্যে এনে, আমরা সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার নিকট থেকেও এককালীন ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ঐ কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে।

**স্থান নির্বচান ও উপকরণ সংগ্রহ :** পূর্ব বর্ণিত ব্যবস্থাদির সব পর্ব চুকে গেলে, বেচা-কেনা ও জিনিস মজুত রাখার সুযোগ সুবিধা আছে. এমন একটি কক্ষ নির্বাচন করতে হবে ঐ উদ্দেশ্যে। পরে নির্বাচিত বিপণি কক্ষটিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যে, জিনিস কেনা-বেচা ও মজুত রাখার দিক থেকে যেন কোন অসুবিধা না হয়।

**আসবাবপত্রাদি উপকরণ :**

সমবায় ভাণ্ডার পরিচালিত একটি কৃষি-শিল্প বা মণিহারি বিপণির কক্ষে কি কি উপকরণ থাকবে, নিচের তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

১। বুলেটিন বোর্ড ( bulletin Board )
২। ব্ল্যাক বোর্ড ( chalk Board )
৩। দেরাজ ( display case )
৪। স্টীল আলমারী ( Storage lockers )
৫। কয়েকটি হোয়াট্-নট্ ( Book cases )
৬। একটি পরিপূর্ণ আকারের আয়না ( full length mirror )
৭। জলাধার ( wash basin )

**আসবাবপত্র :**

আসবাব জাতীয় উপকরণাদির মধ্যে থাকবে :—

শিক্ষক-সংযোজকের চেয়ার, বই রাখার তাক, কোন, দুটি নোংরা ফেলার টব ( waste Baskets ), একটি কার্ড সাইজ ক্যাবিনেট, হোয়াট নট, দোকানের প্রদর্শনী টেবিল, টেবিল ল্যাম্প, একটি দেয়াল ঘড়ি, ম্যাগাজিন র‍্যাক।

**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম :** দপ্তর সংক্রান্ত কাগজ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মধ্যে যা যা থাকা উচিত তার একটা সম্ভাব্য তালিকা দেওয়া গেল :—

ক্যাশ বুক, টাইপ করার যন্ত্র, ছুরি, পাঞ্চিং মেশিন, আঠার শিশি, ফোঁড়না, হাতুড়ি, ট্রে, টিন কাটার, স্ক্রু ড্রাইভার, পণ্য প্রদর্শনের উপকরণ, রবার ষ্টাম্প, কালি কলম ইত্যাদি।

**শিক্ষক-সংযোজকের ভূমিকা :**

বিদ্যালয় সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনার ব্যাপারে একজন শিক্ষক সংযোজকের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনার সার্বিক সাফল্যের জন্য প্রত্যেকটি সংযোগকারী শিক্ষক মহাশয়ের কি কি করণীয় কাজ আছে, নিচে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

১। তিনি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা করবেন
২। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার ক্রমোন্নতি ঘটাবেন
৩। প্রবণতা অনুসারে ছাত্রনির্বাচন এবং যথা কর্তব্য নিয়োগ করবেন
৪। মাসিক কাজের পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করবেন
৫। তালিম দেওয়ার ( training plans ) পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবেন
৬। কাজের পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনায় তাঁর সক্রিয় সংযোগ থাকবে
৭। কেনা-বেচার কাজে শিক্ষানবিশী করছে যে সব ছাত্র, তাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করবেন
৮। শ্রেণীগত তালিমের সঙ্গে ব্যবহারিক কাজের কতখানি অভিযোজন ঘটছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন
৯। ছাত্রদের গৃহ পরিদর্শন করবেন
১০। অন্যান্য শিক্ষক মণ্ডলীর সঙ্গে সহৃদয় সহযোগিতা থাকবে
১১। উপদেষ্টা সমিতির সঙ্গে এই সংযোগকারী শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক থাকবে
১২। সংগঠন ও শাসনের ক্ষমতা থাকবে
১৩। সংগঠক বা শিক্ষা-নবিশ ছাত্রদের সম্মেলনের ব্যবস্থা করবেন
১৪। নির্দেশ পরিবেশনার উন্নতিসাধন করবেন
১৫। সমাজ পরিবেশের ( বিদ্যালয়ের ) উপাদানকে কাজে লাগাবেন
১৬। পেশা-ভিত্তিক কাজের জন্য সংগঠনাত্মক ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করবেন
১৭। কাজের সমীক্ষা ও সমালোচনা করবেন
১৮। মূল্যায়ণ ও অনুসরণের ব্যবস্থা করবেন

**ছাত্র নির্বাচন :** সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনা করাটা তেমন কঠিন নয়, যদি উপযুক্ত নিষ্ঠাবান কর্মী পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে নৈতিক মূলধন হিসাবে চাই সততা সাংগঠনিক ক্ষমতা আর ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা। এসব কারণে ছাত্র নির্বাচন পর্বটি, এক্ষেত্রে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেননা, এই আদর্শবান সংকর্মীর অভাবে আমাদের দেশ কোন সমবায় প্রতিষ্ঠান সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনি। তাই সমবায় আন্দোলনের উদ্যম মাঝে মাঝে আমাদের মনে চকিত আশার আলোক সম্পাত করলেও, এখনও সংশয়ের অন্ধকার জমে আছে আমাদের অনাস্থার দিগন্ত জুড়ে। এই কারণে ছাত্রনির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে :—( ১ )

প্রবণতার দিকে নজর রেখে এমন সব ছাত্রদের বাছাই করতে হবে, যারা সেই সেই প্রার্থিত পদে বা কাজে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শনে সমর্থ হবে। (২) কোন বিষয় ভাবনা নিয়ে সপ্তাহ খানেক হাতে কলমে কাজ করার পর, নিরপেক্ষ বিচারে যাদের যথার্থ উপযুক্ত বলে মনে হ'বে, তাদেরই সমবায় শিক্ষা ব্যবস্থার কর্মী হিসাবে নির্বাচন করতে হবে। (৩) নির্বাচিত ছাত্রদের কোন-না-কোন কার্যে শিক্ষা নবিশীর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তালিম দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

**ধীরে ধীরে তালিম** ( Step by step training ) : যেমন নির্ভুল পদক্ষেপে সঠিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, তেমনি Systematic Training plan leads to career objectives. অর্থাৎ ব্যবহারিক শিক্ষার সঠিক তালিমটা যদি পর্যায়ক্রমে লাভ করা যায়; তবে সেটাই হবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের চাবিকাঠি। এই যে ক্রমপর্যায়ের শিক্ষা—এর সব চেয়ে বড় সুবিধা এই যে, কাজ ও ব্যবস্থাপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে একটা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত থেকে সমাপ্তিতে পৌছাতে হয়। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা নিয়োগকর্তাদেরও সুবিধা এই যে তাঁরাও যোগ্যতার নৈপুণ্যকে প্রত্যক্ষ করেই উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নিয়োগ করতে পারেন। এটাই বর্তমান যুগে কর্মী নির্বাচনের শ্রেষ্ঠ নিরিখ রূপে বিবেচিত হয়েছে।

**নির্বাচনযোগ্য ছাত্রদের গুণাবলী** : এই কর্ম সংস্থানমূলক শিক্ষায় যারা ভর্তি হতে চায়, তাদের যে যে যোগ্যতাবলী থাকা উচিত নিম্নে তার একটি তালিকা দেওয়া গেল :—(১) যারা তাদের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নিম্ন কাজের যে কোন একটি কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছুক যেমন,—**কেনা বেচা** ( marketing ) **গোছ করা** ( merchandiicng ), **খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা** অথবা বিদ্যালয়ের সমাপনান্তে কাজ করতে চায় কিনা।

(২) অন্যান্য কাজকর্ম যেমন—হিসাব পরীক্ষক, পরিবহনের, সংগঠকের কাজ করতে চায় কিনা ( প্রাথমিক পরীক্ষার যোগ্য বলে বিবেচিত হলে, তাদের বিষয় চিন্তা করতে হবে )

(৩) বিশেষ ব্যবহারিক জ্ঞান ও যোগ্যতাগত কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে

(৪) ন্যূনপক্ষে শিক্ষার্থীদের বয়স ১৬ বৎসর হওয়া চাই

(৫) ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা কাজের উপযোগী ও অনুকূল হলে

(৬) শারীরিক সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা হওয়া চাই।

**সামগ্রিক পরিকল্পনা** : যে কোন সমবায় পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করতে হলে, পূর্ব প্রস্তুতি চাই। যেমন একটি নাটকের মঞ্চসাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে, কতটা যত্ন সহকারে বইটার মহড়া দেওয়া হয়েছে, তার উপর। তেমনি বিদ্যালয়ের অপরিণতমনা ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে একটা সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনা করার আগে অনেক পূর্বভাবনা আর প্রস্তুতির দরকার। যেমন স্থান নির্বাচন, রেজিষ্ট্রিকরণ, অর্থ সংগ্রহ কার্যসূচী নির্ধারণ প্রভৃতি প্রাথমিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলো মিটে গেলে, সারা বছরের জন্য তৈরি

করতে হবে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা। সেই সঙ্গে খাতাপত্র, গার্ড ফাইল, ক্যাশ বুক, ব্যাঙ্কের পাশ বই খোলা ইত্যাদি হয়ে গেলে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে কমিটি গঠন ও নির্বাচন পর্ব সেরে ফেলতে হবে। তারপর ধাপে ধাপে সম্প্রসারণের কাজে হাত দেওয়াই উচিত। এক সঙ্গে অনেকগুলি কাজে হাত দেওয়াটা ঠিক হবে না।

**কার্যারম্ভ:** ধরা যাক, সমবায় বিপণি আরম্ভ হয়েছে কাল থেকে। ডিউটি রোষ্টার অনুসারে প্রথম দু দিন কাজ করার পর একটা অসুবিধা দেখা দিল। দশম শ্রেণীর মনোরঞ্জন টিফিনের পর ক্যাশ কাউণ্টারে এসে দেখল, যে, তার আগে কে ডিউটি দিয়ে গেছে, তার নাম ধাম কিছু লেখা নেই। তহবিলে কত ক্যাশ ছিল, বা সে কত বেচাকেনা করে গেছে, তাও জানার উপায় নেই। তা'হলে উপায়? মনোরঞ্জন একজনকে ভাঁড়ারে বসিয়ে সংযোগকারী শিক্ষক বিনোদবাবুর কাছে ছুটে গেল।

বিনোদবাবু সব শুনে বল্লেন ত্রুটিটা আমারই বলতে পারো। কেননা, বেচাকেনার পরপর ডিউটি বদলের সময় একটা লেজার বই বা **খতিয়ান বহি** কাউন্টারে রাখতে হবে। সেটায় ডিউটি বদলের সময় অর্পণকারী বাঁ দিকে দস্তখত করে আয়-ব্যয় ও বেচাকেনার হিসাব নিকাশ করে যাবে। সেটা দেখে ক্যাশ মিলিয়ে নিয়ে গ্রহণকারী তার উপরে স্বাক্ষর করবে। এইভাবে মনোরঞ্জন যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তার আর, পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। তা ছাড়া সমবায় কর্মীদের প্রয়োজন হবে একটি অভিজ্ঞান-পত্র (identity card) ঐ দুটোরই নমুনা নিচে দেওয়া গেল।

(১) নং অভিজ্ঞান পত্র

## *রামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয় সমবায় ভাণ্ডার*

সাং... ... ... ... ... ... ...জেলা

**কর্মীর অভিজ্ঞান পত্র নং.........**

শ্রী... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. শ্রেণী

ক্রমিক সংখ্যা... . .. ...

| তাং | তাং | তাং | তাং | বিপণি | ভাণ্ডার | আসার সময় | যাওয়ার সময় | স্বাঃ অভিঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

এই অভিজ্ঞান পত্র একান্ত ব্যক্তিগত, হস্তান্তর যোগ্য নয়। প্রয়োজন হ'লে পরিদর্শনার্থে পেশ করতে হ'বে।

বিদ্যালয় ত্যাগ, বহিষ্করণ, ছাটাই প্রভৃতি ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ এই অভিজ্ঞান পত্র অফিসে জমা দিতে হবে। অন্যথায় ৫০ পঃ জরিমানা দিতে হ'বে। কোন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞান পত্র খোয়া গেলে, দেয় অর্থ জমা দিলে প্রতিলিপি দেওয়া হবে।

স্বাক্ষর
**প্রধান শিক্ষক**
রামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়
সাং··· ··· ···তাং

## রামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়

সাং··· ··· ··· ···জেলা

### বেচাকেনার খতিয়ান বহি

(২) নং বেচাকেনার খতিয়ান।

| তারিখ | কর্মরত শিক্ষার্থীর নাম স্বাক্ষর | প্রবেশ | প্রঃ স্থা | তহবিলের কত জমা | কি থাকল | নগদ বিঃ পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

অর্পণকারীর স্বাক্ষর
শ্রেণী······
ক্রঃ সংখ্যা······
তাং······

দায়িত্ব গ্রহণকারীর স্বাক্ষর
শ্রেণী······
ক্রঃ সংখ্যা······
তাং······

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## ফিনাইল ও সংক্রামক রোগবীজনাশক পদার্থ তৈরী

মাঠের বা ফসলের পোকামাকড়, রোগের জীবাণু ও দুর্গন্ধাদি দূর করার জন্য হাসপাতাল, ড্রেন ও পায়খানা প্রভৃতিতে নানাপ্রকার তরল ও গুঁড়ো জীবাণু ধ্বংসকারী

ওষুধ ব্যবহার হয়। ফসলের রোগ প্রতিকারের জন্য ও সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## ফিনাইল

| | |
|---|---|
| রজন | ১০ কেজি |
| ক্যাষ্টর অয়েল | ৪ কেজি |
| ক্রিয়োজোট অয়েল | ৭ গ্যালন |
| কষ্টিক সোডা | ২ কেজি |
| কার্ব্বলিক অ্যাসিড | ২ আউন্স |
| জল | ৬ গ্যালন |

প্রথমে একটা লোহার তৈরী কড়াতে রজন ও তেল রেখে উনানে বসিয়ে মৃদু জাল দিতে হবে। রজন গলে গেলে তাতে কষ্টিক সোডা ২ গ্যালন জলে গুলে ঢেলে দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে। তারপর যখন সাবানের মত হবে, তখন তাতে অল্প অল্প জল দিতে হয়। তারপর কড়া থেকে সামান্য তুলে এক বালতি জলে ফেলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে সাবান জলের মত সাদা হল কিনা। যদি হয়েছে বলে মনে হয় তাহলে ওতে আরও কিছুটা জল দিয়ে নামাতে হবে। তারপর ঠাণ্ডা হলে ক্রিয়োজোট তেল, কার্বলিক অ্যাসিড ও বাকী জল অল্প অল্প করে মিশিয়ে নাড়তে হবে। এতে শতকরা ৫ ভাগ পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট মিশিয়ে আরও ভাল করে নাড়লে ভাল জিনিষ তৈয়ারী হবে। ফিনাইল জীবাণু ধ্বংস করে ও দুর্গন্ধ দূর করে। সহর অঞ্চলে ড্রেন, নর্দমা, পায়খানা, বেডপান প্রভৃতির দুর্গন্ধ দূর করার জন্য ফিনাইল ব্যবহার হয়।

## ডিসিনফেকট্যাণ্ট

| | | |
|---|---|---|
| (এক) | রজন | ৩ কেজি |
| | চর্বি | ৩ কেজি |
| | ক্রিয়োজোট অয়েল | ১৫ কেজি |
| | ন্যাপথলিন গুঁড়ো | ১ কেজি |
| | কষ্টিক সোডা | ১ কেজি |
| | জল | ৫ কেজি |

আগে অল্প তাপে রজন ও চর্বি গলিয়ে নিতে হবে। তারপর অন্য একটা পাত্রে জল দিয়ে কষ্টিকসোডা গলিয়ে রজনের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। ভালভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর ওর সাথে ক্রিয়োজেট অয়েল মিশিয়ে দিতে হবে। ঘন হয়ে এলে উনানের উপর থেকে নামিয়ে ন্যাপথলিন মিশিয়ে একটা ঢাকনাযুক্ত পাত্রে ঢেলে ঢাকনা বন্ধ করতে হবে। না হলে ন্যাপথলিন উবে যাবে।

| (দুই) | ক্রিয়োজোট | ১০ গ্যালন |
|---|---|---|
| | রজন | ৭ কেজি |
| | কষ্টিক সোডা | ২ কেজি ২৫০ গ্রাম |
| | ফুটন্ত জল | ৩ গ্যালন |
| | মেথিলেটেড স্পিরিট | ২ পাইন্ট |
| | চিটাগুড় | ১½ কে. জি. |

আগে রজন আগুনের তাপে গলিয়ে তাতে ক্রিয়োজোট মিশিয়ে পরে স্পিরিট মেশাতে হবে। কিছু পরে ওতে কষ্টিক সোডা লাই, ফুটন্ত জল ও চিটাগুড় দিয়ে আগুনের তাপে ফুটাতে হবে। যখন সব জিনিসগুলো গলে গিয়ে ভালভাবে মিশে যাবে তখন নামিয়ে পাত্রে রাখতে হবে।

| (তিন) | হলদে সাবান | ½ কেজি |
|---|---|---|
| | আলকাতরা | ১½ কেজি |
| | সোডা | ১০০ গ্রাম |
| | জল | ১½ কেজি |

আগে সাবানকে কোন যন্ত্র দিয়ে চেঁছে পাতলা পাতলা ও ছোট ছোট আকারে করে নিয়ে তাতে আল্‌কাতরা মিশিয়ে ফোটাবে। তারপর জলে সোডা গুলে ধীরে ধীরে ওতে ঢেলে মিশিয়ে নামাতে হবে।

## ডি. ডি. টি (ফ্লিট জাতীয়)

| | |
|---|---|
| কেরোসিন তেল | ২ বোতল |
| নেপথলিন গুঁড়া | ½ পাউণ্ড |
| ক্রিয়োজোট অয়েল | ৩ আউন্স |
| অয়েল পাইরেথাম | ৩ " |
| অয়েল সিট্রোনিলা | ৩ " |
| কার্ব্বালিক অ্যাসিড | ১ ড্রাম |

এই জিনিষগুলি নেড়ে কেরোসিন তেলে মিশিয়ে নাও। এর দ্বারা মশা, মাছি, পোকা-মাকড় ইত্যাদি অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# *বিদ্যালয়-গৃহের-চুনকাম ও রূপসজ্জা*

"The educational effect of good premiess is undoubted A simple dignified building is calculated to make the scholars proud of their school and to exercise a constant and impressive influence in the neighbourhood concerning the idea's of Education" Bray.

বিদ্যালয় গৃহের রূপসজ্জার প্রয়োজন আছে কি ? এ প্রশ্নের একটি চমৎকার জবাব দিয়েছেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদ 'ব্রে'। তিনি বলেছেন যে, বিদ্যালয়-পরিবেশটা মোটেই পরিশিষ্ট কথা মাত্র নয়, ওটা মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্য। শিশু-মানস-গঠনের প্রাথমিক প্রয়োজনের পরম কথা। তাঁর উদ্ধৃতিটিকে বিশ্লেষণ করে, বক্তব্যটাকে বিশদ করা যাক। তিনি বলেছেন যে, বিদ্যালয়ের ভালো পরিবেশের যে একটা শিক্ষাগত প্রভাব আছে, তা নিঃসন্দেহে সত্য। একটি সাধারণ অথচ অভিজাত বিদ্যালয় গৃহের প্রভাব এমন সক্রিয় যে, সেই বিদ্যালয়ের গর্বে ছাত্রদের বুক ভরে ওঠে এবং তার হৃদয়গ্রাহী একটা প্রভাব নিকটবর্তী অঞ্চলে শিক্ষাদর্শগত একটা প্রভাব সতত‌ই সঞ্চার করে। আবার নোংরা পরিবেশের কুফলটা যে কি ভয়াবহ, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ **স্পেনসার** তার একটু আভাস দিয়েছেন। বলেছেন যে, "Dirt is generally accompanied by an inclination towards crime"—Spencer. অর্থাৎ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশই ছাত্রদের মনে জাগিয়ে দিতে পারে একটা অপরাধ-প্রবণতা।

**বিদ্যালয় গৃহের চুনকাম পর্ব :** উক্ত শিক্ষাবিদদ্বয়ের বক্তব্যে বিদ্যালয়-পরিবেশ-প্রসঙ্গ গুরুত্ব লাভ করেছে। তাঁরা শিক্ষার সঙ্গে যে পরিবেশকে অভিন্ন করে দেখেছেন, সেই পরিবেশকে সুন্দর করে তোলার জন্য বিচিত্র রূপসজ্জার প্রয়োজন আছে। শোভা ছাড়াও, বিদ্যালয়গৃহের আয়ুষ্কাল বাড়ানোর দিক থেকেও এই সংস্কারের প্রয়োজন আছে। সর্বোপরি প্রয়োজন স্বাস্থ্যের খাতিরে। তা'হ'লে দেখা গেল যে, পরিবেশ-পরিচর্যার পিছনে একাধারে **সৌন্দর্য-সংস্কার-স্বাস্থ্য আর মনস্তত্ত্বগত** চতুর্বিধ কারণ রয়েছে।

**চুনকামের উপকরণ ও ব্যবস্থাপনা :** এখন চুনকামের জন্য কি কি উপকরণের প্রয়োজন সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। নূতন বা পুরাতন যে কোন বিদ্যালয়-গৃহে চুনকাম করতে হলে অস্তর ধরাতে হয়। এটা রঙের বা চুনের প্রথম লেপ। এই অস্তর না ধরালে, অন্য কোন রঙ খোলতাই হবে না। আস্তর ধরানোর আগে আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক প্রাথমিক কাজ আছে। যেমন বাঁশের ভারা বেঁধে নিয়ে ঝুল ঝাড়া দিয়ে

বিদ্যালয় গৃহের ভিতর বাইরের দেওয়ালগুলো সাফ করে নিতে হবে। দেওয়ালগুলো নূতন হ'লে, সজ্জার পূর্বে ত্রুটি সংশোধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু পুরানো দেওয়ালের কোথাও যদি ভাঙ্গা, ফাটল, তৈলাক্ত দাগ ধরে থাকে, তবে প্রয়োজন বোধে প্লাষ্টার, পুটিং, সাবান জল, স্যাণ্ডপেপার প্রভৃতির সাহায্যে প্রথমে খুঁতগুলিকে সেরে নিতে হবে। খুঁতগুলি দূরীভূত হলে জলরঙ, তেলরঙ, তেলরঙে ছবি বা ফ্রেস্‌কো ( Fresco ) ডিসটেম্পার, চিত্র-ফলক ( Stencil ), আলপনা, দেওয়াল কাগজ, ছবি, লতাপাতা প্রভৃতির সাহায্যে বিভিন্ন উপায়ে দেওয়ালকে সুসজ্জিত করা যেতে পারে। এর জন্য কেবল জলরঙ করলে, প্রয়োজন হবে পাথুরে চুন, প্রয়োজন মত কয়েক হাঁড়ি কলিচুন, কোষ্টার দিয়ে বড় মোটা তুলি বানিয়ে নিতে হবে। বাইরের দেওয়ালের জন্য চুনের সঙ্গে পরিমাণ মত এলামটি বা লালরঙ, পেউড়ি রং মিশিয়ে নিতে হবে অথবা পাতলা করে সিমেণ্টের সঙ্গে ভূযো কালি মিশিয়ে নিলে গাঢ় ছাই-রঙের যে স্নিগ্ধ সুদৃশ্য লেপ হবে, তার সুবিধা এই যে, ওতে সহজের ছাতা ধরা দাগ ফুটে উঠবে না। বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষগুলি সাদা পাথুরে চুনের সঙ্গে কিছু পরিমাণ কলি চুন মিশিয়ে খানিকটা পেউড়ি রঙ দিয়ে নিলে চুনগোলাটা বেশ ফুটে উঠবে :

**জলরঙ :** পাথুরে চুনের গোলাটা বড় টিনের ড্রামে ঢালার সময় মজবুত অপেক্ষাকৃত মোটা ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। অতঃপর এই গোলা চুনের সঙ্গে রঙ এবং পরিমাণ মত গঁদের আঠা মিশিয়ে সাধারণ জলরঙ তৈরি করা যায়। এই ধরণের রঙে খরচ অপেক্ষাকৃত কম পড়ে। এই কারণে বিদ্যালয় গৃহেই ভাল রঙের ব্যবহার করা যেতে পারে। চুনকামের মতই পাটের তুলির সাহায্যে স্কুলঘরের ভিতরকার জল রঙ লাগানো যেতে পারে। অথবা চুনকাম হওয়ার পরও জলরঙ লাগানো যায়। শ্রেণী কক্ষে সাদা রঙ দেওয়াটাই উচিত, কারণ অন্য রঙ আলোর ঔজ্জ্বল্যকে কমিয়ে দেয়। বিদ্যালয়ের অফিসঘরে ফিকে গোলাপী রঙের জলরঙ ব্যবহার করলে সৌন্দর্য বৈচিত্র্য বাড়বে।

**তেলরঙ :** বাজারে নানা রঙের তৈরি রঙ কিনতে পাওয়া যায়, সেই রঙ কিনে এনে তার সঙ্গে পরিমাণ মত তারপিন বা মসনের তেল মিশিয়ে রঙটাকে পাতলা করে নিতে হয়। তারপর সেই রঙ দেওয়ালে লাগানো চলে। তেল রঙের সুবিধা এই যে, প্রয়োজন মত দেওয়াল ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা যায়। তেল রঙে খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী পড়লেও, এই রঙ সহজে নষ্ট হয় না। দেওয়ালে তেলরঙ করার কিছুটা অসুবিধা আছে। যেমন প্রথমবার রঙ করার পর দ্বিতীয়বার রঙ করতে হলে, প্রথমবারের রঙ চটিয়ে ফেলতে হয়। এই কারণে তেলরঙ ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে।

**বিদ্যালয়ের হল ঘরে :** বিদ্যালয়ের হল ঘরের দেওয়ালগুলোকে একটু সুশোভিত করার জন্য ডিসটেম্পার রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। **হোয়াইটিং** এর সঙ্গে শিরীষ ও পছন্দ-মত রঙ মিশিয়ে এই রঙ তৈরি হয়। এই রঙ সহজে উঠে যায় না। এছাড়া, জল

রঙ বা তেলরঙের তুলনায় ডিসটেম্পার ব্যবহারে দেওয়াল অধিকতর সুন্দর দেখায়। তবে দক্ষ মিস্ত্রী দিয়ে না করালে, এই রঙ দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

**ফ্রেস্কো:** প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, হল ঘর, করিডোরের দেওয়ালে বেশ রুচি রঙ ও ডিজাইনের কিছু ফ্রেস্কোর কাজ করা যেতে পারে। তেল রঙের সাহায্যে দেওয়ালে যে ছবি আঁকা হয়, তাকে বলে **ফ্রেস্কো**। এই ফ্রেস্কোই ভারতীয় শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন। ঘরের আয়তন, প্রয়োজন ও অন্যান্য আসবাব সজ্জার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে, বিদ্যালয়ের হলঘর বা অন্যান্য বিশেষ কক্ষে এই ধরণের ছবি আঁকতে পারলে, বিদ্যালয় পরিবেশ অতিশয় দর্শনীয় হয়ে উঠবে। দেওয়ালের উপর নানা ধরণের ছবি আঁকানো একটু ব্যয়সাধ্য ও কঠিন ব্যাপার। বিদ্যালয়ের আর্টের শিক্ষক ছাত্রদের সাহায্য নিয়ে প্রকল্প কাজ হিসাবে এই ফ্রেস্কো আঁকার দায়িত্ব নিতে পারেন।

**চিত্রফলক** ( Stencil ): ফ্রেস্কোর কাজ করানো সম্ভবপর না হলে, চিত্রফলকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া ফ্রেস্কো বা দেওয়াল চিত্র আঁকতে যে অঙ্কন দক্ষতার দরকার, চিত্রফলকের সাহায্যে ছবি আঁকতে সে দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। তবে যে ছবিটি দেওয়ালের গায়ে তুলতে হবে, তার চিত্ররূপটি টিন-প্লেটের বা পিচবোর্ডের উপর প্রথমে এঁকে নিতে হয়। তারপর ব্লেড, কাঁচি বা বাটালির সাহায্যে কেটে নিতে হয়। স্টেনসিলের তিনটি সুবিধা আছে। যথা—(১) স্টেনসিলের কাজ ফ্রেস্কো অপেক্ষা অনেক তাড়াতাড়ি করা যায় (২) দেওয়ালে মাপজোখ করার যে হাঙ্গামা থাকে, স্টেন-সিলের কাজে তেমন কোন অসুবিধা নেই। (৩) তৃতীয়ত স্টেনসিলে আঁকা ছবির সামঞ্জস্য এবং একই গঠন সঙ্গতি বজায় থাকে। তা, ছাড়া এই প্লেটের সাহায্যে দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে একই ছবি প্রয়োজন মত বহুবার অঙ্কিত করা চলে। তবে এর ভালোমন্দ রুচিজ্ঞান, ভালো ডিজাইন সংগ্রহ, কালার ম্যাচিং এর উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

**ভিতরের ছাদের সাজসজ্জা:** আগেকার দিনে রাজা রাজড়াদের দরদালানে, ঠাকুর ঘরের ভিতরের ছাদে নানা ধরনের নক্সা অথবা সুদৃশ্য ঝাড় লণ্ঠন দিয়ে সাজানো থাকতো। অজন্তার কক্ষের ভিতরের ছাদে অনেক বর্ণাঢ্য ফ্রেস্কোর অক্ষয় নিদর্শন বিদ্যমান। ইলোরার গুহা মন্দিরের ছাদে খোদিত আছে চোখ জুড়ানো অসংখ্য নক্সা। আজকাল যখন এদেশের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছাদ ঢালাই এর প্রচলন হয়েছে, তখন এদেশের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলঘরগুলির ভিতরকার ছাদ-গাত্রের সাদা জমির উপর গাঢ় বাদামী রঙ দিয়ে নক্সা এঁকে দিলে হলঘরগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। ছাদের ভিতরের দিকে নক্সা আঁকাটা বেশ অসুবিধাজনক। কাজেই এক্ষেত্রে স্টেন্‌সিলের সাহায্য নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে।

**দেওয়াল কাগজ** ( Wall paper ): কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং প্রভৃতি যে সব জেলার আরণ্যক ও পার্বত্য পরিবেশের যে সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠ নির্মিত, সেখানকার বিদ্যালয়গৃহগুলিকে দেওয়াল কাগজ বা ওয়াল

পেপার দিয়ে মনোজ্ঞ সুন্দর করে তোলা যায়। সেখানে এই দেওয়াল কাগজগুলি এক দিকে যেমন ঠাণ্ডা নিবারণ করবে, অন্য দিকে তেমনি দেওয়ালস্থ ফুটো-ফাটার যাবতীয় ত্রুটিগুলোকে ঢেকে দিয়ে গৃহ-পরিবেশকে সুন্দর, সুদৃশ্য করে তুলবে। দেওয়াল কাগজ বিভিন্ন রঙের এবং চিত্র বিচিত্রকরা কিনতে পাওয়া যায়। সেই নক্সা আঁকা কাগজ গুলোকে আঠা দিয়ে দেওয়ালের গায়ে লাগিয়ে দিতে হয়। ঠিকমত লাগাতে পারলে, বিদ্যালয় কক্ষের দারুময় রুক্ষ পরিবেশগুলোও অপরূপ হয়ে উঠবে। গৃহস্থ অন্যান্য জিনিস পত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কাগজের রঙ ইত্যাদি নির্বাচন করতে হবে। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যে-দেওয়ালে এইসব কাগজ ব্যবহার করা হবে, সেই সব দেওয়ালে মানানসই গোছের কয়েকখানি ছবি ছাড়া আর কিছু রাখা চলবে না। কেননা আসবাবপত্রের বাহুল্য শোভা নয়, বোঝা স্বরূপ। আর যেখানের দেওয়ালে এই জাতীয় রঙিন কাগজ ব্যবহার করলে, সেই সব দেওয়ালের সন্নিকট থেকে আসবাব পত্রগুলোকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। তা না হ'লে খোঁচা লেগে' ছেলেদের মাথার তেলে ঐ সব সুসজ্জিত দেওয়ালের কাগজ ছিঁড়িতে পারে অথবা ছেলেদের মাথার তেলে দেওয়ালের অংশবিশেষ নষ্ট হতে পারে।

**লতার ব্যবহার :** মানিপ্ল্যান্ট প্রজাতির অনেক লতা কেবল জলের মধ্যেই বর্ধিত হয়। ঘরের দেওয়ালের কার্নিশে বা জানলার কোণ ঘেঁষে তাকের মত জায়গায়, ছোট একটি কাঁচের পাত্রে বসিয়ে ঝুলিয়ে রাখা যায়। সজীব সবুজ লতার এই সৌন্দর্য সাদা দেওয়ালের পটভূমিকায় একটা শ্যামল স্নিগ্ধতা এনে দেবে।

**দেওয়ালে চিত্র সন্নিবেশ :** কিশোর-চিত্তে চিত্রের নিত্য আবেদন। তাই ছবির আহ্বান নীরব হলেও' অনিবার্য তার আকর্ষণ। তাই শিক্ষাবিদরা বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে দেওয়াল চিত্র সন্নিবেশ করার সুপারিশ করেছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের বিদ্যালয়গুলিতে পরিবেশ সজ্জার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এখনও অতটা পরিবেশ সচেতনতা আসে নি। তবে একথা ঠিক যে, দেওয়াল সজ্জায় চিত্র সন্নিবেশের বিশেষ প্রয়োজন আছে। দেওয়ালের ঠিক মত স্থানে রুচিসম্মত ছবি টাঙিয়ে দিলে দেওয়ালটি সুন্দর দেখায়।

**শ্রেণী কক্ষে চিত্র সন্নিবেশ :** বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেণী কক্ষে—বিশেষ করে বিষয় ভাবনা অনুযায়ী—ছবি টাঙানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন ভূগোল-বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ম্যাপ, চার্ট এবং বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের ছবি টাঙানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য শ্রেণী কক্ষের দেওয়ালে টাঙাতে হবে কবি, সাহিত্যিক, দেশপ্রেমিক এবং আবিষ্কারকদের তৈলচিত্র। প্রতিটি শ্রেণী কক্ষের প্রবেশ পথের দরজার মাথার উপরের দেওয়ালে, অথবা ফলকের উপর শ্রেণীপরিচিতি লিখে দেওয়ালে এঁটে দিতে হবে। ছবি, চার্ট, লিখন-ফলক ইত্যাদি যা 'তা' করে টাঙিয়ে কোন রকমে দায় সারা করলে চলবে না। বেশ পরিপাটি করে ছবিগুলো টাঙাতে হবে। নির্ভর করতে হবে রুচি ও মাত্রা জ্ঞানের উপর। চিত্রগুলি নির্বাচনের সময় দেওয়ালের রঙ, আকার, ও

আয়তনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কেননা, একই বিষয়, রঙ এবং আকারের ছোট বড় ছবিগুলি এক সঙ্গে দেওয়ালে টাঙালে কেমন বিসদৃশ্য মনে হয়। চিত্র সন্নিবেশ করার সময় এই কথাটাই মনে রাখতে হবে। যে কোন ছবি টাঙানোর সময় চিত্রখানির সঙ্গে ফ্রেমের সামঞ্জস্য ও সমতা আছে কিনা, তা দেখে নিতে হ'বে। ছবি সোজা করে টাঙানো উচিত। বাঁকা করে টাঙালে, ছবির দড়ি বার হয়ে থাকতে পারে। সেটা দেখতে বড়ই বে-মানান লাগে। তাছাড়া মাকড়শার জাল ও ধূলো জমে ঘর নোংরা হতে পারে।

**মেঝে অলংকরণ:** আল্পনার সাহায্যেও প্রয়োজন মত কাঁচা ও পাকা দু'রকম মেঝেরই সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। শুধু মেঝেতেই নয়, দরজা ও জানালার চৌকাঠের চারদিকের দেওয়ালেও আলপনা দ্বারা অলংকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

**পরিশিষ্ট:** বিদ্যালয় গৃহ অলংকরণের বিষয় বিশদ আলোচনা করা হ'লো। আলোচ্য বিষয়টি বিদ্যালয় প্রকল্পের অন্তর্গত, তথাপি ছাত্রদের বিষয় জ্ঞানকে স্পষ্ট ও কর্মোদ্যমকে জাগ্রত করার জন্য নানা দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সূত্র ধরে বিদ্যালয় গৃহ অলংকরণের একটি প্রবন্ধ রচনা করতে হবে। এই প্রকল্প রূপায়ণে বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর থাকবে সক্রিয় ভূমিকা। কার্পেট ও পর্দা দিয়ে কি ভাবে পাঠাগার ও প্রধান শিক্ষিকার কক্ষ সুসজ্জিত করা যায়, সেই প্রকল্পের দায়িত্ব ভার নিতে হবে ছাত্রীদের। বিষয়টি কার্যকরী হ'লে, তবেই এ অধ্যায় অধ্যয়ন সার্থক হবে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

# বিজ্ঞানের বিকল্প যন্ত্রপাতি ও শিক্ষোপকরণ

### Improsiving scientific instruments and apparatus

বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশে তার জয় জয়কার। সেই সঙ্গে প্রযুক্তি বিদ্যা বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাকে এক অভাবনীয় সাফল্যের জগতে পৌঁছে দিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ চাঁদের মাটি স্পর্শ করে এসেছে দু' দু'বার। সেই যুগে আমাদের দেশের ছাত্ররা বিজ্ঞানের শ্রেণীতে নিস্ক্রীয় শ্রোতার ভূমিকা নেবে, তা' হ'তে পারে না। তাদেরও হাতেকলমে কিছু করতে হ'বে। তা' সে উদ্যম যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তার মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ উদ্দীপনা আছে। সেই আনন্দের প্রসাদ এদেশের ছাত্ররাও পেতে পারে। কিভাবে তা' সম্ভব, সেই পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে

একটু আলোচনা করাহ’ চ্ছে। এই সব বিষয় ভাবনা নিয়ে ছাত্রদের হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।

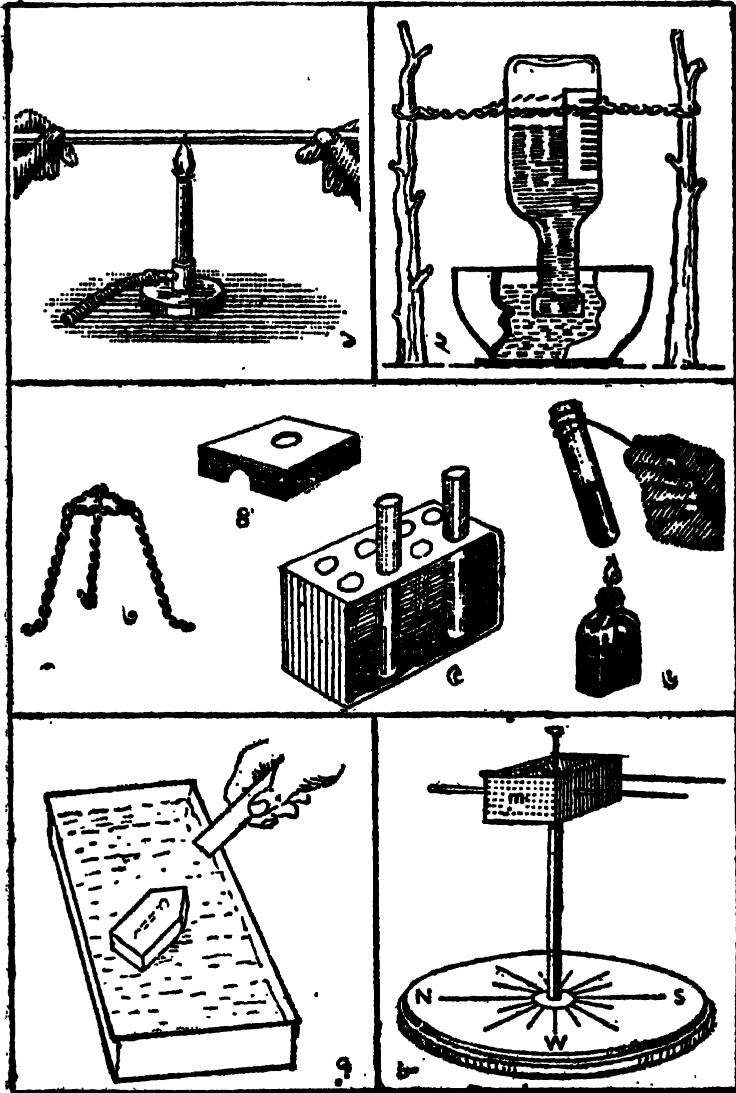
**ভাসমান বস্তুর ওজন পরীক্ষা:** কাঠ জলে ভাসে, কিন্তু লোহা ভাসে না! এর পিছনে রয়েছে সামান্য একটি কার্যকারণ। সেই সূত্র ধরে একদা গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস আবিষ্কার করেন আপেক্ষিক গুরুত্বতত্ত্ব। এসো সেই তত্ত্ব পরীক্ষার কাজে হাত লাগানো থাক।

উপকরণ হিসাবে যোগাড় কর একটি কাঠের টুকরা, একটি নির্গমন নলযুক্ত কাঁচের পাত্র আর একটি কাচের ছোট বীকার। এবার নির্গমন নলযুক্ত বড় কাচের পাত্রে নির্গমন নলের গোড়া অবধি জল ভর্তি কর। এমনভাবে ভর্তি কর যেন জলের তল নির্গমন-নলের মুখ বরাবর থাকে। একটু বেশী জল ঢালা হলে নল দিয়ে অতিরিক্ত জল বার হয়ে যাবে। এবার একটি ওজন করা খালি কাচের বীকার ঐ নলের নিচে রাখ যাতে নল দিয়ে জল পড়লে সে জল ঐ বীকারে জমা হ’তে পারে। এখন আস্তে আস্তে কাঠের টুকরাটিকে কাচের পাত্রের জলে ভাসিয়ে দাও। খানিকটা জল নির্গমন নল বেয়ে বীকারে পড়বে। যখন জল পড়া বন্ধ হবে, তখন জল সহ বীকারটি ওজন কর। এবার জলের ওজন পাওয়া যাবে। এখন দেখ, যে, ঐ জলের ওজন কাঠের টুকরার ওজনের সমান হয়েছে। সুতরাং ভাসমান অবস্থায় কাঠের টুকরো যে পরিমাণ জল অপসারণ করেছে, তার ওজন ঐ টুকরার ওজনের সমান।

**হস্ত-নির্মিত ব্যারোমিটার:** সরুগলা বিশিষ্ট একটি বোতল সংগ্রহ কর। পাত্রটিতে খানিকটা জল ঢেলে ঐ গামলার মত পাত্রে বোতলটিকে উলটে এমন করে ডোবাও যাতে বোতলটির গলার নিম্নাংশটা ডুবে থাকে। ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে, সেই ভাবে বোতলটিকে আটকে রাখ। যদি বাইরের বাতাসের সাঁচাবস্থা (humidity) বাড়ে, তখন বাতাসও অপেক্ষাকৃত হালকা হবে; এবং বোতলের জলসীমাও নিম্নগামী হবে। আর যদি বাইরের বাতাস শুষ্ক হয়, তখনও ভারী হবে। তখন বোতলের জল-তল (level) ঊর্ধ্বগামী হবে। এইভাবে বাইরের বাতাসের চাপের হ্রাসবৃদ্ধি মাপা যাবে বোতলের গায়ে আঁটা পরিমাপ চিহ্ন দেখে। (২নং চিত্র)

**জাদু নৌকা:** উপকরণ একটি প্লাষ্টিকের ট্রে, একটি চ্যাপ্টা কাঠের ছোট টুকরা অথবা কর্ক। এবার একটি পেরেককে চুম্বকিত করে ঐ কর্ক বা নরম কাষ্ঠ খণ্ডের ভিতরে তল বরাবর অনুপ্রবেশ করিয়ে দাও। এবার ঐ প্লাষ্টিকের ট্রেটিতে জল ঢেলে ঐকাঠের বা কর্কের নৌকাটি ভাসিয়ে দাও। পেরেকের মাথাটি অবশ্যই থাকবে উত্তর দিক বরাবর। এবার ঘোড়ার ক্ষুরাকৃতি চুম্বকের দক্ষিণ মেরুটা ঐ নৌকাটার উত্তর মেরুর কাছাকাছি আন। দেখবে চুম্বকের টানে নৌকাটা তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। ব্যাপারটা দস্তুর মত উপভোগ্য। কাজে আরওএকটু মজা কর। তোমার হাতে যে চুম্বকের হাল রয়েছে, সেটা ট্রেটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত বরাবর ঘোরাও, দেখবে তোমার

কাঠের নৌকা অনুগত ভৃত্যের মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে ঐ জলাশয়ের এক উপকূল থেকে অন্য উপকূলে। ( ৭নং চিত্র )




**কম্পাস যন্ত্র নির্মাণ :** নিচের কম্পাস কার্ডের মত একটি কম্পাস কার্ড তৈরী

করে নাও। একটি কাঠের অপেক্ষাকৃত মোটা চাকতির উপর বসিয়ে নাও। অতঃপর দুটি বড় সূচকে চম্বকিত কর। এবার দেশলাই বাক্সের পাশ থেকে এমনভাবে সূচ দুটিকে অনুপ্রবেশ করিয়ে দাও যে তার উত্তর মেরু যেন উত্তর দিকেই থাকে। এবার দেশলাই বাক্সটাকে কম্পাস কার্ডের মাঝখানে বসিয়ে দাও বোর্ড পিনের সাহায্যে। বিডটা ঢাকা পড়ে যাবে। কাষ্ঠখণ্ড ও পিন ওটাকে আটকে রাখবে। এখন এটাকেই বিকল্প কম্পাসরূপে ব্যবহার্য করা যাবে। (৮নং চিত্র)

**উপকরণ**—একটি বোতল, বেকিং সোডা, ভিনিগার, জল, টিস্যুপেপার, একটি মাথা ফুটো করা কর্ক, কাচ ও রবারের নল প্রভৃতি। এর সাহায্যে কিভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। প্রথমে বাইরের একটি পাত্রে জলের সঙ্গে সম পরিমাণ ভিনিগার মিশিয়ে নিতে হবে। এবার বোতলের অর্ধাংশ ঐ মিশ্রিত তরল পদার্থটা বোতলে ঢেলে নিতে হবে। ঐ নল সম্বলিত ছিপিটি দিয়ে এবার বোতলটির মুখটি বন্ধ করতে হবে। টিস্যু কাগজের প্যাকেটে বেকিং সোডাটা মুড়িয়ে নিতে হবে। এবার ঐ মোড়কটি বোতলটার মধ্যে ফেলে দিতে হবে। এবার তাড়াতাড়ি ছিপি দিয়ে বোতলটা বন্ধ করতে হবে তারপর যখন ভিতরে বুদবুদি উঠতে শুরু করবে, তখন রবারের নল দিয়ে বর্ণ হীন। কারবন ডাইঅক্সাইড ধোঁয়া বার হয়ে আসবে। এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক, পরীক্ষার ফলাফল পুস্তকে বর্ণিত গ্যাসের উপাদানের সঙ্গে মেলে কিনা।

**আরও সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করণ :**

এখানে রসায়ন বিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান পরীক্ষার উপযোগী কতকগুলো গৃহ নির্মিত বৈজ্ঞানিক উপকরণের বিবরণ দেওয়া গেল। ইচ্ছে করলে এগুলো তোমরাও বানিয়ে নিতে পারো। এই কাজের মধ্যে দিয়ে শুধু অবসর বিনোদনই হবে না, অপার আনন্দ লাভ করবে। তাছাড়া জিনিসগুলি তৈরি করতে সময় বা খরচ বেশী লাগবে না। কারণ, এর অনেক উপাদান ও সরঞ্জাম পাওয়া যাবে হয় তোমাদের রান্না ঘরে, অথবা ঘরে মজুত ওষুধপত্রের মধ্যে। এগুলো তৈরী হয়ে গেলে, বিজ্ঞান বই-এর অনেক কিছু নিয়েই হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারবে। তখন তোমরা বিজ্ঞানের ভিতরকার সেই রহস্য বিস্ময়কে আবিষ্কার করতে পারবে। তবে যার প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকারক নয়, এমন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তোমরা হাত লাগাতে পার।

এই বর্ণিত যন্ত্রপাতির অধিকাংশই সামান্য পয়সায় বিনিময়েই বাজার থেকে কেনা যাবে, আর বাকীগুলো ঘরেই পাওয়া যাবে। যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদির তালিকাটি নিচে দেওয়া গেল :—(১) টেস্টটিউব, (২) টেস্টটিউব হোল্ডার। দ্বিতীয়টি তোমরাই তার বেঁকিয়ে যেমন ৩নং চিত্রে দেখানো হয়েছে, সেই ভাবে করে নিতে পারবে।

৩। **টেস্ট টিউব র‍্যাক**।—একটি পুরাতন জুতার বাক্সের গায়ে গোলাকার কতক-ছিদ্র করে নাও, (যে ভাবে ছবিতে দেখানো হয়েছে সেই ভাবে ৫নং ফুটো গুলো করে নিতে হবে)। (৪) কয়েকটি কাঁচের জার (৫) কয়েকটি কাচের বোতল (৬) গোটা৷

পাঁচেক কাচের নল, (৭) রবারের নল কয়েকটি, (৮) ফ্যানেল (৯) কয়েকটি মোমবাতি; (১০) স্পিরিট ল্যাম্প। সুলেখা কালির ছোট দোয়াতের উপরকার ঢাকনি ছিদ্র করে, সলতা লাগিয়ে নিলেই একটা প্রদীপ তৈরি হয়ে যাবে। (১১) একটি তেপায়া দণ্ডাধার (Tripod) এটাও তোমরা তার দিয়ে করে দিতে পারো (২নং ছবি দেখ)। (১২) একটি বি-হাইভ সেল্ফ (beehive shelf)। একটি টিনের ঢাকনা দিয়েই এটা তৈরি করা যাবে। (১৩) কাচের পিচকারি (glass jet), (১৪) কয়েকটি বাঁকা নল। একটি লম্বা কাচের নল নিয়ে আগুনের তাপ দিয়ে কি ভাবে বাঁকাতে হবে তা' (১নং ছবিতে দেখে) ছবি দেখে বেঁকিয়ে নাও। গরম কাচের নলটা নরম থাকতে থাকতে, প্রয়োজন মত বেঁকিয়ে নিতে হবে।

## *শিক্ষণ বিষয়ক প্রকল্প*

### কীট-পতঙ্গ উপকথা

**ভূমিকা:** আমাদের নিত্যদিনে-অজস্র সহচর কীট-পতঙ্গ রয়েছে। তাদের সঙ্গে মানুষের কত কালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাদের বিচিত্র জীবন, বিভিন্ন গতি প্রকৃতি, কত রহস্যময় উপকথার মত তাদের জীবন-কাহিনী। তাদের অনেকই আমাদের বন্ধু। কেউ কেউ হয় তো বা পরোক্ষভাবে আমাদের অপকার করে থাকে। অথচ তাদের কথা আমরা কতটুকুই বা জানি। এখানে কীট-পতঙ্গের সেই সব জীবনের অধ্যায়গুলি তুলে ধরা গেল।

এই পরিবেশিত তথ্যকে অবলম্বন করে তোমরা ইচ্ছে করলে নিম্নলিখিত যে কোন এক বা একাধিক প্রকল্প কাজে হাত দিতে পার। যেমন—(১) **কীট-পতঙ্গ উপকথা** শীর্ষক একটি চার্ট তৈরি করতে পারো (আর্ট পেপারে চাইনীজ কালি দিয়ে এঁকে) (২) পেপার কাটিং এর সাহায্যে—(যেমন কালো মার্বেল পেপার কিনে এনে তার উল্টো পিঠে ট্রেস করে কীট-পতঙ্গের ছবিগুলি এঁকে নিয়ে ব্লেড দিয়ে প্রথমে সাবধানে আউট লাইনটা কেটে নিতে হবে; তারপর বডি লাইনের রেখাগুলো খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবে কেটে নিলেই দিব্যি কীট-পতঙ্গের অবয়বের আসলটা পাওয়া যাবে। তখন সেই উল্টো পিঠে আঠা লাগিয়ে বড় কার্টিজ পেপারের চার দিকে কালো কালির বর্ডার দিয়ে একটা একটা করে কীট-প্রতঙ্গের ছবিগুলোকে বেশ সুবিন্যস্ত করে বসালেই একটি দিব্যি পতঙ্গের চার্ট হয়ে যাবে। এই দুটোর যে কোন একটা প্রকল্প তোমরা গ্রহণ করতে পার।

জীব বিজ্ঞানীগণ সমস্ত প্রাণীজগৎকে মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন, **অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী**। যে সমস্ত প্রাণীর শরীরে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া নেই তাদের

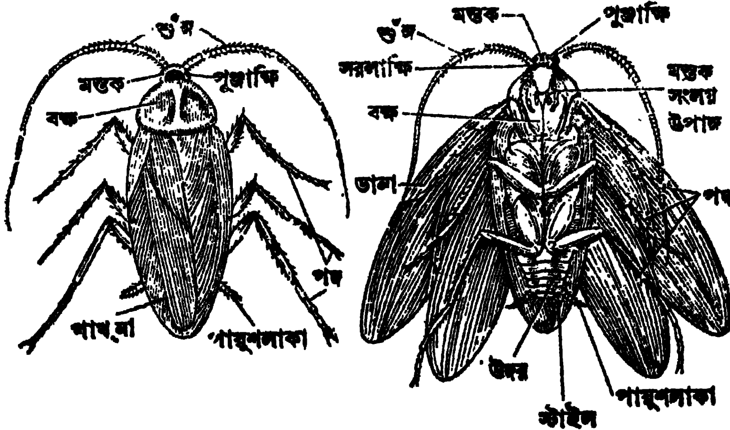
অমেরুদণ্ডী এবং যে সমস্ত প্রাণীর শরীরে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে তাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। পতঙ্গ বলে আমরা যাদের জানি তারা সকলেই অমেরুদণ্ডী প্রাণীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মেরুদণ্ডী প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে পাখীর যে স্থান, আমেরুদণ্ডী প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে পতঙ্গ সেই স্থান অধিকার করে। উভয়শ্রেণীর অন্তর্গত বিশিষ্ট প্রাণীসমূহের পাখা আছে এবং তারা উড়তে পারে। তাদের শরীরে উন্নত ধরণের শ্বাস-তন্ত্র, নার্ভতন্ত্র ও স্পর্শেন্দ্রিয় বর্তমান আছে। উভয় শ্রেণীর প্রাণীদের গায়ের রঙ বেশ উজ্জ্বল এবং উহারা কর্মঠ হয়।

**পতঙ্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ** এদের দেহ কতকগুলি খণ্ডাংশ দ্বারা গঠিত হয়। পাগুলি গাঁইটযুক্ত এবং দেহ একটি কঠিন খোলা বা কৃত্তিকাবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। পতঙ্গের অধিকাংশের দেহে পাখা আছে। এরা স্থলচর এবং বায়ুতে উড়িয়া বেড়ায়—এরা কদাচিৎ জলে বাস করে। এদের দেহে **মাথা, বুক** ও **পেট** এই তিনটি সুস্পষ্ট অংশ দেখতে পাওয়া যায়।

## আরশোলা

এদের দেহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—মাথা, বুক ও পেট। একটি ক্ষুদ্র ঘাড়ের দ্বারা মাথাটি বুকের সঙ্গে সংযুক্ত আছে।

এদের মাথা দেহের সম্মুখভাগে একটু খাড়াভাবে সংযুক্ত। মাথা ত্রিকোণাকার এবং সামনের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। মাথার উপরিভাগে দুপাশে কালো **পুঞ্জাক্ষি** আছে। পুঞ্জাক্ষি এদের চক্ষু। এর সাহায্যে আরশোলা দেখতে পায়। সাধারণ




চক্ষুর সঙ্গে পুঞ্জাক্ষির গঠনের একটু পার্থক্য আছে। অনেকগুলি সাধারণ চক্ষু (সরলাক্ষি) একত্রিত হয়ে একটা পুরা পুঞ্জাক্ষি গঠিত হয়। আরশোলার দুটি পুঞ্জাক্ষির মাঝে

মাথার মধ্যভাগে এক জোড়া সাদা গোলাকার সরলাক্ষিও বর্তমান আছে। সরলাক্ষির সামনে ও পুঞ্জাক্ষির একটু ভিতরের দিকে দুপাশে দুটি লম্বা বহু গ্রন্থিযুক্ত শুঙ্গ আছে। উহাদের **অ্যানটেনা** বলে। এর সাহায্যে আরশোলা স্পর্শের অনুভূতি লাভ করে। মাথার অগ্রভাগের অঙ্কদেশে এদের মুখ আছে। এতে দুটো চোয়াল ও উপরে উপরোষ্ঠ ও নীচে অধরোষ্ঠ থাকে। আরশোলার মাথায় সর্বসমেত চারি জোড়া উপাঙ্গ আছে; তাদের **শির-উপাঙ্গ** বলে।

মাথা ও বুকের মাঝখানে যে ছোট ঘাড় আছে তার সাহায্যে আরশোলা মাথাটিকে এদিক-ওদিক ঘুরাতে পারে।

আরশোলার বুক অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎ এই তিনটি দেহখণ্ডাংশ দ্বারা গঠিত। বুকের প্রতিটি দেহখণ্ডের পৃথক আবরণ আছে। বুকের মধ্যে ও পশ্চাৎ অংশে যথাক্রমে এক জোড়া করিয়া মোট দু জোড়া ডানা আছে। ডানা-জোড়া দুটি একটির উপর আর একটি সাজানো থাকে। এদের ডানায় কোন পালক নাই। বুকের প্রতি দেহখণ্ডে এক জোড়া করিয়া মোট তিন জোড়া পা আছে। প্রতিটি গাঁইটযুক্ত এবং তাতে পাঁচটি অংশ আছে। তৃতীয় জোড়া পা আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

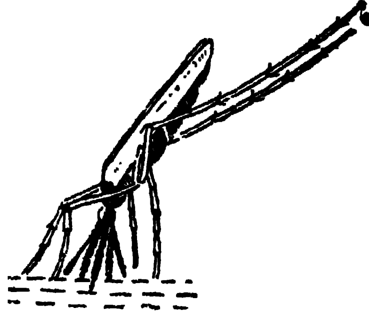
বুকের পশ্চাতেই পেট। মাথা ও বুক অপেক্ষা পেটের অংশ অপেক্ষাকৃত চওড়া এবং **দশটি দেহখণ্ড** নিয়ে গঠিত। পুরুষ আরশোলার নবম দেহখণ্ডের নীচে দুইধারে দুইটি কূর্চ ( স্টাইল ) আছে। পুরুষ বা স্ত্রী উভয় আরশোলার দশম দেহখণ্ডের নীচে বহু গ্রন্থিযুক্ত এক জোড়া পায়ুশলাকা আছে; ইহার নিকটেই পায়ু অবস্থিত। বুক ও পেটে শ্বাসকার্যের জন্য দশজোড়া **শ্বাসছিদ্র** আছে।

আরশোলা দিনের বেলায় সুবিধা মত জায়গায় লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রিবেলায় খাদ্যের অন্বেষণে বের হয়। এরা সর্বভুক প্রাণী। জন্মের পর আরশোলার গায়েররঙ থাকে সাদা; পরে উহা গাঢ় বাদামী বর্ণের হয়।

## মশা

এনোফিলিস ও কিউলেক্স এই দু'প্রকারের মশা সাধারণত দেখা যায়। এনোফিলিস ম্যালেরিয়া এবং কিউলেক্স ফাইলেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে। মশা সাধারণত রাত্রিকালে বের হয় এবং অন্ধকার স্থানে বাস করে। এদের দেহের তিনটে অংশ—মস্তক, বুক ও উদর। এদের মাথা গোলাকার এবং মাথায় পাঁচটা শুঁড় আছে। মাঝেরটাকে বলে প্রবোসিস। এটা নলের মত। স্ত্রী মশার এই নল ধারাল বলে তারা মানুষের রক্তপান করতে পারে। পুরুষ মশার শোষক নল ভোঁতা বলে রক্তপান করতে পারে না। প্রবোসিসের দুপাশে দুটো লোমযুক্ত শুঙ্গ আছে। এই শুঙ্গের দু-পাশে একটা করে আর এক জোড়া লোমহীন শুঙ্গ আছে। মাথার দুপাশে দুটো **পুঞ্জাক্ষি** আছে।

এদের বুক তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডে এক জোড়া করে মোট তিন জোড়া পা আছে। পাগুলো দেহের তুলনায় খুব লম্বা এবং প্রতিটি পা গাঁইটযুক্ত। এরূপ পা'কে সন্ধিপদ বলে। মধ্যবর্তী খণ্ডের দুপাশ থেকে দুটো পাতলা ডানা বের হয়।



ওই ডানার সাহায্যে মশা উড়তে পারে; উড়বার সময় পাখার কম্পনের জন্য একপ্রকার ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়।

এদের পেট দশটি খণ্ডে বিভক্ত। দেহের তুলনায় বেশ লম্বা এবং পিছনের দিক ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। শ্বাসকার্যের জন্য মশার বুক ও পেটের দুপাশে কতকগুলো ছিদ্র আছে। এগুলোকে শ্বাসছিদ্র বলে।

আরশোলা ও মশার ন্যায় মাছি, পঙ্গপাল, গান্ধীপোকা প্রভৃতিও পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী। এরা সকলেই কোন না কোন ভাবে মানুষের অপকার করে থাকে। কিন্তু কতকগুলি পতঙ্গ আবার মানুষের অনেক উপকার করে থাকে। যেমন মথ—এদের গুটি থেকে রেশম পাওয়া যায়। মৌমাছিদের নিকট থেকে মানুষ মধু ও মোম পেয়ে থাকে। তবে উপকারী পতঙ্গের চেয়ে অপকারী পতঙ্গের সংখ্যাই বেশী।

## কেঁচো

কেঁচো অমেরুদণ্ডী আনেলিডা পর্বভুক্ত উভলিঙ্গ প্রাণী। এদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই।



কেঁচোর দেহ প্রায় ১৬ থেকে ২০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং সরু দড়ির মতো গোল। দেহের আবরণ পুরু ও স্বচ্ছ। দেহের পাতলা চামড়ার ভেতর দিয়ে এরা নিশ্বাস-

প্রশ্বাসের কাজ চলায়। সমস্ত শরীর ১০০ থেকে ১২০টা আংটির মতো অংশগুলো পর পর সাজানো। দেহের সামনের দিকে একটা ছোট ছিদ্র হচ্ছে এদের মুখ; আর পেছনের দিকে যে ছিদ্র আছে তা হচ্ছে এদের পায়ু।

কেঁচো মাটির তলায় গর্ত খুঁড়ে বাস করে। দিনের আলো এরা সহ্য করতে পারে না তাই রাতে খাবারের খোঁজে বের হয়। গাছের পচা পাতা বা মাটির সঙ্গে মেশানো খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। নিম্ন শ্রেণীর যে সব প্রাণী আছে তার মধ্যে এদের শরীরে প্রথম রক্ত দেখা যায়।

মাঠে, ভিজে জমিতে তোমরা যে কেঁচোর ঢিপি দেখে থাক তা হচ্ছে ওদের মল।

কেঁচো মাটিতে সুড়ঙ্গ কেটে চলে। এর ফলে মাটি আলগা হয়। মাটি আলগা হওয়ার ফলে জমিতে বাতাস ও জল যাওয়ার সুবিধে হয়। এতে গাছের মূল সহজে বেড়ে উঠে। এছাড়া নিচের মাটি ওপরে এনে মাটির উর্বরতা বাড়িয়ে দেয়। এভাবে জমি উর্বর করে বলে কেঁচোকে চাষীর পরম বন্ধু বলে।

## পিঁপড়ে

ছোট বড় নানা আকারের এবং রঙের পিঁপড়ে দেখা যায়। প্রত্যেক দলে একটি রানী বা স্ত্রী, অনেকগুলি শ্রমিক এবং কয়েকটি পুরুষ পিঁপড়ে থাকে। এরা সাধারণত মাটির ভিতরে গর্তে বাস করে। পিঁপড়ের দেহের তিনটে অংশ—মস্তক, বুক ও পেট। পুরুষ ও রানী পিঁপড়ের বুকের অংশে উপরের দিকে দুই জোড়া পাতলা ডানা থাকে। শ্রমিক পিঁপড়ের ডানা থাকে না। নিচের দিকে বুকের অংশে সকলেরই তিন জোড়া যুক্তপদ থাকে। রানী পিঁপড়ে আকারে বড়, পুরুষ পিঁপড়ে মাঝারি আকারের এবং শ্রমিক সবচেয়ে ছোট। শ্রমিক পিঁপড়েই দলের সব কাজ করে। রানী কেবল ডিম পাড়ে, পুরুষ কিছুই করে না। পিঁপড়ে নিজের দেহের ওজন অপেক্ষা বহুগুণ ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে পারে। পিঁপড়ের ডিম সাদা। ডিম ফুটে কৃমির মত যে বাচ্চা হয় তাকে শুক বলে। কিছুদিন পরে শুকের দেহের চারদিকে একটা আবরণ হয়। তখন তাকে পিউপা বলে। পিউপা থেকে পরিণত পিঁপড়ে বের হয়।

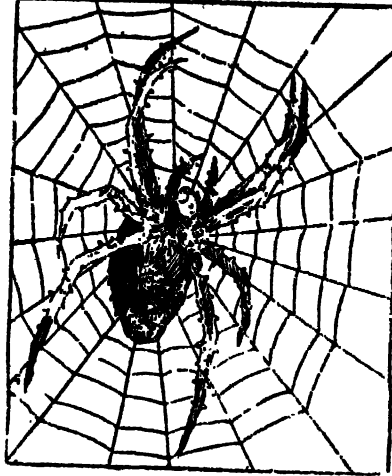
## মাকড়সা

মাকড়সার শরীরকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন মাথা ও পেট। বুক মাথার সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে। মাথার ওপরে চারজোড়া চোখ (কোন কোন জাতের তিন জোড়া) আছে। এদের পা চারজোড়া। এদের শুঁড় নেই। মুখের দুধারে দুটো বড় এবং দুটো ছোট দাড়া আছে। এই দাড়ার সাহায্যে এরা যেসব পোকামাকড় ধরে তাদের গায়ে বিষ ঢেলে দেয়।

এদের পেটের নিচে একটা বিশেষ অংশ থেকে রস বের করে তা দিয়ে খুব সরু সুতো কেটে জাল বোনে। শিকার ধরার জন্য ঐ জালের একপাশে ওরা লুকিয়ে থাকে। মশা,

মাছি বা যে কোন পোকা ঐ জালের মধ্যে পড়লে তাকে মেরে তার গায়ের রস শুষে খায়।

স্ত্রী-মাকড়সা একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। ডিম পাড়বার আগে শরীর থেকে



সুতো বার করে একটা থলি তৈরি করে তার মধ্যে ডিম পেড়ে রাখে। স্ত্রী-মাকড়সা ঐ থলি নিয়ে বেড়ায় আবার কোন কোন সময় জালের মধ্যে থলিটাকে ঝুলিয়ে রাখে। ডিম থেকে যে বাচ্চা হয় তা দেখতে ছোট আকারের মাকড়সার মত।

## প্রজাপতি

সমস্ত কীট-পতঙ্গের মধ্যে প্রজাপতিকে দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। নানা রঙের ও



নানা আকারের প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। মাথা, বুক আর পেট এই তিনটি

অংশ আছে। এর মাথায় দুটো চোখ ও দুটো শুঁড়, বুকের কাছে তিন জোড়া পা এবং পিঠে দু জোড়া ডানা আছে। মুখে একটা সরু গোটানো নল আছে। ফুলের ওপর যখন মধু খেতে বসে তখন পাক খুলে ঐ নলটা সোজা করে ফুলের মধ্যে ঢুকিয়ে মধু শুষে নেয়।

প্রজাপতির জন্ম এক অদ্ভুত ভাবে হয়। গাছের পাতায় স্ত্রী-প্রজাপতি একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। কিছুদিন পরে ঐ ডিম থেকে শুঁয়োপোকার জন্ম হয়। শুঁয়োপোকা গাছের কচিপাতা খেয়ে বড় হয়। এদের গায়ে শুঁয়ো থাকে বলে শুঁয়োপোকা বলে। শুঁয়োপোকা কিছুদিন পরে একরকম গুটি তৈরি করে তার ভেতর বাস করে। এরপর এই গুটি বা খোলস কেটে প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে আসে। এভাবে প্রজাপতির জন্ম হয়।

## প্রাত্যহিক কাজে জলের প্রয়োজনীয়তা

**ভূমিকা:** জলের আর এক নাম জীবন। প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিমুহূর্তেই তোমরা যে জল ব্যবহার করো, সেই জলের কি কি, সেখান থেকে কিভাবে সেই জল পাওয়া যায়, সেগুলি দেখানোর জন্য তোমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে পার। ভোগল শ্রেণীর এক কোণে যেখানে প্রকৃতি কোণ আছে, সেখানে সিমেন্ট দিয়ে পাহাড় নদী খালবিল, পুকুর, কূয়া ইন্দারা প্রভৃতি বানাতে পারো। সেই করণীয় কাজের তথ্যাদি পরিবেশিত হলো।

এই পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ জুড়ে জলের পরিধি বিস্তৃত। জল স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণহীন পদার্থ। মানুষ স্থলে বাস করে বটে, কিন্তু যেখানে জলের সন্ধান নাই, সেখানে মানুষ বাস করে না। আমাদের দেহাভ্যন্তরের বেশির ভাগই জল। জল ঠিক খাদ্য-পদার্থ নহে, কিন্তু জীবন-ধারণের জন্য আমাদের রোজ প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হয়। জলের উৎস দুটি (১) প্রাকৃতিক (২) কৃত্রিম। স্বাভাবিকভাবে আমরা যে জল পাই অর্থাৎ বৃষ্টির জল, নদীর জল, সমুদ্রের জল ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎস, আর কূপের জল, নলকূপের জল, পুকুরের জল ইত্যাদি কৃত্রিম উৎস। জলের প্রধান উৎস সমুদ্র। সূর্যকিরণে ঐ সমস্ত জলের কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠে যায় এবং ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে এই বাষ্প মেঘে পরিণত হয়ে আবার জলের আকারে পৃথিবীতে নেমে আসে। সমুদ্রের জল লবণাক্ত। সেজন্য এই জল পানের অযোগ্য। নদীর জলও পানের অযোগ্য। কারণ উৎপত্তিস্থল থেকে নদী মোহনার দিকে আসার সময় নানাকারণে নদীর জল দূষিত হয়। সেইজন্য নদীর জল পানীয় হিসাবে গ্রহণ করার আগে তাকে বিশুদ্ধ করে নিয়ে খেতে হবে। ঝরণা বা প্রস্রবণের জল মাটির তলা দিয়া আসে বলে এই জলে অনেক ধাতব পদার্থ মিশে থাকে। ঐ ধাতব পদার্থগুলো আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ঝরণা বা প্রস্রবণের জল বিশুদ্ধ না

করে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। পুকুরের জলও দূষিত জল। কারণ পুকুরের জলে সাধারণত লোকে স্নান করে, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, শৌচ কার্যাদি করা, গরু, মহিষ ইত্যাদি স্নান করান হয়। শেওলা, কচুরীপানা, লতাপাতা ইত্যাদিতে পুকুরের জল দূষিত হয়। সেইজন্য সব পুকুরের জল বিশুদ্ধ নয়। তবে যে সমস্ত সংরক্ষিত পুকুর, দীঘি ইত্যাদি আছে তাহাদের জল পান করা চলে। সংরক্ষিত পুকুরের জলে নামা, বাসন মাজা, স্নান করা, কাপড় কাচা, গরু মহিষদের স্নান করা প্রভৃতি চলে না। এই সমস্ত সংরক্ষিত পুকুরের পাড় সাধারণত খুব উঁচু, স্বাস্থ্যকর খোলা জায়গায় অবস্থিত এবং যাতায়াতের একটি মাত্র পথ ছাড়া বাকি সব জায়গা ঘেরা থাকে। একটা উঁচু জায়গা থেকে দড়ি অথবা কপিকলের দ্বারা বালতি দিয়া জল তোলা হয়।

অগভীর কূপের জল ( ১৮।২০ মিটার গভীর ) নানাভাবে দূষিত হয় বলে তা পানীয় জল হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে গভীর কূপের ( ৩৫।৪০ মিটার গভীর ) জল পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা চলে।

বর্তমানে পল্লীগ্রামে বা শহরে বহু নলকূপ দেখা যায়। পাম্পের সাহায্যে নলকূপের জল নিচ হইতে উপরে তোলা হয়। এই নলকূপের জলে উপর থেকে ধুলো, বালি বা ময়লা পড়ে না বলে এই জল বিশুদ্ধ। গভীর নলকূপের জলই সর্বাপেক্ষা ভাল। সেইজন্য শহর ও পল্লীগ্রামে সর্বত্রই পানীয় জল হিসাবে নলকূপের জল ব্যবহার করা নিরাপদ। তবুও সম্ভব হলে নলকূপের পানীয় জল ফুটিয়ে খাওয়া ভাল।

কলকাতার মত বড় বড় শহরে কলের জলের ব্যবস্থা আছে। নদী বা কোন বৃহৎ জলাশয়ের জল কোন স্থানে সঞ্চিত করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তা পরিশ্রুত করে শহরের কোন উঁচু স্থানে পাম্পের সাহায্যে চৌবাচ্চায় ঐ জল তোলা হয়। ঐ স্থান থেকে পাইপের সাহায্যে শহরের বিভিন্ন অংশে বাড়ীতে বাড়ীতে, কলকরখানা ইত্যাদিতে ঐ জল সরবরাহ করা হয়।

জলের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনায় শেষ করা যায় না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যে সকল খাদ্য খাই জলই তা দ্রবীভূত করে আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। মল, মূত্র, ঘর্ম প্রভৃতির সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেহের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো বের হয়ে যাচ্ছে। দেহ শীতল রাখতে এবং শরীরে তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যও জলের দরকার। নিঃশ্বাসের সঙ্গে কিছু জলীয় অংশ বের হয়ে আসার ফলেই আমাদের নিঃশ্বাসের উত্তাপ কিছুটা কম হয়। তা না হলে নিঃশ্বাসের উষ্ণতার জন্য আমাদের অনেক কষ্ট হত। গ্রীষ্মের সময় আমরা বেশী পরিমাণ জল পান করি। এই জল শরীরের ভিতর গিয়ে শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে। আবার ঘামের আকারে বের হয়ে আমাদের গাত্রচর্মকে শীতল রাখতে সাহায্য করে। সর্বোপরি জল না হলে আমাদের দেহযন্ত্রের রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিত না। সেইজন্য

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সেইজন্যই জলের অপর নাম জীবন।

স্বাস্থ্য রক্ষা ছাড়া গৃহকার্যে ও অন্যান্য কার্যে জলের প্রয়োজনীয়তা আছে। স্নান করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর ধোয়া, শৌচকার্যাদি প্রভৃতির জন্য আমাদের প্রতিদিন প্রচুর জলের দরকার হয়। কোনস্থানে আগুন লাগলে সাধারণত জলের সাহায্যেই আগুন নেভান হয়। জল না হলে কৃষিকার্য হয় না। ঘরবাড়ী তৈয়ারী, যানবাহন চলাচল, কলকারখানা ইত্যাদিতেও প্রচুর জলের দরকার হয়, জল আছে বলিয়াই নদী, সমুদ্রে জাহাজ চলাচল করতে পারে। পল্লী অঞ্চলে অনেক পুষ্করিণী বা হ্রদ বা বড় বড় জলাশয় দেখা যায়। পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় গ্রামবাসীরা কত বিভিন্ন কাজে পুকুরের বা জলাশয়ের জল ব্যবহার করছে। কিভাবে পুকুরের জল দূষিত হচ্ছে তাও তোমরা দেখতে পাবে। ঐ দূষিত জল পান করে আমাদের স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি হচ্ছে তাও বুঝতে পারবে এবং আরও বুঝতে পারবে জল-বাহিত সংক্রামক ব্যাধি কিভাবে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে ঐ সমস্ত জায়গা পর্যবেক্ষণ করে যাতে পুকুরের জল দূষিত না হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক গ্রামের সুরক্ষিত পুষ্করিণীর জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জেনে অন্যত্র এই সব ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। পুষ্করিণী যাতে নিয়মিত পরিষ্কার থাকে, জলজ উদ্ভিদে যাতে পুকুরের জল দূষিত না করতে পারে তার জন্য কিছুদিন অন্তর অন্তর তোমরা তা'র তদারকী করবে।

পুষ্করিণীর জলে নানা প্রকার প্রাণী বাস করে। মাছ ছাড়া ব্যাঙাচি, ব্যাঙ, জোঁক, মশা, মশার ডিম, শামুক, গুগ্‌লী ইত্যাদি দেখতে পাবে। এ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করলে এসব প্রাণীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নানারকম জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

## উদ্ভিদ জগৎ

যে উদ্ভিদ আমাদের এত উপকার করে তাকে জানা ও চেনা দরকার। কিন্তু কম করেও পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত আড়াই লক্ষ গাছের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আলাদা আলাদা ভাবে এই সমস্ত গাছের পরিচয় জানা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেজন্যে পণ্ডিতেরা যে কোন একটা উদ্ভিদের আকার, প্রকৃতি, জন্ম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণকে প্রতীক ধরে ঐ একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অন্য উদ্ভিদগুলোকে এক একটা শ্রেণীভুক্ত করেছেন। আমাদের পরিবেশের উদ্ভিদগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করে এদের এই শ্রেণীবিভাগ ভাল করে জেনে নিতে চেষ্টা কর।

(১) পুকুরে সরু সুতোর মত সবুজ রঙের একরকম শেওলা ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। এদের **স্পাইরোগাইরা** বলে। পুকুরঘাটের বাঁধানো সিঁড়ি জলমগ্ন অবস্থায় থাকলে তার ওপর যে সবুজ শেওলা জমতে দেখা যায় তাকে **কলফোরবা**

বলে। বর্ষাকালে পচা কাঠ বা বাঁশের গায়ে **ব্যাঙের ছাতা** জন্মাতে দেখা যায়। ভিজে জুতো, পুরনো চাটনি, পচা জিনিসের ওপর যে **ছাতা** জন্মায় এরা সবই এক জাতের। এই জাতের সব উদ্ভিদকেই **থ্যালোফাইটা বা সমাঙ্গীদেহীবর্গ** বলে। এই জাতের উদ্ভিদের **শিকড়, কাণ্ড ও পাতা থাকে না**।

(২) বর্ষাকালে পুরনো দেওয়ালের ওপর সবুজ কার্পেটের ন্যায় একরকমের উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। একে মস বলে এবং এই জাতের সব উদ্ভিদকেই বলে **ব্রায়োফাইটা** বা **মসবর্গ**। এদের **কাণ্ড ও পাতা আছে কিন্তু শিকড় নেই**।

(৩) তোমরা ঢেঁকি শাক, **শুশুনি** শাক নিশ্চয়ই দেখে থাকবে বা খেয়ে থাকবে। নদী বা পুকুরের কিনারায় ছায়াযুক্ত আর্দ্র স্থানেই এরা জন্মায়। অনেক সময় পাহাড়ের গায়ে অনাবৃত স্থানেও এই জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতের সব উদ্ভিদকেই বলা হয় **টেরিডোফাইটা** বা **ফার্নবার্গ**। এদের **শিকড়, কাণ্ড ও পাতা আছে**।

ওপরে উদ্ভিদ জগতের যে তিনটে অংশের কথা তোমরা জানতে পারলে তারা সকলেই **অপুষ্পক**—এদের কোন ফুল ও বীজ হয় না।

এরপর উদ্ভিদ জগতের যে অংশটা আমরা দেখতে পাই তাদের দেহ সুস্পষ্ট — শিকড়, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত থাকে। এদের ফুল ও ফল হয়। এদের বলা হয় সপুষ্পক উদ্ভিদ। আম, জাম, কাঁঠাল, অপরাজিতা প্রভৃতি এই জাতের। এই জাতের গাছকেই আমরা আমাদের আশেপাশে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই। বিজ্ঞানের ভাষায় এই জাতের গাছকে **বীজজ** গাছ বলে। কারণ এদের বীজ হয়। কীভাবে বীজ হয় তার উপর নির্ভর করে এই জাতের উদ্ভিদের আবার দুটো ভাগ আছে। যেমন পাইন, বিলিতি ঝাউ প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ এক রকম বিশিষ্ট পাতার ওপর অনাবৃত অবস্থায় জন্মে থাকে। সেজন্যে এদের **নগ্ন বীজ উদ্ভিদ** বলে। আবার এই জাতেরই আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি গাছের ফুল থেকে যে ফল হয় তার মধ্যে থাকে বীজ। সেজন্যে এদের বলা হয় **আবৃত বীজ উদ্ভিদ**।

## উদ্ভিদের আয়ুষ্কাল ও স্বভাব

লক্ষ্য করলে দেখবে যে এক এক রকমের উদ্ভিদের দৈহিক গঠন এক এক রকমের হ তাদের আয়ুষ্কাল ও জীবনধারাও আলাদা রকমের। যেমন ধান, পাট, সরষে প্রভৃতি উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি, প্রজনন এবং মৃত্যু একটা ঋতুর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এই রকম যে সমস্ত উদ্ভিদের আয়ুষ্কাল এক বছর বা তার কম তাদের **বর্ষজীবী উদ্ভিদ** বলে। এদের কাণ্ড কোমল ও রসাল হয়। এরা কখনই এক বছরের বেশি বাঁচে না।

মুলো, বাঁধাকপি, গাজর প্রভৃতি উদ্ভিদ দু'বছর কাল বেঁচে থাকতে পারে। এদের বলা হয় **দ্বিবর্ষজীবী** উদ্ভিদ। এদের কাণ্ডও কোমল ও রসাল হয়।

কলাগাছ, আদা, হলুদ প্রভৃতি উদ্ভিদ বহু বছর বাঁচে। এদের বায়বীয় অংশ

প্রতি বছর প্রতিকূল অবস্থায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু মাটির নিচের অংশ বেঁচে থাকে এবং অনুকূল অবস্থায় মাটির নিচের কাণ্ড থেকে বায়বীয় শাখা প্রশাখা বের হয়। এদের বলা হয় **বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ**। এই সমস্ত কোমল ও রসাল কাণ্ড-বিশিষ্ট উদ্ভিদকে বলা হয় **বীরুৎ** ( herbs )।

জবা, গন্ধরাজ, গোলাপ, তুলো ইত্যাদি গাছ পরীক্ষা করে দেখ, এদের কাণ্ডে কাঠের পরিমাণ খুবই সামান্য। কাণ্ডটি পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না। এদের প্রচুর শাখা প্রশাখা হয়। এই সমস্ত উদ্ভিদকে বলা হয় **গুল্ম** ( Shrub )।

শাল, সেগুন, মেহগনি, আম, জাম, বট প্রভৃতি গাছগুলো বেশ উঁচু। এদের



বলা হয় **বৃক্ষ** ( [illegible] )। বৃক্ষের আবার দুটো ভাগ আছে। যেমন,

শাল ইত্যাদি কতকগুলো গাছে সব পাতাই শীতকালে এক সঙ্গে ঝরে যায়। এদের বলে **পর্ণমোচী**।

সরল গাছ ( pine tree ), দেবদারু ইত্যাদি গাছের পাতা বছরের বিভিন্ন সময়ে

## শারীর শিক্ষা কি ও কেন ?

**ইতিহাস :** প্রশ্ন দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তর দেবার আগে শরীর চর্চার পূর্ব ইতিহাসকে জানতে হবে। শরীর চর্চার সূত্রপাত কবে, তার দিনক্ষণ জানা যায় নি। তবে বয়সের দিক থেকে যে সুপ্রাচীন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেটা খ্রীষ্ট জন্মেরও বেশ কয়েক হাজার বছর আগেই হবে।

তখনকার মানুষ জানতো 'সবার উপরে দেহই সত্য'। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে। অনেক দিন পর্যন্ত এই চেতনাই ছিল শিক্ষানুশীলনের অনেকখানি আসন জুড়ে। সভ্যতার ইতিহাসে তার নজির আছে। দেহীর কাছে শরীরটাই যথাসর্বস্ব—সেটাই ছিল স্পার্টান শিক্ষা নীতি। শরীরটা যে মনের বাহন, সেই মনকে বাদ দিয়ে দেহের কথা ভাবা যায় না। এ তথ্য এথেন্সবাসীরাই প্রথম প্রচার করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেহ মনের এই যে স্বীকৃতি, সেটাই হচ্ছে যুগান্তকারী চিন্তা-বিপ্লব—ঐতিহাসিক বিবর্তন।

শরীর পালনের কৃত্যকে আর্য ঋষিরাও মানব ধর্ম বলেই মনে করতেন। সংস্কৃত শাস্ত্রকাররা তাই বলেছেন যে, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'। প্রাণ ধর্মের গোড়ার কথাই দেহ ধর্ম। তাই ধর্ম সাধনার আগেই দরকার শরীর চর্চার। বেদ-উপনিষদেও শরীর চর্চার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাই বেদের মধ্যে বলা হয়েছে—শরীরং মে বিবর্ষনম্ অর্থাৎ আমার শরীরকে যেন দৃঢ় করতে পারি। উপনিষদের ঋষিগণ আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা শরীর চর্চার মধ্যে দেখেছেন এক মহত্তর কল্যাণকর আদর্শকে। তাই আদর্শের কথা প্রসঙ্গে উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে—'আশিষ্ঠো, দ্রঢ়িষ্ঠো, বলিষ্ঠো, মেধাবী'—অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের আদর্শ হবে বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ হওয়া চায় তার মেধা, সমগ্র বিশ্বকে শাসন করতে পারে—এমন তেজ সঞ্চয় করা চাই। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, শরীর চর্চাটা মানুষের অবশ্য পালনীয় ধর্ম। দেহের সঙ্গে মনকেও সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—এটা শরীর চর্চার আর একটা দিক।

তা' হ'লে দেখা গেল যে, শিক্ষার দুটো দিকই আছে। যেমন—শারীরিক ও মানসিক। মানসিক বিকাশ যেমন কেতাবী শিক্ষার উদ্দেশ্য, শারীর শিক্ষার লক্ষ্যও তেমনি দৈহিক উৎকর্ষলাভ। শরীরটা যদি শারীর শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হয়, তবে কি শরীরী জীবের পক্ষেই শারীরিক শিক্ষা প্রযোজ্য হবে ? উদার অর্থে কথাটা সত্য হ'লেও, জীবন সম্বন্ধে সচেতন ক্রমবর্ধমান জীবের পক্ষেই শারীর শিক্ষা বিশেষ কার্যকরী ; অর্থাৎ অনুশীলনের শক্তি যার নেই, তার কাছে শরীর চর্চার কোন মূল্য নেই।

**সংজ্ঞা :** এবার শারীর শিক্ষা কি, তার সংজ্ঞা দেওয়া যাক। শারীর ইংরাজী হলো **Physical Education।** Physique 'ফিজিক' কথাটা থেকেই physical শব্দের

উদ্ভব। তা' যদি হয়, তবে physique অর্থাৎ **ঐহিকের অনুশীলনাত্মক কলা-কৌশলকেই শারীর শিক্ষা বলা চলে।** কাজেই, এই দেহের সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য এবং শ্রীকে অটুট রাখার জন্যই প্রয়োজন অঙ্গ-সঞ্চালনের। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেন এই দেহ-চর্চার আর শেষ নেই—জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রতিমুহূর্তে চলেছে মানুষের বিরামবিহীন অঙ্গচালনা।

আধুনিক কালের জনৈক আমেরিকান শারীর শিক্ষাবিদ আরও ব্যাপক অথচ বৈশেসিক অর্থে প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে দেখেছেন। তিনি শারীর শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধরণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, "শারীর শিক্ষা কতকগুলি খণ্ড বিক্ষিপ্ত উদ্যমমাত্র নয়, বরং প্রবাহমান ধারা। যে ধারা কেবল দেহ-সঞ্চালনের বিচিত্র নিত্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না, উপরন্তু ব্যক্তি বিশেষের মধ্যেও পরোক্ষ পরিবর্তন সাধন করছে। এই পরিবর্তন কেবল দেহতেই সীমিত নয়, তার প্রভাব মর্ম থেকে মগজে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। শারীর শিক্ষার এহেন অখণ্ড সামগ্রিক ক্রম পরিণতির কথা স্মরণ করে, তিনি এই অখণ্ডতার আভাস দিলেন। শরীর শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ করতে গিয়ে বল্লেন, যেহেতু দেহ-মন-আত্মা নিয়ে মানুষের সামগ্রিক সত্তা বিধৃত, সেই কারণে শারীর শিক্ষার লক্ষ্য হবে 'the education of the whole man through physical activities" এহেন ব্যাপক অর্থেই গ্রীক দার্শনিক প্লেটোও শিক্ষাকে দেখেছিলেন। বলেছিলেন যে, দেহের জন্য ব্যায়াম আর মনের জন্য গানেরই তিনি সুপারিশ করেছিলেন।

শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে গিয়ে শিক্ষাবিদরা বলেছেন যে, মানুষের ক্রম পরিণতি আসবে ধাপেধাপে। প্রথমে ঘটবে বৃদ্ধি ও বিকাশ; এবং পরিণামে মানুষকে তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এটা কিন্তু সব শিক্ষারই অন্তর্নিহিত লক্ষ্য, মূল কথা। অথচ শরীর শিক্ষার যে পরিণামটা সরাসরি আমাদের চোখে পড়ে, সেটা স্বাস্থ্যরক্ষা, দেহটাকে গড়ে তোলা। এই দেহমন সতেজ, সুস্থ হয়ে উঠলে একটি পরিণত মানুষের ক্রমপর্যায়ে কাম্য হ'বে (ক) নিজ নিজ পরিবারের উপযুক্ত সভ্য হয়ে উঠা, (খ) বৃত্তি-গত নৈপুণ্য অর্জন করা, (গ) একজন সুযোগ্য নাগরিক হয়ে উঠা, (ঘ) উপযুক্ত ভাবে অবসর বিনোদন করা এবং সর্বোপরি একটা নৈতিক চরিত্র গঠন করা। এগুলিই অবশ্য শরীর শিক্ষার পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

এখনও আমরা শারীর শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন। এই কারণে দেখা যায় যে, স্বাধীনতার পরেও শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর তেমন গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। দিনান্তে কিছুক্ষণের জন্য উন্মুক্ত মাঠে ছেলেরা বিচরণ করবে, সেই পা' ফেলার জমিটুকুও অনেক বিদ্যালয়ে নেই। ছাত্রদের তালিম দেওয়ার মত শিক্ষণপ্রাপ্ত শারীর শিক্ষক নেই চৌদ্দ আনা বিদ্যালয়ে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এই অব্যবস্থাটা প্রায় অকল্পনীয়। তাই খেলার মাঠকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষায়তনের কথা যেন ইওরোপবাসী ভাবতেই পারেন না। শিক্ষাবিদ হাচিন্‌সনের একটি মন্তব্যে ঐ কথারই

প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি বলেছেন যে, "মাঠ-বিহীন বিদ্যালয়-গৃহ-অপেক্ষা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-হীন খেলার মাঠই ঢের কাম্য।"

এহেন জীবন-কেন্দ্রিক যে শারীর শিক্ষা, জীবন-প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন কেন এবং কতখানি, সে সম্পর্কে বহু সমীক্ষাও আলোচনা হয়েছে আমেরিকায়। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত শিক্ষা-নীতি-নির্ধারক কমিশনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সেখানে শারীর শিক্ষাকে যথেষ্ট অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে চতুর্বিধ উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। যথা (১) আত্মোপলব্ধির জন্য (২) মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য (৩) অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য এবং (৪) নাগরিকতার শিক্ষার জন্য।

উক্ত চতুর্বিধ দায়-দায়িত্ব এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে শারীর শিক্ষার ভূমিকা কতখানি, সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা যাক।

(১) **আত্মোপলব্ধির জন্য :** এখন আলোচনা করা যাক কি ভাবে এই আত্মোপলব্ধি ঘটে। আমরা সাধারণত মন দিয়ে ভাবি, হাত দিয়ে কাজ করি। হাত কিন্তু নিজে কিছু করতে পারে না, মনের হুকুমেই সে কাজ করে। সে ভৃত্য, মন তার মনিব। মাত্র কয়েক মুহূর্তে যে কাজটা সুসম্পন্ন হয়, বুঝতে হবে যে, তার পিছনে বহুক্ষণের ভাবনা আছে। এই ভাবনা এসেছে মনের অনেকগুলি স্তর পেরিয়ে—যেমন চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা শক্তি। তারপর রূপায়িত হয়েছে কাজটা। এই চলমান জীবন্ত কর্ম-স্রোতে অবগাহন করে নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাদের আত্মোপলব্ধি ঘটছে। হাতের উপলব্ধি—ধরা ছোঁয়ার নানা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির মধ্যে দিয়ে আমাদের মগজে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে যে চেতনার সংবাদ, সেটাই আমাদের পরম পাওয়া। আত্মোপলব্ধির আনন্দ-প্রসঙ্গে। এই প্রক্রিয়া কি ভাবে সংঘটিত হ'চ্ছে, তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক **ষ্টেনলি হল**। তিনি বলেছেন যে, খেলাধূলার ব্যাপারটা অবহেলার বিষয় নয়, এ দেহমনের একান্ত অন্তরঙ্গ ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ব্যাপার। কেননা শরীর চর্চাই আমাদের মগজের বিকাশ ঘটায়। শুধু তাই নয়, আমাদের যা কিছু ভাবনাভাব, কল্পনা, অনুকরণ, স্বকরণ, অভিব্যক্তি, অভ্যাস, আচার আচরণ, এমন কি প্রথা পদ্ধতিরও মাধ্যম হ'চ্ছে পেশী সম্বলিত আমাদের এই দেহ। দৈহিক প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কোন উপলব্ধি এত সরাসরি মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না। এর প্রমাণ যারা বাঁ হাতের ব্যবহার করে, তাদের বিপরীত অর্থাৎ ডান দিকের মগজ বৃদ্ধি পায়। আর যারা ডান হাতের বেশী ব্যবহার করে, তাদের বাঁ দিকের মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পায়। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক জ্ঞানের যথেষ্ট মূল্য আছে।

(২) **মানবিক সম্পর্কের জন্য :** এখন দেখা যাক শরীর চর্চা বা খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে কি ভাবে মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সঙ্গে অপর একজন পরিণত মানুষের সংযোগ ঘটে সমাজ জীবনে, কর্মক্ষেত্রে। উঠতি জীবনের

ছাত্রদের সংযোগ ঘনিষ্টতর হয় সঙ্ঘ, সংগঠন ও সহযোগিতার মাধ্যমে। এই ত্রিবিধ সুবিধার পর্যাপ্ত সুযোগ মেলে মাঠে ময়দানে-ক্লাবে। ক্লাব-প্রীতির মধ্যে দিয়ে তরুণ ক্রীড়ামোদী ছাত্রদের মনে জাগ্রত হয় সঙ্ঘ-চেতনা। দলীয় মনোভাব গড়ে উঠে খেলার সাথী হিসাবে পাশাপাশি খেলতে খেলতে। অতি কাছাকাছি থেকে একে অন্যকে জানবার এত মানবিক বোঝাপড়া human understanding এর অন্য কোথাও নেই। তা খেলার মাঠের একজন ভালো খেলোয়াড় তার পরিচিতির পরিধি যেমন ব্যাপক, তেমনি তার সংগঠনের সুযোগ সুবিধাও অনেক বেশী। এই ভাবে কৃত্যের নানা অনুশীলন, প্রতিযোগিতা আর সংগঠনের মধ্যে দিয়ে যেমন রয়েছে জীবন প্রস্তুতির সুযোগ, তেমনি আছে মানবিক হৃদয়-উত্তাপের কি উষ্ণ নিবিড় স্পর্শ।

**(৩) অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য :** এবার অর্থনৈতিক-প্রসঙ্গ আলোচনায় আসা যাক। শারীর শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি কোন অর্থনৈতিক যোগ নেই। অবশ্য অসুস্থতার সঙ্গে ব্যয়বাহুল্যের একটা সম্পর্ক আছে। শরীর চর্চার ফলে যদি নিরোগ সবল দেহ লাভ করা যায়, তবে ডাক্তার-বদ্যি-ওষুধের ব্যয়ভার থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কাজেই ছেলেমেয়েদের যদি সুস্থ সবল করে তোলা যায়, তার ফলে ডাক্তার ওষুধের যে খরচ বাঁচবে, সেটাকেই আমরা অর্থনৈতিক সুবিধা বলতে পারি। তা' ছাড়া দৈহিক সক্ষমতার গুণে তারা একাধারে দক্ষ কর্মী, আদর্শ মাতাপিতা এবং সু-নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য এই যে অর্থ লগ্নী করা হয়েছিল, তার বিনিময়ে যে ফল লাভ হলো, সেও একক্ষেত্রে আর এক অর্থনৈতিক সুরাহা। জীবন-জীবিকার দিক থেকে যে সব সুবিধা আছে—যেমন স্বাস্থ্যবান একজন, অন্য রুগ্ন দুর্বল কর্মীর চেয়ে শ্রমসপেক্ষ অনেক কাজ করে ঢের বেশী রোজগার করতে পারবে। আর মা বাপ সুস্থ সবল হ'লে সন্তান সন্ততিরাও ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। এইভাবে সুস্থতার দরুণ যতই ডাক্তার ওষুধের খরচ কমে আসবে, ততই গৃহকর্তার উপর অর্থনৈতিক চাপ কম পড়বে। It is certainly good economy to make the boy or girl healthy and strong. It makes them good children, goods worker, good parents and citizens.

**(৪) নাগরিকতার শিক্ষার জন্য :** সুস্থ-স্বাভাবিকতা নাগরিক অধিকার লাভের অন্যতম প্রধান যোগ্যতা। অস্বাভাবিক বিকৃত মস্তিষ্কের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরও ভোটাধিকার থাকে না। এই প্রাথমিক গুণার্জনের জন্য যে স্বাভাবিক পরিণতি দরকার তা শরীর চর্চার মাধ্যমে লাভ করাটা আদৌ কঠিন নয়। তা' ছাড়া সংশোধনাত্মক ব্যায়ামের দ্বারা অনেক দৈহিক ত্রুটি, অনেক অক্ষমতার হাত থেকে কেবল অব্যাহতি পাওয়া যায় তা নয়, কর্মজীবনে প্রবেশ করার সময় অতি সহজেই ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ভালো নাগরিকতার আরও একাধিক বাঞ্ছিত যে সব গুণ থাকা দরকার যেমন সহঅবস্থান, সামাজিকতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া, পর অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা ইত্যাদি সদভ্যাসগুলো খেলাধূলার নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে অতি

সহজেই গড়ে উঠে। যেমন ধরা যাক খেলোয়াড়ী মনোভাব অর্থাৎ good sportsmanship কেবল কথার কথা নয়। এই মনোভাব এমন কতকগুলো বোধ ও আচরণের সমষ্টি, তা অতি সহজেই একজন নৈষ্ঠিক খেলোয়াড় খেলাধুলার জগৎ থেকে আহরণ করে আনতে পারে। এই সব সামাজিকতার, নাগরিকতার, সুশিক্ষার অনুশীলন-শিবির হচ্ছে খেলার মাঠ।

**আবশ্যকতা:** তা হলে দেখা গেল যে, খেলাধুলা বা শরীর চর্চা নিছক একটা অবসর বিনোদনের ব্যাপার নয়। এর পিছনে রয়েছে জীবন যাপন আর প্রাণ শক্তিকে অনুধাবন করা। এ দুটোই বিকাশোন্মুখ শিশু-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। ভবিষ্যতে কে কেমন হবে, তার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় খেলার দর্পণে। ইতিহাসে তার একাধিক নজির রয়েছে। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে, ইটনের মাঠেই ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় হয়েছিল। ঐ যুদ্ধে দুর্ধর্ষ ফরাসী বীর নেপোলিয়ানকে পরাজিত করেছিলেন নেলসন। তাঁর সেই অদ্ভুত দৃঢ়চিত্ত আর নেতৃত্বের পরিচয় ইটেন বিদ্যালয়ের মাঠে। এবংবিধ নানা দিক আর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য-শিক্ষা পর্ষদ শারীর শিক্ষাকে আবশ্যিক রূপে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন ১৯৭৪ সালের শিক্ষা বর্ষ থেকে। তাঁদের এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়ে শারীর শিক্ষা আবশ্যিক হিসাবে গৃহীত হয়েছে। তাই আমরা আশা করবো যে, আগামী কালের এক প্রাণ সমৃদ্ধ সুস্থ স্বাভাবিক ভারতবর্ষ ভূমিষ্ঠ হবে, একালের খেলার মাঠ থেকে।

## ক্যালিস্থেনিকস্ (Calisthenics)

**বুৎপত্তিগত অর্থ: পেন্টাথেলান-ডেকাথেলান** যেমন নৈত্য ক্রীড়াগত দুটি গ্রীক শব্দ, ক্রীড়াজগতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি গ্রীস দেশ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল জিমনাষ্টিক, এ্যান্টাগনিষ্ট এবং স্টাডিয়াম প্রভৃতি শব্দ। তেমনি **ক্যালিস্থেনিকস্**-এর জন্মস্থান গ্রীস দেশ। 'কেলস্' এবং 'স্থেনস্'—এই দুইটি শব্দের সমন্বয়ে শব্দটার উদ্ভব। কথা দুটোর অর্থ যথাক্রমে সুন্দর ও শক্তি। তা' হ'লে ক্যালিস্থেনিকস্ কথাটার অর্থ দাঁড়াল সৌন্দর্যময় শক্তি,—যাকে গ্রীস দেশবাসীরা সুঠাম দেহ ছন্দ বলে মনে করতেন। আসলে এই সৌন্দর্য ও শক্তির আরাধনা প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল বলা শক্ত। তবে অনেকে মনে করেন যে, ছন্দময় হালকা ধরণের ব্যায়াম একদা এথেন্সে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেটাই পরবর্তী যুগে ক্যালিস্থেনিকস-এ পরিণত হয়েছিল কিনা বলা শক্ত। অনেকে আবার মনে করেন যে, মিশরীয় সভ্যতার যুগে ক্যালডিয়া যখন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়, সেখানে নৃত্যচর্চার যে রেওয়াজ ছিল, তার সঙ্গে

ক্যালিস্থেনিকস-এর একটা যোগসূত্র রচনা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার স্বপক্ষে সমর্থনযোগ্য তেমন কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবে এর বেশ কয়েক শতাব্দী পরে যখন **টাউটন** ও **স্টুর্থাস** নামে দু' জন পাশ্চাত্ত্য শারীর শিক্ষাবিদ শারীরিক শিক্ষার দশটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং প্রমোদমূলক নাচগানকে স্থান দিলেন, তখনই মেয়েদের ব্যায়াম হিসাবে ক্যালিস্থেনিকস-মর্যাদা লাভ করে বলে অনেকে অনুমান করেন। এই অনুমান কতটা ইতিহাস-নির্ভর বলা শক্ত। তবে ঐ কথা ও কাজের উদ্ভবস্থল যে গ্রীসদেশ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা যে এক ধরণের খালি হাতের হালকা ব্যায়াম, যা একান্ত ভাবে মেয়েদের নমনীয় সুঠাম দেহ গঠনের উপযোগী, পাশ্চাত্ত্য ক্রিয়াবিদ লিঙ্গেই সে কথা বলেছেন।

খালি হাতে ব্যায়াম-এর সুবিধা এই যে, এতে দেহের নিজস্ব গঠনাকৃতির যে ছন্দ আছে, তা অবিকৃত থাকে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যায়াম করলে, দৈহিক সৌন্দর্য খানিকটা ক্ষুন্ন হয়। দেহের নিজস্ব ছন্দ বজায় থাকে না। এই কারণে ক্যালিস্থেনিকসকে মেয়ের উপযোগী ব্যায়াম বলেই স্বীকার করা হয়েছে। এর মধ্যে নাচগানের কিছুটা অবকাশ আছে। কারণ পিয়ানো বাজনার সঙ্গে তাল রেখে, ভারসাম্য রক্ষার জন্য হাল্কা দণ্ড হাতে নিয়ে এই ক্যালিস্থেনিকস্ ব্যায়াম করতে হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় ক্যালিস্থেনিকস প্রয়োগ দেখা যায়। তখন থেকেই বোধ হয় জিমন্যাষ্টিকসকে ক্যালিস্থেনিকস্ থেকে আলাদা করা হয়। এই ব্যায়ামাগারের নামকরণ হয় **ক্যালিস্থেনিয়াম**।

আগে জনসাধারণ্যে এই নৃত্যগীত-সমন্বিত ব্যায়াম প্রদর্শনের রীতি ছিল না। যতদূর জানা ১৮৮৩ সালে নিউ ইয়র্কেই ক্যালিস্থেনিয়ামে সকলের প্রবেশ অধিকার ঘটে। তখন থেকে এটি রীতিমত বিনোদন নৃত্যে পরিণত হয়। আর প্রায়শঃ নৈশভোজের আসরে অতিথি আপ্যায়নের অঙ্গ হিসাবে দেখা দিল। মেয়েদের ব্যায়াম বলে, এর শিক্ষয়িত্রীরাও হলেন মহিলা।

বর্তমানে আমাদের দেশে যেমন ব্রতচারী-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছে, তেমনি বিংশ শতকের পাশ্চাত্ত্য দেশে ক্যালিস্থেনিকস্ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের তেমন ঔৎসুক্য দেখা যায় না। আজ শরীর চর্চার আখড়া হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্রই নানা ধরণের অসংখ্য ব্যায়ামাগার দেখা যায়, কিন্তু ক্যালিস্থেনিয়াম কোথাও আছে কিনা, তা ক্রীড়ামোদীরাও হয়তো বলতে পারবে না।

টাউটন ও স্টুর্থাস যে রিদ্‌মিক ভঙ্গকে সৌন্দর্যতত্ত্বের অন্তর্গত করেছিলেন তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আর প্রমোদমূলক নাচগানের দিকটার সঙ্গে ক্যালিস্থেনিকসের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। একাধারে বিনা সরঞ্জাম, খালি সৌন্দর্য ও শক্তির আরাধনা যে নারীদেহে বল ও লাবণ্য বৃদ্ধি করতো,—সেই দিক থেকে বিচার করলে ক্যালিস্থেনিকসের মত এই বিশেষ ধরণের শ্রেণী বিশেষের ব্যায়ামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

## মার্চিং, ড্রিল ও স্বদেশী ব্যায়াম

**ভূমিকা:** মার্চিং ড্রিলের একটি অংশ। ড্রিলের ক্রিয়াকলাপের নানা অবশ্য কৃত্যের মধ্যে একটি। **মার্চ** একটি ইংরাজী শব্দ। ওর অর্থ এগিয়ে চলা। আর **ড্রিল** করার অর্থ অনুশীলন। এই অনুশীলনের মধ্যে আবার স্তর রয়েছে। যেমন—**পুনরাবৃত্তি, অনুকরণ** বা **অনুসরণ, প্রদর্শন, সংশোধন** এবং **আয়ত্তকরণ**। এই সব কিছু একত্রীভূত হয়ে অভ্যাসে পরিণত হ'লে, আমাদের অগোছালো স্বভাব, ঢিলেমি, নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে একটা সংহত অভ্যাসকে গড়ে তোলে। এরই নাম শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খলার মধ্যে একাধারে বাঁধনও আছে, তেমনি আছে মুক্তির অবকাশ। কথায় বলে Law is the condition of liberty. অর্থাৎ স্বাধীনতা আইনেরই একটি শর্ত। আইন না থাকলে শৃঙ্খলা থাকে না। শৃঙ্খলাহীন-আতঙ্ক স্বাধীনতাকে হরণ করে।

এ ড্রিল কবে যে সুপরিকল্পিত শারীর চর্চার একাধিক নির্ধারিত নির্ঘণ্টে পরিগণ হয়েছে তার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে দেহ ও দেশ রক্ষার জন্য স্পার্টান দেশে যখন বিধিবদ্ধভাবে শরীর চর্চার দীর্ঘ কার্যসূচী অনুসৃত হতো, বোধ হয় তখন থেকেই ড্রিল শরীর চর্চার অন্তর্গত হয়েছিল। অবশ্য সুপ্রাচীন কালে আমাদের দেশের ক্ষত্রিয় রাজা রাজড়া, পেশাদার সেনারা স্বাস্থ্য ও শক্তিকে অটুট রাখবার জন্য নিশ্চয় কিছু-না কিছু অভ্যাস অনুশীলন করতেন।

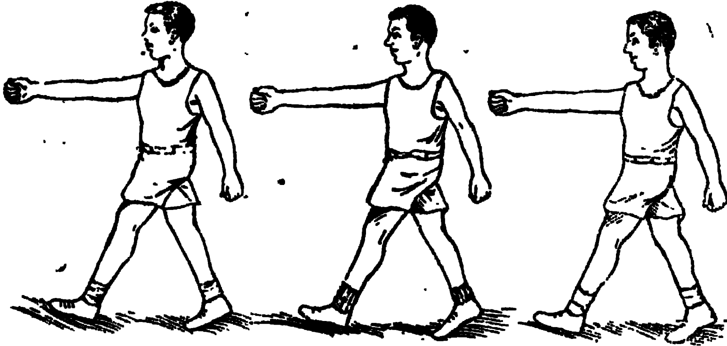
ব্যক্তি জীবনে শৃঙ্খলা বোধের দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজন জাতীয় জীবনে। কেতাদুরস্ত, তালিমে অভ্যস্ত সুশৃঙ্খল আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, সেই জাতি সভ্যতার কোন স্তরে আছে। আজ চীন-জাপান-রাশিয়া এই নিয়মানুবর্তিতার উৎকর্ষে,নিত্য তালিম নেওয়ার ফলে এক উন্নত, প্রগতিশীল জাতির পর্যায়ে উঠে গেছে। প্রতিটি প্রগতিশীল দেশে জাতটাকে এই তালিমের ছাঁচে ঢালাই করে গড়ে তোলার জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। বিকাশোন্মুখ ছাত্রছাত্রীদের অনিয়ন্ত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পৈশিক শৈথিল্যকে দূরীভূত করে, তাদের শক্তি সামর্থকে এক সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার সূত্রে গ্রথিত করে দেওয়ার জন্য বাল্যে ও ছাত্রাবস্থায় কঠোর তালিম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

**সংজ্ঞা:** তা হলে ড্রিলের সংজ্ঞা দাঁড়াল এই যে, ড্রিল বলতে এমন একটি অনুশীলন প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যে প্রক্রিয়া একাধিকবার পুনারাবৃত্তি করার ফলে আমাদের অনুকৃত অভ্যাসগুলো স্বকরণ রীতিতে পরিণত হয়।

**অনুশীলনের পরিণাম:** ড্রিল বা অনুশীল আমাদের চারটি বিষয় সাহায্য করে। প্রথমতঃ দেহটাকে অনন্ত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার শক্তি দান করে। (২) দেহমনকে একত্রে কাজ করতে সাহায্য করে। (৩) কোন খেলা আরম্ভ করার আগে প্রেরণার উত্তাপে উদ্দীপিত করে। (৪) আনুগত্যের তালিম দেয়।

**ড্রিলের হুকুম:** ড্রিল বা মার্চিং যাই আমরা করতে চাইনা কেন, শিক্ষার্থীদের

তার সঠিক নির্দেশ দিতে হবে। তা না হলে ড্রিল বা মার্চিং সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে না। তাই জানতে হবে যে, হুকুমের চারটি স্তর আছে। যথা—(ক) **ব্যাখ্যা** (Explanation) (খ) **প্রদর্শন** (Cenionestration) (গ) **করানো** (Execution) এবং (ঘ) **সংশোধন**।



ড্রিলের অনুশীলন

**ড্রিল করার সময় করণীয় বা লক্ষণীয় কি আছে :—**

(ক) কর্মতৎপর হতে হবে ( ability থাকা চাই )।

(খ) প্রত্যেকটি ড্রিল নিভুর্ল ভঙ্গীতে করতে হবে।

(গ) ড্রিলের সময় সারিতে দাঁড়িয়ে কথা বলা উচিত নয়।

(ঘ) প্রতিটি নির্দেশ মন দিয়ে শুনে যথাযথ পালন করতে হবে।

**শিক্ষকের লক্ষণীয় কি :**

(১) শিক্ষক মহাশয় যে ভাবে যেমন ব্যায়াম বা ড্রিল করাবেন, সেইমত ছাত্রদের **লাইন** বা **ফাইলে** দাঁড় করাবেন।

(২) তিনি ছাত্রদের কাছ থেকে ১৫।২০ গজ দূরে এমন জায়গায় দাঁড়াবেন, যেখান থেকে শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রকে ভালভাবে দেখা যায়।

(৩) ছাত্রদের সতর্ক (attention position) অবস্থায় দাঁড় করিয়ে কোন নির্দেশ দেবেন না।

(৪) হাসি খুশী ও আনন্দের মধ্যে শিক্ষক মহাশয় এমন ভাবে পাঠ দান করবেন, যাতে ছাত্রদের কাছে পাঠ দানটা উপভোগ্য হয়।

(৫) তিনি ঘুরে ঘুরে শ্রেণীর ছাত্রদের লক্ষ্য করবেন ; একান্ত পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের সহৃদয়তার আলাদা দলে বা এককভাবে আবার তালিম দেবেন।

(৬) কখনও ভুল নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়।

**সাজ পোষাক :** পোষাক একই ধরণের হওয়া উচিত। যেমন খাঁকি হাফ,

প্যাণ্ট, স্যাণ্ডো গেঞ্জী, পায়ে সাদা মোজাসহ কেড্‌স সু; মেয়েদের ক্ষেত্রে—স্কার্ট-ফ্রক। ঢিলে ঢালা পোষাক বা শাড়ী পরাটা উচিত নয়।

**প্রারম্ভিক কাজ :** মনে রাখতে হবে যে কোন ব্যায়াম, ড্রিল ইত্যাদি করতে হ'লে শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ হবে, ছাত্রদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর পর, তাদের ডা অথবা বাঁ দিক থেকে সংখ্যা গণনা করতে বলতে হবে। ছাত্র সংখ্যাটা জানা থাকলে, ব্যায়ামের শেষে খেলাধুলা করানোর সময় দল ভাগের কোন অসুবিধা হবে না।

**শরীর গরম করার ব্যায়াম** (warming up e ercise) **:** বাঁশী বাজিয়ে ছাত্রদের বলতে হবে তোমরা ঐ সামনের দেওয়াল। গাছ ছুঁয়ে এসে এখুনি আমার সামনে দু'টি ফাইলে দাঁড়াও। ছেলে তখন এক ছুটে গিয়ে দেওয়াল বা গাছ ছুঁয়ে যখন ফিরে আসবে, তখন তাদের ইচ্ছে মতন লাইন বা ফাইলে দাঁড় করিয়ে অন্যান্য ব্যায়ামাদি করাতে হবে। তার আগে এই যে প্রাথমিক ছুটোছুটি তারই নাম শরীর গরম করার ব্যায়াম। যে কোন ব্যায়াম বা ড্রিল যাই করানো হোক না কেন, ঐ শরীর গরম করার ব্যায়ামটি করতেই হবে।

**সাবধান বা অ্যাটেনশন :** ব্যায়াম শুরু করানোর পূর্বাবস্থা। এটাই সবচেয়ে দরকারী বা ড্রিলের প্রথম পাঠ। সাবধান অবস্থায় দুই গোড়ালি থাকবে এক লাইনে। আর দুই পায়ের পাতার মধ্যেকার ব্যবধান হবে ৩০ ডিগ্রি। হাঁটু মেরুদণ্ড ও কাঁধ সোজা, বুক উঁচু, আর দৃষ্টি সামনের দিকে। এই হলো অ্যাটেনশন অবস্থা। অর্ধমুঠি দু' হাত থাকবে দু'দিকের উরুতে লাগানো। শরীর ভারন্যস্ত দুই পায়ের উপর।

**বিশ্রাম বা স্ট্যাণ্ডইজ :** এই সতর্ককরণ নির্দেশ শোনা মাত্র বাঁ পা ১২" ইঞ্চি দূরে বাঁ দিকে সরাতে হবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে হাত দু'খানি এমন ভাবে পিছনে রাখতে হবে, যাতে ডান হাতের পিছনটা থাকে বাঁ হাতের তালুর উপর। আর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি থাকবে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের উপর।

এই অবস্থা পরবর্তী ব্যায়ামের ব্যাখ্যা ও ভঙ্গী-প্রদর্শন করতে হয়। অতঃপর নূতন নির্দেশের পূর্বে সাবধান অবস্থায় ফিরিয়ে এনে নূতন ব্যায়ামের নির্দেশ দিতে হয়।

ড্রিল বা মার্চিং মাত্র আট-ন'টি নির্দেশ অনুসরণ করতে হয়। যেমন—(ক) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিছনে ঘোর, (খ) ডাইনে বা বাঁয়ে ঘোর, (গ) ডান দিক দিয়ে উল্টো দিকে ঘোর, (ঘ) এক লাইনে দাঁড়াও, (ঙ) ধীরে চলো, (চ) দ্রুত চলো বা দৌড়ে চলো, (জ) হল্ট্ বা থাম এবং (ঝ) স্যালুট।

(ক) **দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিছনে ঘোর :** [মনে রাখতে হবে দাঁড় করিয়ে কোন কিছু করানোর আগে, ওয়ার্মিং আপ বা শরীর গরম করার ব্যায়াম দিতে হবে। ] বাঁ পায়ের আঙুলের ডগায় চাপ দিয়ে এবং ডান পায়ের পাতা ঈষৎ উঠিয়ে ভর দিয়ে দেহটাকে পিছন দিকে ১৮০ ডিগ্রি ঘোরাতে হবে। (ক২) অতঃপর বাঁ পা প্রায় ছ' ইঞ্চি উঠিয়ে ডান পায়ের কাছে রেখে দাঁড়াতে হবে। ঐ সময় দেহের ভারসাম্য পড়বে ডান পায়ের উপর।

(খ) **ডাইনে বা বাঁয়ে ঘোর :** ডান বা বাঁ—এই দু দিকেই ঘুরতে গেলে হাঁটু

সোজা রাখতে হয়। তারপর ডান দিকে ঘোরার নির্দেশ পেলে বাঁ পায়ের আঙুলের ডগায় চাপ দিয়ে ডান পায়ের গোড়ালি ভর করে ৯০ ডিগ্রি ঘুরতে হবে। কিন্তু বাঁ-দিকে ঘোরার সময় সব কিছুই ডান দিকের উল্টো ভাবে করতে হবে।

(গ) **ডানদিক দিয়ে উল্টো দিকে ঘোর:** মনে রাখতে হবে উল্টো দিকে ঘোরার সময় ডান দিক দিয়ে ঘুরতে হ'বে।] ডান পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুলের ডগার চাপে একটু জোর দিয়ে ১৮০ ডিগ্রি ঘোরার পর বাঁ-পাটা ছ ইঞ্চি উঠিয়ে ডান পায়ের গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে পাশে রাখতে হবে।

(ঘ) **এক লাইনে দাঁড়াও:** দু' ভাগে লাইনের বিন্যাস হয়—(১) **লাইন**—পাশাপাশি একই সরলরেখায় মাথায় বড় থেকে ক্রমান্বয়ে ছোটদের দাঁড়াতে হবে—বড় থেকে ছোটরা দাঁড়াবে ডান থেকে বাঁ দিকে অথবা বাঁ থেকে ডান দিকে ক্রমপর্যায়ে।

**ফাইল:** ফাইল লাইনের আর একটি শ্রেণী বিন্যাস। ফাইল লাইনের মত পাশাপাশি দাঁড়ানোর নিয়ম নয়। এখানে ছোটরা সামনে বড়রা উচ্চতা হিসাবে আগে-পিছে দাঁড়ায়। ফাইল বিন্যাস এক বা একাধিক হতে পারে। আর চুনের দাগ কাটা লাইন বা দাগে পা দিয়ে ফাইল বা লাইনে দাঁড়ানো যেতে পারে। হাত ধরাধরি করে অথবা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লাইনের প্রথম জন বাদে প্রত্যেকে ডান হাত তুলে ডানদিকে দাঁড়ানো ছাত্র বা ছাত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দূরত্ব ঠিক করে নিতে হয়। ব্যায়াম বা খেলার জন্য এই নির্দিষ্ট এক বাহুর দূরত্ব কমাতে বাড়াতে হয়। তারপর গণনা শুরু বলার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিক থেকে এক-দুই-তিন করে গণনা শুরু হয়। এই সংখ্যা বলার সময় বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হয়। বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

**(ঙ) ধীরে চলো:** থুতুনি ঈষৎ উঠানো, শরীর সোজা থাকবে। চলা সব সময় শুরু হবে বাঁ পায়ে। অর্ধমুষ্টিবদ্ধ দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠানামা করবে দ্রুত বা ধীর গতির সঙ্গে সমতা রেখে। মার্চ-পাস্টের সময় দু'হাতই থাকবে অর্ধমুঠি অবস্থায় দুদিকের উরুতে লাগানো। প্রতি পদক্ষেপের পরিমাপ হবে আনুমানিক ৩৮ সেন্টিমিটার। লেফ্‌ট্ বা এক বললে বাঁ পা আর রাইট বা দুই বললে ডান পা মাটিতে পড়বে।

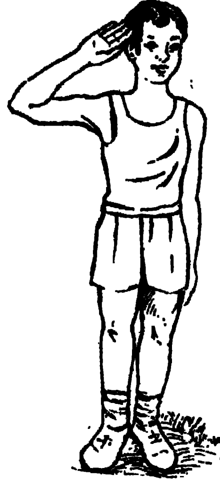
চলতে চলতে থামতে হ'লে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চার সংখ্যা গণনার পর থামতে হবে। যে পায়ে তালরাখা শুরু হয়েছিল, সেই পায়ে বিরতি আসবে। যেমন—থেমে—যাও-এক, দুই, তিন, চার—বলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পায়ে তালরাখা শেষ হবে।

**(চ) দ্রুত বা দৌড়ে চলো:** এই নির্দেশ শোনা মাত্র গতি বাড়াতে হবে। তবে সকলের বাঁ পায়ের সঙ্গে বাঁ-পা, ডান পায়ের সঙ্গে ডান পা সমতালে মাটিতে পড়বে উঠবে। এই সময় পায়ের পাতা আল্‌তো ভাবে মাটি স্পর্শ করবে। এই সময় হাতের কুনুই ১৩৫ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে থাকবে। দ্রুত তালে চলার সময় ঘাড় ঈষৎ উঁচু এবং সোজা রাখতে হবে।

**(ছ) হল্ট্ বা থাম:** দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে তাল রাখার সময় দু' সংখ্যা গণনার

পর থাকতে হয়। এবার ডান পায়ে বিরতি আসবে। যেমন—এবার থাম—এক, দুই। দ্রুত তালে চলার সময় কিভাবে থামতে হবে, তা বলা হয়েছে (ঙ) অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে।

(জ) **স্যালুট ঃ** এই স্যালুট হচ্ছে সামরিক কায়দায় শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি। এটা খুব



স্যালুট

নিয়ম মাফিক এবং কড়াকড়ি ভাবে মেনে চলতে হয়। নির্দেশ ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলতে হয়। যেমন—স্যা—লু-ট। ঐ নির্দেশ শোনা মাত্র সাবধান অবস্থায় দাঁড়িয়ে ডান হাত অর্ধ বৃত্তাকারে এনে ডান কপালের ভুরুর নিচেয় ঠেকাতে হবে। কাঁধ বরাবর অ্যাঙ্গল করে হাত ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে। আর চারটি জড়করা আঙুলের উপর বুড়ো আঙুল থাকবে বাঁকানো অবস্থায়। তখন ডান-চোখ থেকে হাতের বুড়ো আঙুলের ব্যবধান থাকবে এক ইঞ্চি মতন।

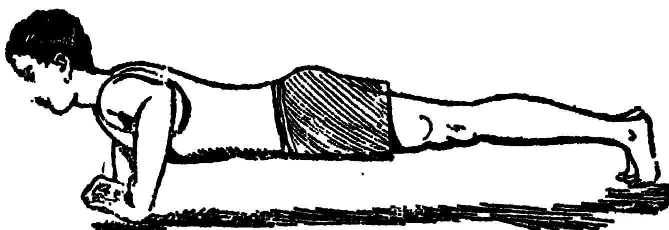
ড্রিল বা মার্চিং-এর সঙ্গে ব্যায়াম অনুশীলনের সহায়ক হিসাবে গদা, বাম্বেল, যষ্টি, লেজিয়াম প্রভৃতি স্বল্প ওজনের সরঞ্জাম নিয়ে শরীর চর্চার রীতি বহুদিন আগে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। মহাভারতে সেই সব গদা যুদ্ধের উল্লেখ আছে। আনুষঙ্গিক ব্যায়াম হিসাবে ওগুলো প্রবর্তন করা যেতে পারে।

## স্বদেশী ব্যায়াম

এক একটা দেশে এক এক ধরনের ব্যায়ামের প্রচলন দেখা যায়। হয় তো বা তারা সেই ব্যায়াম পদ্ধতির উদ্ভাবক, অথবা পরিগ্রাহক। উত্তরকালে এই ধরণের কোন কোন ব্যায়াম দেশীয় ব্যায়ামে পরিণত হয়। এই জাতীয় অনেকগুলি স্বদেশী ব্যায়ামের প্রচলন ছিল ভারতবর্ষে। তার কতকগুলো ছিল নিছক দৈহিক-উৎকর্ষ অর্জনের নিমিত্ত

ব্যায়াম, আবার কোনো-বা ছিল যোগ সাধনায় অঙ্গবিশেষ। শরীর চর্চার প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তখনকার উল্লেখ্য দেশী ব্যায়ামের মধ্যে ছিল —**ডন, বৈঠক, প্রাণায়ম ও সূর্য-নমস্কার**। এর মধ্যে প্রথম দু'টি আজও চালু আছে আমাদের দেশে। সাধারণতঃ দেহটাকে কার্যক্ষম রাখার জন্য ডন বৈঠক দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয় দুটি ছিল সাধন-ভজনের অঙ্গ। **সূর্য নমস্কার** ছিল স্নানকালীন নিত্য স্নান কৃত্য। আর প্রাণায়ম ছিল পুরোপুরি যোগসাধনার অঙ্গবিশেষ। একে এক কথায় শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়ামই বলা চলে। তিনটি ধারায় এই অভ্যাস অনুশীলন চলে—যেমন দেহাভ্যন্তরে নির্মল বায়ু করানোকে বলা হয় **পূরক**, নিরোধ করার নাম **কুম্ভক** আর নিঃসারণ প্রক্রিয়াকে বলে **রেচক**। প্রাণায়ম অভ্যাসের এই রীতি।

**ডন ও বৈঠক ঃ** এ দু'টিই স্বদেশী ব্যায়াম। কুস্তিগীররাই সাধারণতঃ শরীরটাকে আয়ত্তাধীন ও সক্ষম রাখার জন্য এই ব্যায়াম করে থাকেন। ডন দেওয়ার সময় পায়ের



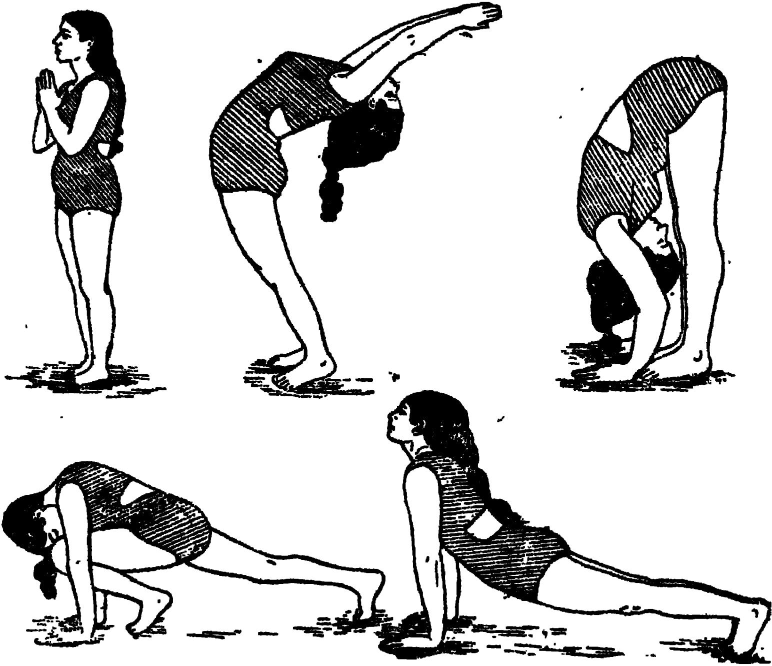
পাতায় ভর দিয়ে প্রথমে হাঁটুর উপর বসতে হয়। তারপর হাঁটু থেকে সামনের দিকে এক হাত এক বিঘৎ দূরত্বে পাশাপাশি দু'হাতের তালু মাটি সংলগ্ন করে কোমর বেঁকিয়ে দেহটাকে পিছনে ভাঁজ করা হাঁটুর কাছে আনতে হবে। তারপর মাথা গুঁজে ডুব দেওয়ার মত ভঙ্গীতে খানিকটা যাওয়ার পর দু'হাতের উপর ভর দিয়ে কোমর থেকে শরীরের উর্ধাঙ্গকে টেনে সোজা করার চেষ্টা করতে হবে। বুক চিতানো ঘাড় উঁচু এই অবস্থায় দেহের অবস্থা হবে ধনুকের ভিতর পিঠের মত বাঁকানো। এইভাবে গুণে গুণে একাধিকবার শরীরটাকে নামিয়ে টেনে তুলতে হবে। একেই বলে ডন দেওয়া।

**বৈঠক ঃ** বৈঠক অনেক ওঠা-বসার পদ্ধতি বিশেষ। দাঁড়ানো অবস্থা যেমন দ্রুত তালে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে হাঁটুর উপর বসা ও উঠা। এরই নাম বৈঠক।

## *যোগ ব্যায়াম বা আসন*

**সূর্য নমস্কার ঃ** শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত যোগ ব্যায়ামের সমগোত্রীয় একটি দেশী ব্যায়াম। ব্যায়ামটি ছেলে মেয়ে উভয়েই করতে পারে। চারটি পর্যায়ে ব্যায়ামটি বিভক্ত। যথা—প্রথম নমস্কারের ভঙ্গীতে ব্যায়ামটির শুরু। দাঁড়ানোর নিয়ম—দু পায়ের পাতা পাশাপাশি জড়করা, পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর দু'বুড়ো আঙুল দু' অনামিকায় সঙ্গে ঠেকিয়ে যুক্ত পাণি বুকের উপর এমনভাবে রাখতে হবে যে

যুক্ত হাতের আঙুলগুলি ত্রিশূলের মত খাড়া হয়ে থাকবে। আর ভাঁজ করা দু'হাতের কনুই মাটির সঙ্গে সমান্তরাল থাকবে। ঐ অবস্থায় শ্বাসগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ধীর গতিতে যুক্ত পাণিসহ কোমর থেকে পিছনে যতদূর সম্ভব দেহটাকে বাঁকাতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে ঐ যুক্ত পাণিসহ শরীরটাকে কোমর থেকে সামনের দিকে এমন—



সূর্য নমস্কার

ভাবে বাঁকাতে হবে যে, হেঁট-মাথার কান বরাবর দু'পাশ দিয়ে দু'হাতের আঙুলের অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ করবে। আর কপাল ঠেকবে হাঁটুদ্বয়ে। এই প্রক্রিয়ার সময় আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। এরপর চতুর্থ পর্যায়ে ডান হাঁটু ভাঁজ করে দু'হাতের উপর শরীরের ভার ন্যস্ত করে বাঁ পা-টা পিছন দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যে, দেহের একাংশের ভার ঐ পায়ের পাতার উপর ন্যস্ত হবে। এই অবস্থায় শ্বাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে বুক ও মাথা উঁচু করতে হবে। এখান থেকে ডনের অবস্থায় যখন ফিরে যাবে, তখন নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে। তারপর কুম্ভক অবস্থায় বার তিনেক ডন দেওয়ার পর আবার সেই পূর্বের ১ নং অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। এই একই ব্যায়ামের পাঁচটি পর্যায়ের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হবে। এই ব্যায়ামে এক সঙ্গে সর্বাঙ্গের ব্যায়াম হয় বলে সূর্য নমস্কার সকলের উপযোগী ব্যায়ামরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

**আসন:** এই যৌগিক ব্যায়াম বা আসনই আজ শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামের স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ব্যায়ামের জন্য বিশেষ স্থান, সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি—কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। এই ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের—বিশেষ করে আন্ত্রিক ব্যাধি, দৈহিক ত্রুটি এবং অনেক উপসর্গও দূরীভূত হয়। ক্রমশঃ এই ব্যায়ামের জনপ্রিয়ত্ব' বাড়ছে।

**শবাসন:** সব আসন অভ্যাস করার পর শবাসনে মড়ার মত নিশ্চলভাবে শুয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। এই কারণে এর নাম শবাসন। প্রয়োজনমত ৫।১০ মিনিট শবাসন অভ্যাস করলে ব্যায়ামজনিত অবসাদ দূর হয়।

**বজ্রাসন:** দেহের নিম্নাংশ এই ব্যায়ামে বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও মজবুত হয়, এই কারণে এর নাম বজ্রাসন।

হাঁটু মুড়ে পায়ের পাতা ভূমি সংলগ্ন করে গোড়ালির উপর বসতে হবে। হাঁটু থেকে গোড়ালি বরাবর দেহের পশ্চাৎ ভাগ ন্যস্ত হবে। খাওয়া দাওয়ার পর এই আসন অভ্যাস করলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য দূর হয়, সায়টিকা ও পায়ের বাত ইত্যাদি হয় না। প্রতিদিন মিনিট পাঁচেক এই ব্যায়াম অভ্যাস করা বিধেয়।

**সর্বাঙ্গাসন:** সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই ব্যায়ামের দ্বারা সুস্থ, সবল ও নীরোগ হয়, এই কারণে ইহা সর্বাঙ্গাসন নামে অভিহিত।

এই আসন অভ্যাস একটু অনুশীলন সাপেক্ষ। চিৎ হয়ে শুয়ে, মাথা-ঘাড় ও বাহুর উপর দেহভার ন্যস্ত করে, কোমরে দু'হাতের ঠেকা দিয়ে দু'পা সোজা উপরে উঠিয়া পায়ের দু'পাতা টান-টান করে রাখতে হয়। এই অবস্থায় যাতে থুতনী বুকের উপরে কণ্ঠকূপে সংযুক্ত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। শ্বাস প্রশ্বাস রীতি হবে স্বাভাবিক।

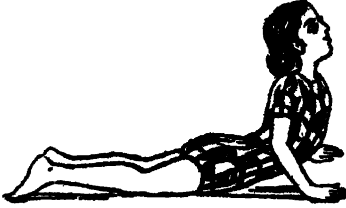
এই আসন প্রথম দিকে ৩০ সেঃ করে বার চারেক অভ্যাস করতে হয় এবং প্রতি-বারের অভ্যাস অন্তে ৩০ সেঃ শবাসনে বিশ্রাম নিতে হয়। যাদের প্লীহা বড় বা হাঁপানী আছে, এই আসন তাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

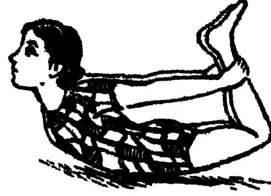
**হলাসন:** দেহমুদ্রা অনেকটা হলাকৃতি হয় বলে, এর নামকরণ হয়েছে হলাসন। এই আসনের প্রস্তুতির জন্য দেহের দু'পাশে হাত রেখে চিৎ হয়ে শুতে হয়। তারপর দু'বাহু আর কাঁধ বরাবর ঘাড়ের উপর দেহভার ন্যস্ত করে এক সঙ্গে দু'পা উঠিয়ে ঘাড়ের নিচে থেকে সমস্ত দেহটা অর্ধ বৃত্তাকারে বেঁকিয়ে মাথার পিছনদিকে ভূমিতে রাখতে হয়। যুক্ত দু'পায়ের অগ্রভাগ মেঝে স্পর্শ করবে। এ সময় শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে চলবে।

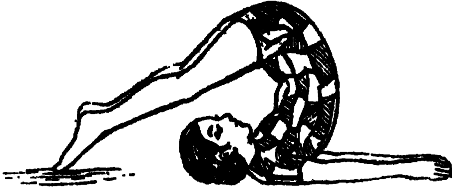
**উষ্ট্রাসন:** এই ব্যায়ামের সময় আসনকারীকে অনেকটা উটের মত দেখতে হয় বলে, এ আসনের নাম **উষ্ট্রাসন**।

হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত দিয়ে পিছনের গোড়ালি ধরে আস্তে আস্তে শরীরটাকে যতদূর সম্ভব ধনুকের মত করে বাঁকাতে হবে। এই অবস্থায় হাঁটু থেকে গলা পর্যন্ত বেশ টানটান থাকবে। মাথা থাকবে নিচের দিকে, থুতনী থাকবে ঊর্ধ্বমুখে। এই আসন বার্ধক্য রোধক, অথচ উচ্চতা বৃদ্ধির সহায়ক।

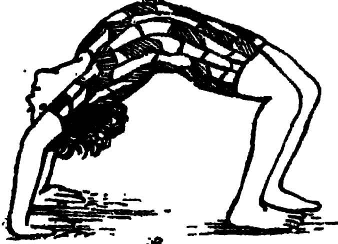
**উৎকটাসন ঃ** অসৌষ্ঠব বসার বলে এই আসনের নামকরণ হচ্ছে উৎকটাসন।


ক


খ


গ


ঘ


ঙ


চ


ছ

বিভিন্ন প্রকারের আসন

সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর পায়ের পাতার অগ্রভাগে দেহের ভারসাম্য রেখে উবু

হয়ে বসতে হবে। দু'দিকে দু'হাত হাঁটুর উপর রেখে শিরদাঁড়া সোজা রেখে সামনের দিকে তাকাতে হবে।

**ধনুরাসন :** উপুড় হয়ে মেঝে শোয়ার পর দু' হাত দিয়ে দু' পায়ের গোছ শক্ত করে ধরে, কোমর থেকে গলা অবধি চাগিয়ে তোলার চেষ্টা নিতে হবে। হাঁটুর সংযোগে পা বাঁকাতে হবে। বুক সোজা, দেহের ভার পেটের উপর ন্যস্ত হবে।

**চক্রাসন :** সোজা দাঁড়ানোর পর যে কোন দিকে বেঁকে সেদিকের হাঁটু স্পর্শ করতে হবে। অপর দিকেও অনুরূপ ভাবে হাঁটু স্পর্শ করতে হবে। আর এক ধরণের চক্রাসনও আছে। যাতে হাতের উপর দেহের ভারসাম্য থাকে।

**ভুজঙ্গাসন :** বুকের দু' পাশে দু' হাতের চেটো মাটিতে রেখে হাত ও পায়ের পাতাকে বিশ্রাম নিতে হয়। তারপর দু' হাতে ভারসাম্য রেখে ধীরে ধীরে বুক উঠাতে হবে, পা দুটো থাকবে বিরামাবস্থায়। ঘাড় বেঁকিয়ে মাথাটাকে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হয়। মাথা একটু বেশী উঠার দরুণ হাতের কনুই একটু বেঁকবে। পাঁচ পর্যন্ত গণনা হ'লে, আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে।

**গোমুখাসন :** এই আসনে অবস্থানকারীর পায়ের অবস্থান অনেকটা গরুর মুখের মত দেখায় বলে এর নামকরণ হয়েছে **গোমুখাসন**।

(ক) এই আসনে দু'বার হাত-পা বদল করতে হয়। প্রথমে দু' পা ছড়িয়ে বসার পর ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে বাঁ হাঁটুর উপর এনে এমনভাবে স্থাপন কর যে, ডান পায়ের গোড়ালি যেন বাঁ দিকে পাছা স্পর্শ করে।

(খ) অতঃপর বাঁ পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে এমন ভাবে ডান হাঁটুর নিচে নিয়ে যাবে যে, বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে ডান পাছা ছোঁয়া যাবে।

(গ) এবার ডান হাত মাথার উপর দিয়ে তুলে কুনুই-এর কাছে ভাঁজ করে পিঠের কাছে নামাতে হবে এবং বাঁ হাত কুনুই-এর কাছে ভেঙে ডান দিকে ঘুরিয়ে ডান হাতের আঙুল ধরতে হবে।

(ঘ) এই ভাবে ২০ সেকেণ্ড থাকার পর পা ও হাত বদলে অর্থাৎ ডান পা নিচে ও বাঁ পা উপরে এমনভাবে হাঁটুর উপরে হাঁটু রাখতে হবে যে, গোড়ালি দিয়ে বিপরীত পাছা ছোঁয়া যায়।

(ঙ) এবার বাঁ হাত কুনুই-এর কাছ থেকে ভেঙে পিঠে নামাতে হবে এবং ডান হাত বাঁ দিকে বেঁকিয়ে এনে বাঁ হাতের আঙুল ধরতে হবে। এবং মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হবে।

(চ) এই ভাবে প্রতি পায়ে তিন বার করে মোট ৬ বার অভ্যাস করতে হবে। এই আসনে সায়টিকা, পায়ের পাত, অর্শ, বিনিদ্রা, মূত্র প্রদাহ প্রভৃতি নিরাময় হয়।

## জিমন্যাস্টিকস্

**সংজ্ঞা :** জিমন্যাস্টিকস কথাটার প্রথম উদ্ভব ও প্রয়োগ গ্রীসে। তখন কথাটার প্রয়োগ হতো "to train in athletic exercises"—এই অর্থে। অর্থাৎ শৈত্যক্রীড়া সংশ্লিষ্ট যা' কিছু ব্যায়ামানুশীলনই ছিল জিমন্যাস্টিকসের অন্তর্গত। তখন দৌড়ানো, লাফানো, বর্শানিক্ষেপ থেকে শুরু করে কুস্তি পর্যন্ত ছিল এই ব্যায়ামের অন্তর্ভুক্ত। আর জিমন্যাষ্টিকস কথা থেকেই জিমন্যাসিয়াম কথাটার উৎপত্তি।

**ইতিহাস :** আজকের এই বিশেষ অর্থে জিমন্যাস্টিকসতে পৌছাতে কয়েক শতাব্দী লেগেছে। সেই রোম সাম্রাজ্যের যুগেই—যখন একাধারে বীর্যবত্তা আর নাইটহুডের অনুশীলন চলেছে, প্রকৃত জিমন্যাস্টিকসের অনুশীলন আরম্ভ হয় রোমে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে জন ফ্রেডারিক গুটুস্ মুথই জিমন্যাস্টিকস আন্দোলনের প্রবক্তা। তিনি ব্যায়াম শিক্ষকরূপে জার্মানীর এক শিক্ষায়তনে পঞ্চাশ বৎসর শিক্ষকতা করেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে তিনি জিমন্যাস্টিকস্-এর প্রপিতামহ নামে অভিহিত। এই প্রসঙ্গে জন পেষ্টালথ্‌সি, ফাদার জন, ফ্রানসিস ম্যার্মস্, পার হেনরিক লিং, ফ্রাঞ্চ্ ন্যাচেট্ গ্যল এবং অ্যাডল্ফ্ স্পাইস্-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি জিমন্যাস্টিকস্-এর পিতা নামে সুপরিচিত।

আর এই উদ্যমের পিছনে এখনও অনেক প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় ভূমিকা আছে, সেই সব সংস্থার মধ্যে ইয়ং ম্যান খ্রীশ্চান্ অ্যাসোসিয়েশন (Y. M. C. A.), আমেরিকান টার্নারস্, সুইচ আমেরিকান জিমন্যাস্টিকস্ অ্যাসোসিয়েশন, আমেরিকান শোকোল-এর নাম করা চলে।

**ব্যায়াম সূচী :** আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক সংস্থা জিমন্যাস্টিকের অন্তর্গত ব্যায়ামটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। সেই বিভাগানুসারে ছেলেদের জন্য ১২টি এবং মেয়েদের জন্য ৮টি ব্যায়াম প্রতিযোগিতার বিষয়রূপে পরিগণিত হয়েছে।

**ছেলেদের প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ :** এই বিষয় সমূহের অন্তর্গত হ'লো—ফ্রী-ষ্ট্যাণ্ডিং এক্সারসাইজ, হরাইজেন্টাল ফিক্সড্ বার, প্যারালেল বার, ভল্ট, রিং। এই বিষয়গুলির এক এক বিভাগের একাধিক বিষয়ের একটি করে আবশ্যিক ও একটি করে ঐচ্ছিক ব্যায়াম করার নিয়ম।

**মেয়েদের প্রতিযোগিতার বিষয়াদি :** মেয়েদের প্রতিযোগিতার বিষয়ভুক্ত হলো :—বিভিন্ন উচ্চমানের প্যারালেল বার, বিম ব্যালান্স, সাইডওয়েজ, আন্‌ পমেল্ড, লংহর্স ও বিটবের্ড সহ।

**ছেলেদের সরঞ্জামাদি :** কাঠ বা লোহার মোটা পাইপে তৈরি খাড়া বার ১ জোড়া কাঠের বার গুলির ব্যাস হবে ৫'১ সেণ্টিমিটার, সমান্তরাল গুলির ব্যাস ৪'১ সেণ্টিমিটার, মাটি থেকে উচ্চতা ১'৭০ মিটার। বারের দৈর্ঘ্য ৩'৫০ মিটার। এই দু' বারের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে ৪২'৪৮ সেণ্টিমিটার।

**হর্স :** লম্বা ১'৬০ মিটার, চওড়া ৮০ সেণ্টিমিটার।

**পমেল্ড হর্স**—হর্সের পিছন দিকটার মাটি থেকে উচ্চতা হবে ১'১০ মিঃ এবং হর্সের পিছন থেকে পমেল্ডের উচ্চতা হবে ১২ সেণ্টিমিটার।

**লং হর্স**—মাটি থেকে হর্সের পিছন দিকটার উচ্চতা হবে ১'৩৫ মিঃ।

**রিং :** মাটি থেকে রিং-এর ফ্রেমের উচ্চতা হবে ৫'৫০ মিটার। রিং এর ব্যাস হবে ১৮ সেণ্টিমিটার। দুই দড়ির মাঝের ব্যবধান হবে ৫০ সেণ্টিমিটার। মাটি থেকে রিংএর দূরত্ব হ'বে ২½ মিঃ।

**ফ্লোর**—খালি হাতে ( দাঁড়িয়ে বা বসে ) ব্যায়াম করার জন্য কার্পেট বা নরম গদি বিছানো সমান স্থানের পরিমাণ হ'বে ১৪ × ১৪ মিঃ। এখানে ব্যবহৃত গদির উচ্চতা হবে ৫'১০ সেণ্টিমিটার।

**বিট বোর্ড :** লম্বা ১২০ সেণ্টিমিটার, সামনের উচ্চতা ১২ সেণ্টিমিটার এবং চওড়া ৬০ সেণ্টিমিটার।

**মেয়েদের সরঞ্জাম :**

**বার :** সব থেকে উচ্চ বারের মাপ হ'বে ২৩০ সেণ্টিমিটার

„ নিচু „ „ ১৫০ „

„ লম্বা „ „ ৩০০ „

ডিম্বাকৃতি বার ৪১ × ৫১ সেণ্টিমিটার।

দুই বারের ভিতরকার দূরত্ব হবে ৪৩ থেকে ৪৮ সেণ্টিমিটার।

**বিম**—উপরের দিকের উচ্চতা হবে ১২০ সেণ্টিমিটার। লম্বায় হ'বে ৫০০ সেণ্টিমিটার।

**বিট বোর্ড :** ১০ সেণ্টিমিটার উচ্চতার একটি শক্ত বিট বোর্ডের প্রয়োজন।

**লং হর্স**—দৈর্ঘ্য ১৬০ সেণ্টিমিটার, উচ্চতা ১১৮ সেণ্টিমিটার এবং চওড়া ৩৫ সেণ্টিমিটার।

**ফ্লোর**—খালি হাতে ব্যায়ামের জন্য ১৪ × ১৪ মিঃ আর গদি ইত্যাদি হ'বে পূর্বের মতন।

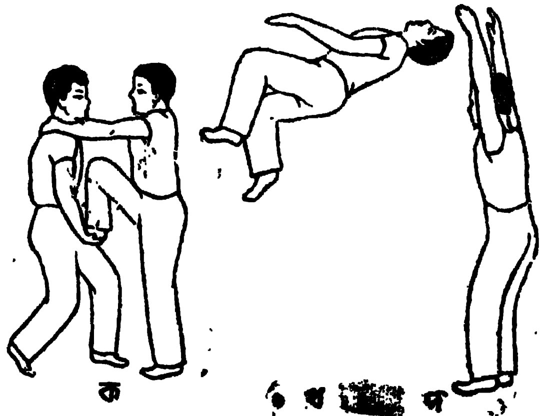
**ডিগবাজী খাওয়া—সামনে ও পিছনে :** জিমন্যাস্টিকসের সঙ্গে যে সব

আনুষঙ্গিক খালি হাতে ব্যায়াম করানো হয়, তন্মধ্যে সোজা ডিগবাজী ও উল্‌টো ডিগবাজিই অন্যতম। ব্যায়ামটি ছেলেমেয়ে উভয়েরই উপযোগী।

সোজা ডিগবাজি খাওয়ার আগে মাটিতে দু'হাঁটুর দু পাশে দু হাত রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসতে হয়। তারপর ঘাড় সমেত মাথাটা নিচু করে দু হাঁটুর মধ্যে মাটির উপর রেখে পিছনের দুপা মাটিতেএকটু জোরে ঠেলা দিলেই গোল পাকানো শরীরটা সামনের দিকে গড়িয়ে যাবে। এরই নাম সোজ ডিগাবাজী বা ফরওয়ার্ড রোল। এইভাবে ক্রমান্বয়ে গড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে যাওয়া যায়।

**পিছন ডিগবাজী ঃ** এটা ঠিক আগের পদ্ধতির উল্‌টো প্রক্রিয়া। এখানে পিছন ফিরে ভাঁজ করা দু' হাঁটুর দু' পাশের মাটিতে হাত রেখে, সামনের দিকে ঝুঁকে শরীরটাকে একটু দুলিয়ে পা দিয়ে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে পিছনে উলটে যাওয়া যায়। এইভাবে পরপর অনেকগুলি উলটো ডিগবাজি খাওয়া যায়। ব্যায়ামের প্রস্তুতি ও যে কোন শারীর শিক্ষার পরীক্ষার জন্য এই দুটো অপরিহার্য।

**উল্‌টো ডিগবাজি বা সামার সল্ট**—উল্‌টো ডিগবাজী বা সামার সল্ট জিমন্যাস্টিক্সের প্রাথমিক ব্যায়ামগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কঠিন পর্যায়ের ব্যায়াম। এর জন্য একজন সঙ্গীর দরকার হয়। এই সাহায্যকারী বা ক্ষেপণকারীর picther কাজ। উল্‌টো ডিগবাজী খাওয়ার আগে নিক্ষেপকারীর আঙুলে আঙুলে জোড়া দু' হাতের তালুতে যেকোন পা রাখতে হবে। তারপর যখন ঐ সাহায্যকারী যে ডিগবাজী খাবে, তাকে উঁচু করে তুলবে, সে তখন তার বাঁ-পাটা সোজা না করার সঙ্গে নিক্ষেপকারী তাকে একটা ঝাঁকুনি দেবে, অমনি সে পিঠটা বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে লাফ দেবে এবং আস্তে আস্তে ঘুরে গিয়ে নিজের দু' পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। ব্যায়ামটি খুবই শক্ত এবং অনুশীলন সাপেক্ষ।



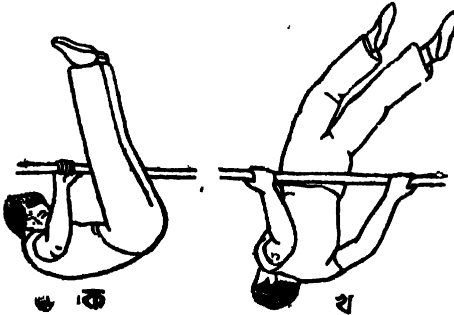
উলটো ডিগবাজী বা সামার সল্ট

## হরাইজোন্টাল বার

হরাইজোন্টাল বারের উচ্চতা অনেক বলে, এই বারে আরোহণ করতে হয়। আজকাল অবশ্য এর নাম হয়েছে উঁচুবার (High bar)। এই উঁচু বারে ব্যায়াম

করতে হলে একাধারে শক্তি ও কলাকৌশল এবং সহযোগিতার প্রয়োজন হয় বেশী। মাটি থেকে এই বারের উচ্চতা হবে ৭´ ৯´´ বা ২.৩৬ মিটার।

এইভাবে একাধিকবার আরোহণ ও অবতরণের দ্বারা মূলতঃ বাহুদ্বয়েরই ব্যায়াম হয়। কিভাবে হরাইজোন্টাল বারে আরোহণ করতে হয়, নিচে তার দু'টি প্রণালী দেখানো হয়েছে। যথা (ক) সোজাসুজি (front pull-over) ও পিছন দিয়ে (back pull over)।

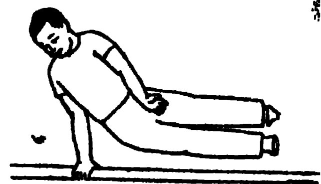



আরোহণ পদ্ধতি (ক) সোজাসুজি
(খ) পিছন দিয়ে

হরাইজোন্টাল বারের খেলার অধিকাংশ হলো দোল-খাওয়া অথবা ঘুরপাক খাওয়া ধরণের। এই উঁচু বারের খেলাগুলোকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা—রিং-সুইরিং, জ্যাক নাইফ শরীরকে চাগিয়ে তোলা, পা বাঁধিয়ে মাথা নিচের দিকে করে ঝোলা ( বাদুড় ঝোলা ), হাঁটু লাগিয়ে ঘোরা ( নী-সারকেল ফরওয়ার্ড ) ও হিপ সারকেল।

এর কোন ব্যায়ামটাই নিজে নিজে করা যায় না; কাজেই একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে করা উচিত।

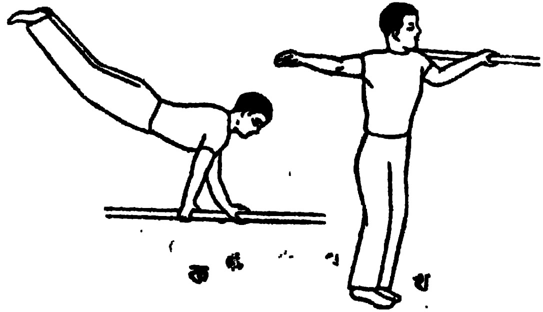
**প্যারালেল বার ঃ** প্যারালেল বারের খেলাই জিমন্যাষ্টিক্সের অন্তর্গত একটি সুপরিচিত ব্যায়াম। এর সবগুলিই প্রায় দেহভারসাম্য রক্ষার খেলা। কাঠের ফিক্সড্ বারের খাড়াগুলির ব্যাস ৫.১ সেন্টিমিটার আর সমান্তরাল গুলির ব্যাসের পরিমাণ ৪.১ সেন্টিমিটার। মাটি থেকে উচ্চতার পরিমাণ হবে ১.৭০ মিটার। বারদণ্ডের দৈর্ঘ ৩.৫০ মিটার। সমান্তরাল দুই বারের মধ্যের দূরত্ব হবে ৪২.৪৮ সেন্টিমিটার।



পার্শ্বারোণ

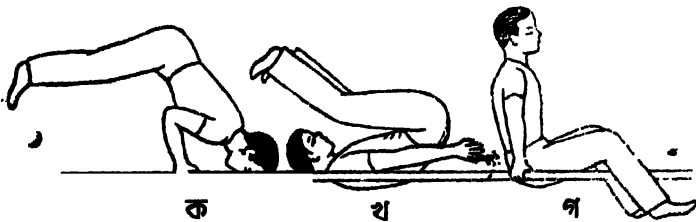
প্যারালেল বারের খেলা শিক্ষার গোড়ার কথাই হ'চ্ছে ঠিক মতন নামা উঠার অভ্যাস করা। এই ব্যায়ামে দৃঢ়-ভাবে বারদণ্ড দুটিকে ধরার অভ্যাস বা গ্রিপিং শিক্ষারই দরকার সর্বাগ্রে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে শিক্ষা করতে হয় দোলার অভ্যাস (swing)।

বারে ওঠার পদ্ধতি—মোটামুটি চারটি পদ্ধতিতে বারে ওঠানামা করতে হয় যথা—ওঠার পদ্ধতি—(১) সামনে দিয়ে ওঠা (২) পিছন দিয়ে ওঠা (৩) পাশ থেকে লাফিয়ে ওঠা (৪) দু'বারের উপর আড়া আড়ি ভাবে পা তোলার জন্য ওঠা এবং সিজার মাউণ্ট।




লাফ দিয়ে ডান দিকে অবতরণের ভঙ্গী

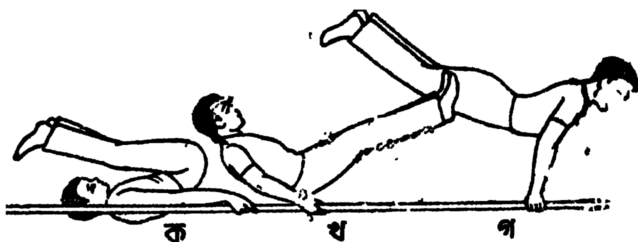
নামার পদ্ধতি: (১) পিছন করে নামা (২) লাফ দিয়ে নামা (৩) লাফ দিয়ে পিছন দিকে নামা (৪) কাঁধের উপর দাঁড়ানো অবস্থা থেকে নামা বারের উপরে কৃত্যালি—এই কৃত্যালিগুলিকে মোট আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) শরীর দোলান (২) পা ফাঁক করে বসা (৩) এক পাশ থেকে অন্য পাশে আসন বদল করা (৪) সিজার্স টার্ণ (৫) পিছনে সিজার টার্ণ, (৬) পা ফাঁক করে বসা ও সামনে ডিগবাজী (৭) কাঁধের উপর দেহ ভার ন্যস্ত করা (৮) হাতের উপর দেহভার ন্যস্ত করে শরীর দোলানো (৯) শোয়া অবস্থা থেকে শরীর ওঠানো (১০) হাতের উপর ন্যস্ত দেহভার নিয়ে অবতরণ।




সামনে পিছনে ডিগবাজী

প্যারালেল বার-এর ব্যায়ামে ঊর্ধাঙ্গ পুষ্টিলাভ করে, কিন্তু নিম্নাঙ্গ কৃশ হয়ে যায়। এই কারণে এই সঙ্গে ডন বৈঠক দিয়ে পায়ের ব্যায়াম করতে হয়। দ্বিতীয় কথা এই যে, বারের খেলাগুলি মাত্রায় ভারসাম্যের ব্যায়াম। তা

ছাড়া যেমন কঠিন, তেমনি বিপদের সম্ভাবনাও থাকে। এই কারণে উপযুক্ত



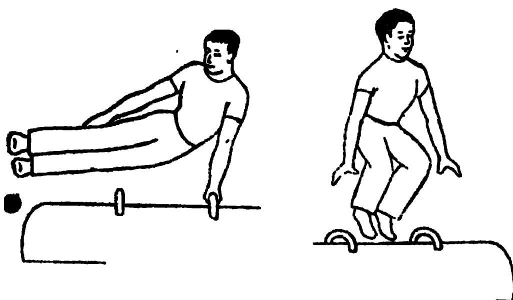

হাতের জোরে শরীর ওঠানো

বিচক্ষণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধান ছাড়া এই ব্যায়াম করা উচিত নয়।

## ভল্ট বা কাঠের ঘোড়া ডিঙানো ব্যায়াম

**ভল্ট** বা ভারসাম্য রক্ষার ব্যায়াম। জিমন্যাষ্টিকসের প্রস্তুতি-পর্ব হিসাবে এর কদর। এই ব্যায়ামে কলাকৌশলের যে চমক আছে, তা' সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ব্যায়াম একা করাটা নিরাপদ নয়; কারণ অপরের সাহায্য-নির্ভর এই ব্যায়াম।

খালি হাতে ডিগ্‌বাজী যাওয়ার সময় যেমন একজন সাহায্যকারীর দরকার হয়, এখানে ভল্ট বক্স বা কাঠের ঘোড়া সেই কাজ করে। সাধারণতঃ এই ধরণের ভল্ট বক্সের সাহায্যে ছ'টি ভঙ্গীমায় লাফানো যায়। যথা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লাফানো (খ) সামনে থেকে ডান দিকে লাফানে। (গ) পিছন থেকে ডা[illegible] দিকে লাফানো (ঘ) উবু হয়ে বসার ভঙ্গীতে লাফানো (ঙ) উবু হয়ে পা ফাঁক করে লাফানো।



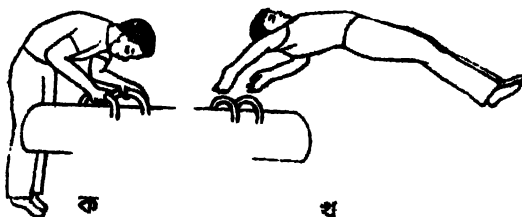
(১) বাঁ দিক থেকে ডান পাশে লাফানো

(২) উবু হয়ে লাফিয়ে দাঁড়ানো

এখানে দু'টি লাফানো ভঙ্গীর সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। যথা—(১) ডান পাশে লাফানো, (২) উবু হয়ে লাফিয়ে দাঁড়ানো ও হেড ষ্ট্যাণ্ড ভল্ট। প্রথম ব্যায়ামটি ভারসাম্য রক্ষামূলক একটি সহজ ব্যায়াম। দ্বিতীয় ভারসাম্যের

ব্যায়ামটি বেশ জটিল ও কঠিন। তবে এজাতীয় ভারসাম্য রক্ষার খেলা, অভ্যাস নির্ভর এবং অনুশীলন সাপেক্ষ।

(১) **ডানপাশে লাফানো:** এই লাফটা হবে বাঁ দিক থেকে ডান পাশে। প্রথমে ভল্ট বক্সের মুখোমুখি হয়ে সাবধান অবস্থায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে হ'বে। অতঃপর ঐ বক্সের দিকে অগ্রসর হয়ে বক্সের আংটা দু'টো দু'হাত দিয়ে শরীরটাকে উপরে উঠিয়ে পা' দুটোকে ডানদিকে দোলালে দেহ-ভার হাতের উপর স্থানান্তরিত হবে। তখন



হেড্ ষ্ট্যাণ্ড ভল্ট

সেই দেহাংশটা ভল্ট বক্স অতিক্রম করে তার ডানদিকের শেষভাগে পৌঁছাবে। সেখান থেকে দু'পা যখন এপিঠের ম্যাট স্পর্শ করবে, তখন হাতের ধরা আংটা দুটো ছেড়ে দিলেই লম্ফনকারীর দেহটা সোজা এসে ম্যাট বা মাটিতে অবতরণ করবে। অনুরূপভাবে ডানদিকে অবতরণ করার সময়কার লম্ফনকারীর ডানদিকে থাকবে ভল্ট বক্স, এবং তার অবস্থান হবে কাঠের ঘোড়ার বা ভল্ট বক্সের বাঁদিকের শেষ প্রান্তে।

এ ব্যায়ামে কিছুটা বিপদের আশঙ্কা থাকায়, ব্যায়াম শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে কখনই একা একা অংশগ্রহণ বা অভ্যাস করতে যাওয়াটা যুক্ত সঙ্গত নয়।

---

## শৈত্য-ক্রীড়া বা অ্যাথ্লেটিক্স

**ইতিহাস:** আজকাল মাঠেময়দানে শৈত্য ক্রীড়ার যে অনুশীলন চলে, তার গোড়া পত্তনের ইতিহাস আমরা ক'জনেই বা জানি? গ্রীক-সভ্যতার অভ্যুত্থানের আগে ক্রীড়া বিবর্তনের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু জানা যায় যে, একদা যে কৌশল ছিল আত্ম-রক্ষার উপায়, তা' দ্রষ্টব্য কলাকৌশল রূপে আত্ম প্রকাশ করে স্পার্টান সভ্যতার যুগে। তাঁরা শরীরচর্চ্চা করতেন দেশ ও দেহের জন্য। তখন দৌড়ানো, লাফানো, ডিসকাস বা বর্শা নিক্ষেপই ছিল রণ কৌশলের অন্তর্গত আর এখানেই শৈত্য-ক্রীড়ানুশীলনের গোড়া পত্তন।

এতে গ্রীসদেশবাসীর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এর জন্য ছিল কত সমারোহ—খেলাধূলা, উৎসব, আর বিচিত্র নৃত্য-গীত। সেই সব উৎসবাদির মধ্যে

ডায়নোসিয়া, ইলুসিনিয়া এবং প্যান-হেলেনিক পার্বণের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম প্যান হেলেনিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে অলিম্পিয়া পাহাড়ে। প্রতি চার বৎসর অন্তর এই ক্রীড়ানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হ'তো। ৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি চালু থাকার পর সম্রাট থিয়োডো সিউশ তা' বন্ধ করে দেন।

তারপর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পি-ডে কুবাটিন নামে ফরাসী দেশীয় জনৈক ব্যারণের চেষ্টায় অলিম্পিক উৎসবের পুনপ্রবর্তন ঘটে। ৭৮৬ বৎসর পরে সেই যার শুভ সূচনা হয়েছিল, আজ তা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রতি চার বৎসর অন্তর বিশ্বের সকল দেশের হাজার হাজার প্রতিযোগী আর লক্ষ লক্ষ দর্শক আনন্দ-উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে অংশ গ্রহণ করছে এবং অংশিদার হ'চ্ছে সেই সুপ্রাচীন ক্রীড়ানুষ্ঠানের আদিম ঐতিহ্যের।

**শৈত্য-ক্রীড়া পরিচালনার ব্যবস্থাপনা:** বার্ষিক শৈত্য-ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনার জন্য কোন্ কোন্ বিষয়-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি করতে হ'বে, নিম্নে তার একটা সংক্ষিপ্ত নির্দেশনামা দেওয়া গেল। যথা—(ক) পরিচালকমণ্ডলী গঠন, (খ) প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণ, (গ) প্রতিযোগিতার নিয়ম প্রণয়ন।

**(ক) পরিচালকমণ্ডলী:** বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা বা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের আহুত সভায় অধিকাংশ সভ্য বা শিক্ষিক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে যে কার্যকরী পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হ'বে, নীচে তার নামের তালিকা দেওয়া হ'ল। যথা—

একজন পরিচালকমণ্ডলীর সাধারণ ম্যানেজার বা কর্মকর্তা,

একজন সম্পাদক।

একজন বিশেষজ্ঞ বা টেক্‌নিক্যাল ম্যানেজার,

একজন ট্রাক পরিচালক,

একজন ভ্রমণ-প্রতিযোগিতার পরিচালক,

চারজন (অথবা ততোধিক) ট্রাক্ ইভেণ্টসের বিচারক,

চারজন (অথবা ততোধিক) ফিল্ড্ ইভেণ্টসের বিচারক,

চারজন ভ্রমণ-প্রতিযোগিতার বিচারক,

চারজন (অথবা ততোধিক) ট্রাক ইভেণ্টসের পর্যবেক্ষক,

তিনজন (বা ততোধিক) সময়-নির্ধারক,

একজন (অথবা একাধিক) আরম্ভকারী,

একজন (বা একাধিক আরম্ভকারীর) সাহায্যকারী,

একজন ( বা একাধিক ) পদক্ষেপ-পরিমাপক,

একজন লিপি-নিবেশক,

একজন ঘোষক

একজন সর্বাধিনায়ক

(খ) প্রতিযোগিতার বিষয় :

শৈত্য-ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়গুলিকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা হ'য়েছে। যথা—(১) ট্রাক ইভেন্টস্, (২) ফিল্ড ইভেন্টস্, (৩) দূর পাল্লার দৌড়, (৪) ভ্রমণ-প্রতিযোগিতা, (৫) সাঁতার প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

(১) ট্রাক ইভেন্টসের অন্তর্ভুক্ত হ'চ্ছে :—সোজা দৌড়, প্রতিবন্ধক দৌড় বা হার্ডলস্,—( ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ) ট্রাকে দৌড়, রিলে রেস, দূর পাল্লার ম্যারাথন রেস বা দেশ-দেশান্তরে দৌড় প্রভৃতি।

(২) ফিল্ড ইভেন্টস্এর মধ্যে পড়ে—উচ্চ লম্ফ, দীর্ঘ লম্ফ, পোল ভল্ট, হপ্ স্টেপ এ্যাণ্ড জ্যাম্প প্রভৃতি ; আর নিক্ষেপণ প্রতিযোগিতার অন্তর্গত হ'চ্ছে—বর্শা ছোড়া, গোলা নিক্ষেপণ, হাতুড়ি ছোড়া, ডিসকাস্ নিক্ষেপণ, ক্রিকেট বল ছোড়া প্রভৃতি।

(৩) দূর পাল্লার দৌড়—ম্যারাথন রেস, সাইকেল রেস্ প্রভৃতি।

(৪) ভ্রমণ-প্রতিযোগিতা—পদব্রজে ৫—১৫ কি. মি. পর্যন্ত হ'তে পারে।

(৫) সাঁতার-প্রতিযোগিতার অন্তর্গত হ'ল ( অবশ্য অলিম্পিকের ক্ষেত্রে)—১০০ মিটার থেকে ১৫০০ মিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা—সাঁতার কাটার পদ্ধতি—ফ্রি স্টাইল, ব্রেস্ট স্ট্রোক্, বাটারফ্লাই স্টাইল, চিৎ সাঁতার বা ব্যাক্ স্ট্রোক প্রভৃতি। এ ছাড়া নানা রকম ডাইভ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এ ছাড়া, প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয় বাঁধাধরা ট্রাক ও ফিল্ড ইভেন্টস্ ব্যতীত শৈত্য-প্রতিযোগিতার বাড়তি বিষয়রূপে নিম্নলিখিত ( অঞ্চলবিশেষে কিছুটা পৃথক হ'লেও ) বিষয়গুলি প্রায়শঃ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যথা—প্রতিবন্ধন দৌড়, দড়ি টানাটানি, লেবু দৌড়,বোরা দৌড় তে-পায়ে দৌড়, আলু দৌড়া,সূচে সুতো পরানো দৌড়, চামচে মার্বেল নিয়ে দৌড়, অঙ্ক দৌড়, মিউজিক্যাল চেয়ার, সাইকেল রেস ( আস্তে বা জোরে ), স্কিপিং—দড়ি নিয়ে দৌড় বা দীর্ঘ সময় লাফানো, আর কৌতুক প্রতিযোগিতা—কলসী ভাঙা, ( চোখ বেঁধে ), বহুরূপী বেশ বিন্যাসের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

**প্রতিযোগিতার ( অংশ গ্রহণের ) নিয়ম :** প্রতিযোগীদের বয়স এবং

উচ্চতা অনুসারেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নলিখিত (সাধারণতঃ) তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(ক) সিনিয়ার, ইণ্টারমিডিয়েট এবং জুনিয়ার গ্রুপ (বড়, মাঝারি ও ছোটদের বিভাগ)। নিম্নে শ্রেণী-বিভাগের ব্যবস্থা-পত্র দেওয়া গেল :—

| | বিভাগ | উচ্চতা | | বয়স |
|---|---|---|---|---|
| (১) | বড়দের বিভাগ | ১'৬ | মিটারে | ১৬ বৎসরের উর্ধ্ব |
| (২) | মাঝারি দল | ১'৫মি. | মি.বা নীচে | ১৩-এর উর্ধ্বে ১৬-এর নীচে |
| (৩) | ছোটদের বিভাগ | ১'৫ মি. | বা নীচে | ১০—১৩ বৎসর |
| (৪) | বালক বিভাগ | ১'৩৭ মি. | বা নীচে | ১০-এর নীচে |

মেয়েদের ক্ষেত্রেও এই শ্রেণী-বিভাগ প্রযোজ্য; তবে অনুষ্ঠান-সূচীতে বিষয়গত কিছু কিছু ভেদ থাকতে পারে (বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর ক্ষেত্রে)। যেমন—মিউজি-ক্যাল চেয়ার, চামচে মার্বেল নিয়ে দৌড়, সূচে সূতো পরানো দৌড়, কলসী ভাঙা (চোখ-বাঁধা অবস্থায়), স্কিপিং দড়ি নিয়ে লাফানো প্রভৃতি প্রতিযোগিতা।

আর একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হ'বে যে, প্রতিযোগীর সংখ্যা (বিশেষ করে ট্রাক ইভেণ্টসের ক্ষেত্রে) বেশী হ'লে, এমনভাবে 'প্রাথমিক বাছাই' বা হিট করে নিতে হবে, যাতে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার দিন ৬ জনের বেশী প্রতিযোগী যেন না থাকে।

**সরঞ্জাম ঃ** শৈত-ক্রীড়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সরঞ্জামগুলির বিশেষ প্রয়োজন। যথা—(১) ১০০ মিটার একটি টেপ, (২) একটি ৫০ মিটার স্টিল টেপ, (৩) ৪টা বাঁশী, (৪) একটি আরতির ঘণ্টা, (৫) একটি পেটা ঘণ্টা, (৬) একটি স্টপ্ ওয়াচ, (৭) ৫টি চোঙ (মুখে দিয়ে কথা বলার), (৮) একটি নারিকেলের মোটা দড়ী, (৯) রেডক্রশের একটি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স, (১০) ৬ জোড়া স্কিপিং দড়ি, (১১) ১০ মিটার রিবন ফিতা, (১২) ছোট রুমালের মতো চৌকো কাপড়ের টুকরোর উপর ছাপা প্রতিযোগীদের ক্রমিক সংখ্যা ১৫০টি (১৩) ৫টি গুটি সূতা, (১৪) ২টি বর্শা, (১৫) তিনটি পোল দণ্ড, (১৬) একটি ১৫—২০ কেজি লৌহ গোলা, (১৭) একটি ডিস্কাস্, (১৮) একটি ভারী মুগুর (১৯) উচ্চলম্ফের সরঞ্জাম, (২০) পোল ভল্টের সরঞ্জাম, (২১) ১০ কেজি চুন, (২২) দুই ঝুড়ি কমলালেবু, (২৩) এ ছাড়া পতাকা রেসের ব্যাটন্ প্রভৃতি অন্যান্য টুকি-টাকি জিনিষ (প্রয়োজনবোধে যা দরকার), (২৪) বিজয়-স্তম্ভ প্রভৃতি।

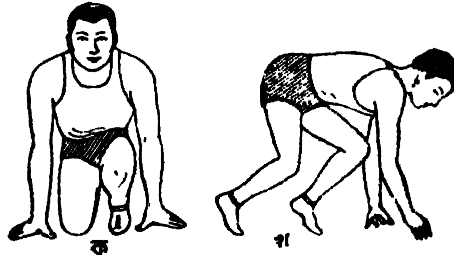
**দৌড়ের ট্র্যাক ও লেন ঃ** ১১০ মিটারের বেশী দৌড়গুলি সাধারণতঃ

ট্র্যাকে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই দৌড়ের ট্র্যাকের ম্যাপ ২৪´ ফুট বা ৭·৩২ মিটারের কম হ'লে চলে না। ঘাসের উপর চুনের ট্র্যাক যাতে সঠিকভাবে প্রতিযোগীদের চোখে পড়ে সেজন্য প্রতি পাঁচ গজ বা ৪·৫৭ মিটার অন্তর অন্তর রঙিন নিশান পুঁতে রাখতে হয়।

(খ) দৌড়ের লেনের চওড়া কমপক্ষে ১·২২ মিটার বা ৪ ফুট আর বেশীপক্ষে ১·২৫ মিঃ (৪½ ফুট) হওয়া উচিত।

**দৌড়ের আরম্ভ ও সমাপ্তি :** (ক) দৌড়ের পূর্বে রেখা স্পর্শ করে দাঁড়াতে হয়, তার নাম আরম্ভ রেখা। ৫ সেন্টিমিটার বা ২ ইঞ্চি চুন বা চকের রেখা টেনে দৌড়ের আরম্ভ ও সমাপ্তি সীমা চিহ্নিত করে রাখতে হয়।

(খ) সমাপ্তিরেখার দুদিকের ট্র্যাক থেকে ৩০ সেন্টিমিটার দূরে দুটি সাদা দণ্ড পুঁততে হয়। ঐ দুই দণ্ডের এদিক থেকে ওদিক অবধি যে লাল ফিতে আটকানো থাকে, দৌড় শেষ করার সময় যে প্রতিযোগী সর্বাগ্রে বুক দিয়ে ঐ ফিতা স্পর্শ করতে পারবে, সেই বিজয়ী হওয়ার সম্মান লাভ করে।




দৌড়ানোর আগে অবস্থানের ভঙ্গী

**দৌড় আরম্ভের নিয়ম :** অন ইওর মার্কস্ বলার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়বীররা গিয়ে নিজ নিজ আরম্ভ রেখা স্পর্শ করে উবু হয়ে বসবে। তারপর 'সেট বলে নিশ্চল সতর্ক অবস্থায় (খ) ছবির মত আরম্ভ রেখায় হাত দিয়ে দৌড়বীরকে দাঁড়াতে হয়। সেটের পরেই পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে হ'বে।

**প্রতিবন্ধক দৌড় বা হার্ড্‌ল রেস :** দৌড়ের দূরত্ব (এবং স্ত্রী পুরুষ ভেদে) অনুসারে হার্ডলগুলির উচ্চতা বিভিন্ন হয়ে থাকে। চওড়াটা অবশ্য থাকে ৩ফুট ১১ ইঞ্চি বা ১·১৯ মি. প্রতি দৌড়ে ১০টি হার্ডল দৌড়ানোর সময় লাফিয়ে পার হতে হয়।

পুরুষদের জন্য যথাক্রমে ১১০, ২০০ এবং ৪০০ মিটার ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের হার্ডল রেস ১০০ এবং ২০০ মিটারের বেশী হয় না।

**দৌড়ের পুর্ব পর কি করতে হয়ঃ** সোজা দৌড়ে সাফল্যলাভের জন্য প্রারম্ভিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। ভালো স্টার্ট নেওয়ার উপরই সমাপ্তির সাফল্য নির্ভর করে অনেকখানি। প্রথমে দৌড়ানোর দাগে সজাগ ও সতর্ক হয়ে দাঁড়াতে হয়। আরম্ভের ঠিক পূর্বে স্টার্ট লাইনের ১ মিটার পিছনে দাঁড়াতে হয়। 'প্রস্তুত হও' বলার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে স্টার্ট লাইন স্পর্শ করতে হবে (ছবি দ্রষ্টব্য)। তখন কনুই থেকে হাত দুটো অল্প বাঁকা অবস্থায় থাকবে, দেহ থাকবে ধনুকের মতো বাঁকা অবস্থায়। হাত কিছুতেই কাঁধের উপরে উঠবে না। দৃষ্টি থাকবে সামনের নিশানা-খুঁটিতে নিবদ্ধ। স্টার্ট নেওয়ার সময় পিছনের পা দিয়ে পিছনের গর্তে সজোরে আঘাত করতে হয়। আরম্ভের সংকেতের সময় দেহ-মনের সক্রিয় সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। খুব জোরে পিছনের পা দিয়ে গর্তে আঘাত ক'রে স্টার্ট নেওয়ার পর প্রায় ২৭'৪৩ মিটার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যাওয়ার পর সোজা হয়ে পূর্ণ দমে প্রাণপণে ছুটতে হবে। এই কাউচ্ স্টার্টের জন্য অনুরূপ প্রণালীতে স্টার্ট লাইনের পিছনের গর্তে আঘাত ক'রে ছুটবার বিশেষ অনুশীলন করতে হয়। এর জন্য নিয়মিত স্কিপিং, পায়ের ব্যায়াম প্রভৃতি করতে হয়।

**দীর্ঘ লম্ফনঃ** ভালো ভালো লাফিয়েরা সাধারণতঃ দু'রকম পদ্ধতিতে লাফিয়ে থাকেন। প্রথমটি হ'ল লাফাবার পর পা দুটিকে ভেঙে এবং দেহের উপরাংশকে কিছু সামনে ঝুঁকিয়ে গুটিসুটি মেরে শূন্যে ভেসে যাওয়া; দ্বিতীয়টি হ'ল দৌড়ানোর ভঙ্গী প্রায় সম্পূর্ণ বজায় রেখে শূন্যে কয়েক বার পদক্ষেপ করা। এই দু'রকম পদ্ধতিতেই লাফ শেষ ক'রে বালিতে পড়বার সময় মোটামুটি একই রকম প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। লাফানো প্রক্রিয়ার দুটি ভাগ—(ক) দৌড় ও (খ) লাফ। এর জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। প্রস্তুতির পদ্ধতিটি নিম্নরূপ :—

(১) বার বার দৌড়ে এমন ক'রে নিজেকে তৈরি করতে হবে, যাতে ৩০'১৭ - ৩৮'৫ মিটার পাল্লা কয়েক বার দৌড়ানোর পরও দম পুরোমাত্রায় বজায় থাকে; তক্তা বা টেক অফ্ লাইনের ৫—৬ মিটার কাছে এসে যাতে সম্পূর্ণ গতিবেগের সঞ্চার হয়, তা-ও দেখতে হবে। এই সঙ্গে হুশিয়ারী চিহ্ন দুটির উপর পা ও লম্ফন-তক্তার ৫—৭ সে. মি. পিছনে গোড়ালি ফেলাও রপ্ত করে নিতে হ'বে। (২) গতিবেগ বাড়ানো, পায়ের মাপ ঠিক রাখা,

সোজাসুজি দৌড়ানো প্রভৃতি আয়ত্ত করবার জন্য ভালো দৌড়বীরদের সঙ্গে বার বার দৌড়ান উচিত। (৩) অধিকাংশ ভালো লাফিয়ে শেষের এক বা দুটি পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য ১৫—৩০ সে. মি. পর্যন্ত কমিয়ে দেন। (৪) লম্ফনকারীর পায়ের গোড়ালি তক্তার ৫—৭ সে. মি. পিছনে পড়ে। লাফ দেবার অব্যবহিত আগে এমনভাবে সামনে ঝুঁকে পড়তে হয় যাতে দেহের ভার পায়ের উপর ন্যস্ত হয়। (৫) লাফাবার সময় ৪৫ ডিগ্রী কোণে মাটি ছেড়ে দৌড়ের গতি-ভঙ্গী মোটামুটি বজায় রেখে পদক্ষেপ করতে অর্থাৎ পা বদলাতে হয়। নামবার সময় হলে দু'পা একত্র করে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বালির উপর গোড়ালি ফেলে হুমড়ি খেয়ে সামনে ছিটকে পড়তে হয়। (৬) লাফানোর আগে ধীরগতিতে কিছুদূর দৌড়ে শরীরটাকে তৈরি করে নেওয়া দরকার, অন্যথায় শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে (৭) বালি থেকে উঠে আসবার সময় বালুকা-ক্ষেত্রের সামনে দিয়ে না এসে একটু ঘুরে পিছন দিক দিয়ে আসা উচিত।

**উচ্চ উল্লম্ফন :** উচ্চ উল্লম্ফন বেদিকার পরিমাপ হবে চওড়ায় ১৬´ বা ৪·৮৮ মি., লম্বায় ১০´ বা ৩·০৫ মি. এবং ২´ বা ৬১ সেমি. গভীর-বালি মাটিতে পূর্ণ।

দুই খুঁটির মধ্যবর্তী ব্যবধানের দূরত্ব ১২´ ফুট বা ৩·৬৬ মি.। কতটা উঁচু থেকে লাফানো আরম্ভ হবে, তা বিচারক মণ্ডলী স্থির করবেন। প্রতি ক্ষেত্রে অর্থাৎ ধাপ পর হওয়ার সময় তিনবার করে লাফানোর সুযোগ দেওয়া হয়।

তিন রকম পদ্ধতিতেই উচ্চ উল্লম্ফন প্রক্রিয়া সাধিত হয়। এক হচ্ছে সিজার কার্ট; ইস্টার্ণ কার্ট অফ্‌ এবং ওয়েস্টার্ন রোল। বিশ্বজয়ী উল্লম্ফনকারীদের অনুসৃত প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করলে বেশ বুঝা যায় যে, খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ তাঁরা দুটি প্রধান পদ্ধতির মধ্যে যে-কোন একটির অনুসরণ করে থাকেন। অশিক্ষিত উল্লম্ফনকারীরা সাধারণতঃ সিজার কার্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। ঠিক কোন্ পদ্ধতি কার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হবে, তা বলা কঠিন। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করে উল্লম্ফনকারীকেই তা বেছে নিতে হয়। ওয়েস্টার্ন রোল পদ্ধতিতে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে।

বুঝানোর সুবিধার জন্য আমরা উল্লম্ফকারীর বাঁ-পা-টিকে লাফানোর পা এবং অপর পা-টিকে আরম্ভিক পা বলে ধরে নেব। যাঁরা অন্যভাবে পা ব্যবহার করবেন, তারা বাঁ-স্থানে ডান ও ডান-স্থানে বাঁ পড়বেন।

প্রথমে উল্লম্ফন ডাণ্ডার বেশ কাছে গিয়ে সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ডান পা-কে সোজাসুজি ওপর দিকে ছুঁড়ে দেখতে হবে যে, যেখানে দাঁড়ানো হয়েছে,

সেটা কাছে—না দূরে। যদি বেশী কাছে হয়, তা হলে পা ডাণ্ডার লেগে যাবে; আবার যদি বেশী দূর হয়, তাহ'লে লাফের সর্বোচ্চ বিন্দুটি ডাণ্ডার ঠিক ওপর বরাবর না হওয়ায় নীচে পড়বার সময় ডাণ্ডার গা ঘেঁষে পড়তে হবে। সুতরাং এমন জায়গায় লম্ফন-চিহ্নটি ঠিক করা দরকার যে, সেখানে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পা সোজাসুজি ওপরে তুললে ডাণ্ডাটি যেন আঙুলের ডগা থেকে ৩.৪ ইঞ্চি বা ১০ সেমি. দূরে থাকে। লাফাবার প্রক্রিয়া-ভেদে সাধারণতঃ লম্ফন চিহ্নটি ডাণ্ডা থেকে ২০″—২৪″ বা ৫১—৬১ সেমি. দূরে থাকে। লম্ফন-চিহ্নটি ঠিক করার পর সেখান থেকে উল্টো মুখে ২৪ থেকে ২৭ ফুটের বা ৭.৩২ মি. থেকে ৮.২৩ মি. মাথায় হুঁশিয়ারী চিহ্ন রেখে আরও ১২ থেকে ১৩ ফুট বা ৩.৬৬ মি. থেকে ৩.৯৬ মি. এগিয়ে আরম্ভিক চিহ্ন স্থাপন করতে হয়। আরম্ভিক চিহ্নটি মোটামুটি ডাণ্ডার মাঝামাঝি স্থান বরাবর রাখা উচিত।

ঐ তিনটি বিষয় মোটমুটিভাবে ঠিক করার পর, বার বার দৌড়ে ওগুলিকে দরকারমতো আগু-পিছু সরিয়ে এমন নিখুঁতভাবে ঠিক ক'রে নিতে হবে যে, চোখ বুজে দৌড়ালেও যেন পা এধার-ওধার না পড়ে।

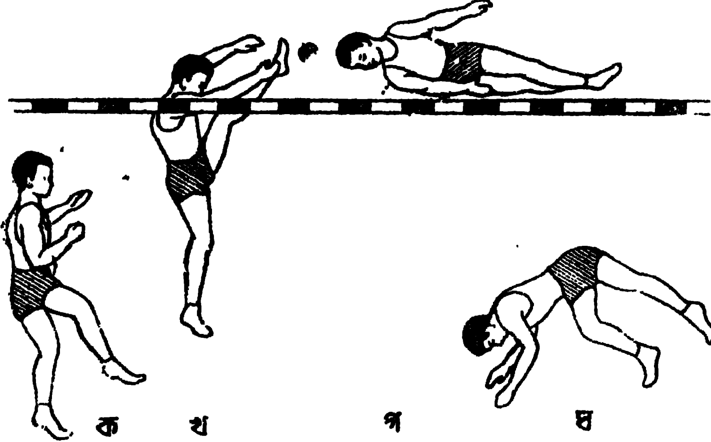
লাফানোর কৌশল আয়ত্ত করার জন্য নিম্নলিখিত অভ্যাসের বিশেষ অনুশীলনের দরকার; যথা—

(১) সব সময় একই মাপের পা ফেলে লম্ফন চিহ্নে পৌঁছোবার অভ্যাস করা উচিত। (২) লাফাবার অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে শরীরের ভারটা যেন লম্ফন-পায়ের উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত থাকে। (৩) ডাণ্ডার উপর বরাবর লম্বালম্বি শুয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হ'তে নেই, বরং সামান্য একটু পিছন দিকে হেলে থাকাই ভালো। (৪) আরম্ভিক পা দিয়ে উপর দিকে লাথি ছোঁড়াটা যেন বেশ জোরালো হয়। প্রথম দিকে হাঁটু কিছুটা ভেঙে থাকবে বটে, কিন্তু তারপরে হঠাৎ সোজা হয়ে যাবে। (৫) লম্ফন-পায়ের আঙুলের সাহায্য পুরোপুরি নিতে শেখা উচিত। (৬) হাত দুটোও সজোরে ওপর দিকে উৎক্ষেপ করা দরকার। (৭) ওয়েস্টার্ন রোল প্রথায় লাফাবার সময় কাঁধ ও পাছা মুড়ে যতদূর সম্ভব ডাণ্ডা থেকে দূরে সরিয়ে না রাখলে, ডাণ্ডাটি পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। (৮) উচ্চতার জন্য তাড়াহুড়ো না করে খুঁটিনাটিগুলো আয়ত্ত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। (৯) প্রত্যহ অন্তত ২০/২৫ মিনিট করে সাহায্যকারী শারীরিক ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করা দরকার।

**ওয়েস্টার্ন রীতি :** আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশের ভালো উচ্চলম্ফনকারীরা

ওয়েস্টার্ন পদ্ধতিতে লাফিয়ে থাকেন। সাধারণ লাফিয়েরা অবশ্য প্রথম দিকে লাফানো শুরু করে কাঁচি কাটা রীতিতে।

ওয়েস্টার্ন লাফের সময়, লাফিয়ে যদি ডানপায়ে লাফ আরম্ভ করে, তা হলে লাফানো হবে বাঁ পাশ দিয়ে। অনেকটা পোলভল্টের ভঙ্গীতে দেহটা উঠিয়ে ক্রশঃ



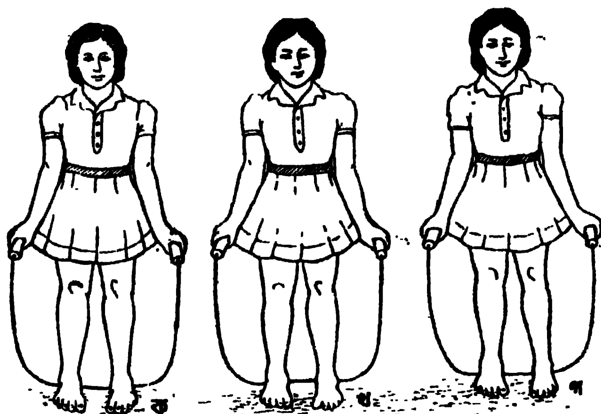

ওয়েস্টার্ন পদ্ধতিতে উচ্চলম্ফন।

বারের সমান্তরাল অবস্থায় এনে, ডান দিক দিয়ে ক্রশবার অতিক্রম করতে হয়। লাফাবার সময় লাফানোর ডান পা মাটিতে ন্যস্ত থাকে, বাঁ পা দোলায়িত ভঙ্গীতে ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সবলে ডান পা দিয়ে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে মাটি ত্যাগ করে দেহটা পার করে ধীর গতিতে উপরে উঠে যে, ক্রশবার পার হওয়ার সময় মাথা কাঁধ পায়ের সঙ্গে একই রেখায় অবস্থান করে। ডান পাটা যখন মাটি ত্যাগ করে, তখন সেটা দ্রুত তালে বাঁ পাকে অনুসরণ করে। বাঁ পাটা তখন ক্রশবারের কাছাকাছি এসে গেছে। অতঃপর ক্রশবার পার হলে, শরীরটা বাঁ দিকে একটু ঘুরে যেতেই অধঃমুখে লাফিয়ে মাটিতে এসে পড়তে হয়। ডান পা ও ডান হাত প্রথম মাটি স্পর্শ করে। পতনটা অতি সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে সাধিত হয়।

## ৫০ মিঃ স্কিপিং দৌড়

এই ৫০ মিটার স্কিপিং দৌড়ে বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই অংশ গ্রহণ করবে। লেনে দৌড়ের ব্যবস্থা করতে হ'বে, নইলে ধাক্কা ধাক্কিতে শৈত্যক্রীড়ার অনেকখানি মাধুর্য নষ্ট হ'বে। প্রাথমিক হিটে ছাঁটাই করার পর মাত্র জনা ছয়েককে স্কিপি দৌড়ে অংশ গ্রহণ করতে দিতে হবে। স্কিপিং দড়ি পিছনে

রেখে আরম্ভ রেখায় স্টার্টের পূর্বে দাঁড়াতে হবে, এখানে সেই ৫০ মিটার




৫০ মিটার স্কিপিং দৌড়ের পূর্ব মুহূর্ত

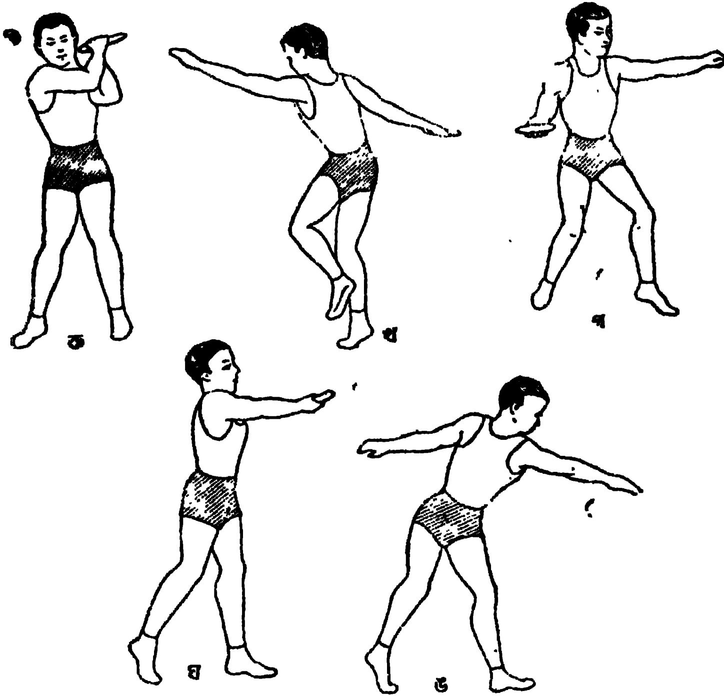
স্কিপিং দৌড়ের পূর্ব মুহূর্তের চিত্রটি দেখানো হয়েছে।

**ডিসকাস ও জ্যাভেলিন নিক্ষেপণ** ঃ—এই ধরণের অপেক্ষাকৃত ভারী জিনিস নিয়ে যে প্রতিযোগিতা, সেই সব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণতঃ একটু মোটা বলিষ্ঠ ধরনের ছাত্রীরাই অংশ গ্রহণ করে থাক। তার কারণ এখানে ক্ষিপ্রতার চেয়ে বেশী শক্তি এবং কলাকৌশলের প্রয়োজন হয় বেশী।

**সরঞ্জাম :** একটি কাঠ বা ধাতু নির্মিত চাকতি, অথবা রবারের তৈরিও হতে পারে। এর ওজনের স্বীকৃতপরিমাপ হলো ৪ পাউণ্ড ৬·৪ আউন্স, তার ব্যাস রেখা হ'বে ৮⅝ ইঞ্চি বা ২২ সে.মি.। ২·৫ মিটার ব্যাসার্ধের ভিতর থেকে ছোঁড়ার নিয়ম।

**ছোঁড়ার পদ্ধতি :** ডিসকাস ছোঁড়ার সময় দেহের ওজন-শক্তিকে ছোঁড়ার কৌশলে বাহুতে রূপান্তরিত করতে পারলে, ডিসকাস ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করা যায়। কোমরের অবস্থান ও ভঙ্গী এ ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করে। বাঁ হাতের তালুর উপর ডিসকাস ও তার উপর ডান হাত রেখে উপর থেকে নিচের দিকে দোলাতে হয়, সেই সঙ্গে পদক্ষেপের তালটা বজায় রাখতে হয়। তারপর বাঁ হাত থেকে ডান হাতে ডিসকাসটি নিয়ে এক চক্কর ঘুরে বাঁ হাত সামনে দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে, ডিসকাসসহ ডান হাতটাকে ডান দিকের কোমরের পিছনে নিয়ে যেতে হয়। দুপাক ঘুরে সামনে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে যখন ডান কোমার দেহের সঙ্গে ঘুরে সামনের দিকে আসে, তখন এক প্রবল শক্তির বেগে

হাতের শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেন হাত থেকে ছিনিয়ে বার করে নিয়ে যায়। তখন




ক, খ, গ ডিসকাস ছোড়ার বিভিন্ন ভঙ্গী ও
ঘ এবং ঙ ডিসকাস ছোড়ার চূড়ান্ত ভঙ্গী

নিক্ষিপ্ত সেই ডিসকাস যদি ঈষৎ কম্পিত হয়ে মাটির সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, ডিসকাসটি বহু দূরেই যাবে।

**বর্শা নিক্ষেপণ :** প্রাচীন যুগের যুদ্ধাস্ত্রই আজ বর্শাতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর রানওয়ের পরিমাপ ৩৬.৫ মিটারের বেশী, বা ৩০ মিটারের কম হবে না। একটি ২ সেন্টিমিটার মোটা রেখা সমান্তরালভাবে টানতে হবে। ৮ মিটার ব্যাসার্ধের চাপ থেকে বর্শানিক্ষেপ করার নিয়ম।

বর্শা দণ্ডের পরিমাপ হলো ৭ সেন্টিমিটার মোটা ধাতু ও কাঠ দ্বারা তৈরি।

(ক) জ্যাভেলিন বা বর্শাটির ফলক সামনে রেখে ডান হাত দিয়ে ধরে কাঁধের উপর থেকে ছুঁড়তে হয়।

(খ) ফিনিসীয় পদ্ধতিতে সব চেয়ে বেশী দূরে বর্শা নিক্ষেপ করা যায়। ৪৫°/৬০° কোণ করে নিক্ষেপ করলে, বর্শা সঠিকভাবে অগ্রসর হয়ে তীক্ষ্ণ ফলক

দিয়ে মাটি বিদীর্ণ করে। বর্শা নিক্ষেপে সাফল্য অর্জনের জন্য বিশেষ অনুশীলন ও পদক্ষেপের তালিম নিতে হয়।

**ডজ বল:** ছাত্রছাত্রীরা দু'টি দলে ভাগ হয়ে এই খেলা খেলতে পারে। সাধারণতঃ এটি মেয়েদেরই খেলা। দু'দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এক দল থাকবে একটি বড় বৃত্তের মধ্যে। অন্য আক্রমণকারী দল থাকে বৃত্তের বাইরে একটি চিহ্নিত জায়গায়। বাইরের খেলোয়াড়রা ফুটবল ছুঁড়ে মারে বৃত্তের ভিতরের খেলোয়াড়দের। ওরা ঐ আক্রমণকে প্রতিহত করবার কখনও বা বল নাচার ভজ করে, কিন্তু কোনক্রমে তারা ঐ চক্রের বাইরে যেতে পারে না। সরাসরি যার গায়ে বল এসে লাগে সেই মরে বা আউট হয়। এইভাবে আউট হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত যে টিকে থাকে, তাকে বলা হয় বৃত্তের রানী। এর পর পালা বদল হয়। ভিতরের লোক যায় বাইরে, আর বাইরের খেলোয়াড় যায় ভিতরে। তখন বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হয় খেলা।

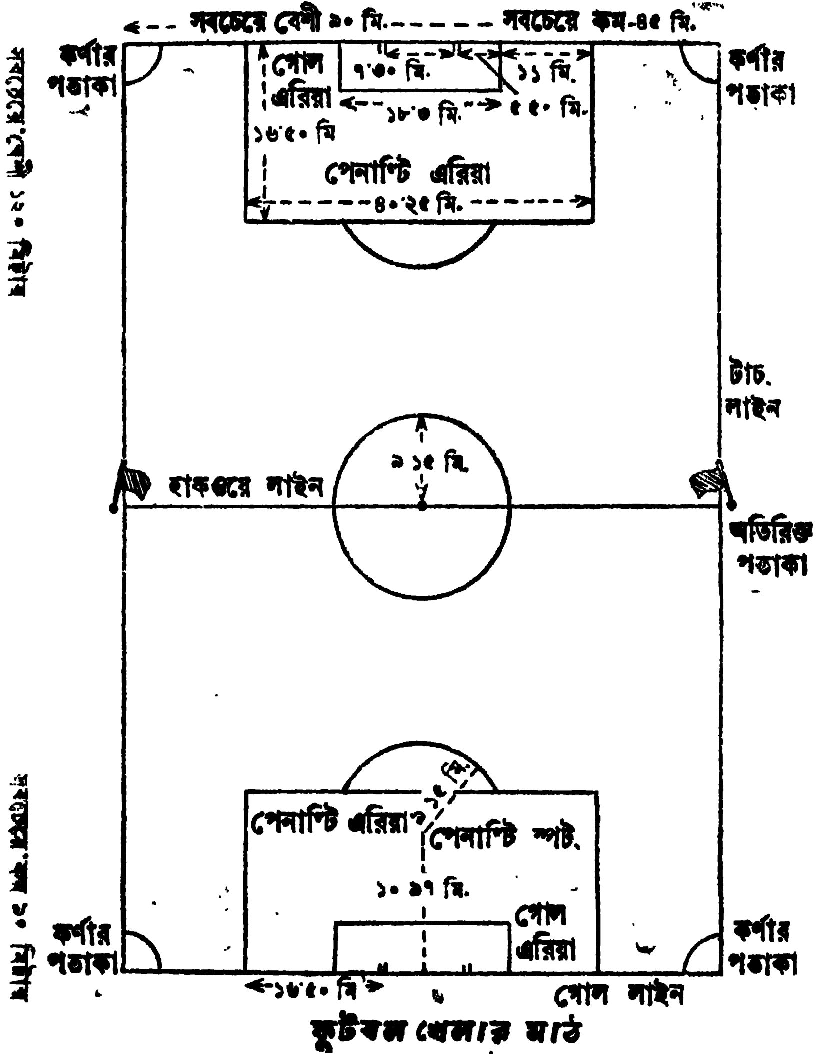
## খেলার কানুন

**ভূমিকা:** ভাষার পর যেমন ব্যাকরণের সৃষ্টি, তেমনি খেলাধূলা প্রবর্তিত হওয়ার অনেক পরেই প্রণীত হয়েছে খেলার আইন বা 'কানুন'। ব্যক্তিগত কোন খেয়াল-খুশীকে খেলা বলা চলে না। খেলা সাধারণতঃ সুনিয়ন্ত্রিত এবং দলগত। সমস্ত খেলাধূলাকে প্রায় দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা— আভ্যন্তরীণ (indoor) এবং বহির্ময়দানের (out door games) খেলা। ক্যারাম-পাশা-দাবা প্রভৃতি হ'ল আভ্যন্তরীণ খেলা। এসব খেলা ঘরে বসেই দু'চার জনে খেলা চলে। আর ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ভলি প্রভৃতি হল বহির্ময়দানের খেলার অন্তর্গত। এ ছাড়া 'ওয়াটার পোলো', 'বাইচ' প্রভৃতি জল-ক্রীড়াও আছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে প্রধান প্রধান খেলার কানুনের মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

**ফুটবল খেলা:** ভারতবর্ষের সমধিক জনপ্রিয় খেলা হ'ল ফুটবল। ফুটবল বড় মাঠের খেলা বা বিগ এরিয়া গেম্‌সের অন্যতম ক্রীড়া। একটি আদর্শ ফুটবল মাঠের কি পরিমাপ বা আয়তন হওয়া উচিত, পরপৃষ্ঠায় তার একটা রৈখিক চিত্র দেওয়া গেল।

**খেলার মাঠ:** চিত্র দেখে বুঝতে পারবে যে, মাঠটি আয়তনে আয়তক্ষেত্র। এর দৈর্ঘ্য কোনক্রমে ১২০ মিটারের (১৩০ গজ) বেশী হ'বে না অথবা ৯০ মিটারের (১০০ গজ) কম হলে চলবে না। এই মাঠের সর্বাধিক চওড়ার পরিমাপ ৯০

মিটারের (১০০ গজ) বেশী হবে, না, কিংবা কমপক্ষে কখনই ৪৫ মিটারের (৫০ গজ) কম হবে না। (আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাঠের পরিমাপ হল




**ফুটবল খেলার মাঠ**

১১০ × ৭৩ মিটার (১২০ × ৮০ গজ) সর্বাধিক পরিমাপ; অথবা কমপক্ষে হবে ১০০ × ৬৪ মিটার (১১০ × ৭০ গজ)। খেলার মাঠ সব সময় উত্তর-দক্ষিণমুখী হওয়া উচিত।

**গোল-পোষ্ট :** গোল-পোস্ট ঠিক গোল লাইনের মাঝখানে থাকবে। মাটি থেকে পোষ্টের উচ্চতা হবে ২·৪৩ মিটার ( ৮ ফুট )। এক পোষ্ট থেকে অন্য পোষ্টের দূরত্ব হবে ৭·৩০ মিটার (২৪ ফুট)। ক্রশ-বার বা অন্য বার পোষ্ট মোটা এবং চওড়ায় হবে ১২ সে· মি ( ৫″ ইঞ্চি ) পরিমাণ।

**বলের মাপ ও ওজন :** একটি বলের সামগ্রিক বৃত্তের পরিমাপ ৭১ সে·মির ( ২৮ ইঞ্চি ) বেশী বা ৬৮ সে·মির ( ২৭ ইঞ্চি ) কম নয়। হাওয়া-সমেত একটি বলের ওজন ৪৫৩ গ্রামের বেশী বা ৩৯৬ গ্রামের কম নয়।

**খেলোয়াড়ের সংখ্যা :** দুইটি প্রতিযোগী দলে সর্বসাকুল্যে থাকে ২২ জন খেলোয়াড়। এদের মধ্যে দু'জন থাকবে গোলরক্ষক। খেলা চলতে থাকাকালীন ক্রীড়া পরিচালকের অনুমতিক্রমে উভয় দলের যে কোন খেলোয়াড় নিজ নিজ দলের গোলরক্ষকের সঙ্গে স্থান বদল করতে পারে। আজকাল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রয়োজনবোধে একাধিক খেলোয়াড় বদ-বদলের রীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

**খেলোয়াড়ের উপকরণ :** খেলোয়াড়দের সাধারণ পোষাক হল জার্সি, হাফপ্যান্ট মোজা, বুট। অন্য খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপজ্জনক, এমন বুট পরিধান করা বিধেয় নয়। বুটের নীচেরকার হুকগুলি চামড়া বা রবারের নির্মিত হওয়া উচিত। গোলরক্ষকের পরিধেয় জার্সির রং হ'বে স্বতন্ত্র। বাকী ১০ জন খেলোয়াড় পরবে বিচিত্র রঙের জার্সি বা হাফ্ সার্ট।

**খেলার সময় :** সাধারণ খেলার সময় হ'চ্ছে ২৫ মিনিট করে, দুই অর্ধে ৫০ মিনিট আর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সময় হ'ল ৪৫ মিনিট করে ৯০ মিনিট। আর বিরতির সময় ৫ মিঃ। উভয় পক্ষের সম্মতি অথবা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী অনুসারে পরিচালককে খেলার নির্দিষ্ট সময়কে সমান দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে তবে খেলাটিকে পরিচালনা করতে হ'বে।

**খেলার আরম্ভ :** খেলা আরম্ভের পূর্বে উভয় দলের অধিনায়কদের সামনে টসে ঠিক করে নেওয়া হ'বে, কোন্ দল কোন্ দিক নেবে আর কোন্ দলের দ্বারা প্রথম খেলার সূচনা হ'বে। নির্দিষ্ট সময়ে পরিচালকের বংশী-ধ্বনির সংকেত পেলেই খেলা আরম্ভ হ'বে। মধ্য মাঠের "বৃত্ত-কেন্দ্র" থেকে যখন একজন বলে লাথি মারবে, তখন অন্য পক্ষকে "কেন্দ্র-বিন্দু" থেকে ৯·১৫ মিঃ বা ১০ গজ দূরে থাকতে হ'বে। কোন পক্ষে গোল হওয়ার পরেও এইভাবেই খেলার আরম্ভ হ'বে। বিরতির পর উভয় দলকে দিক্ পরিবর্তন করতে হ'বে এবং প্রথমার্ধে যে দল খেলার সূচনা করেছিল, দ্বিতীয়ার্ধে অন্য দল খেলার সূচনা করবে।

**বল কখন খেলার বাইরে বলে বিবেচিত হবে :** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বলকে খেলার আওতার মধ্যে আনা যাবে না। যথা—

(ক) শূন্যে বা মাটিতে বল যখন গোল বা টাচ্‌লাইন অতিক্রম করবে।

(খ) কোন কারণে পরিচালক যখন খেলাটি বন্ধ করবেন।

**এ ছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে খেলা চলতে থাকবে।** যথা—

(ক) বল যদি ক্রস্‌-বার, গোল-পোস্ট অথবা কোণার নিশানে লেগে প্রতিহত হয়ে মাঠের মধ্যে ফিরে আসে।

(খ) অথবা পরিচালক, কিংবা লাইন্‌স্‌ম্যানের (যখন তাঁরা মাঠের মধ্যে থাকবেন) গায়ে লেগে প্রতিহত হ'লেও।

(গ) কোন আইন লঙ্ঘিত হয়েছে অনুমান করা সত্ত্বেও যতক্ষণ না পরিচালক বাঁশী বাজিয়ে খেলাটি বন্ধ করেন। সমগ্র বলটি গোল বা টাচ্‌ লাইন সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম না করা পর্যন্ত, এমন কি টাচ্‌লাইনের উপর দিয়ে বরাবর গড়াতে থাকলেও।

**গোল করার বিধি :** আক্রমণকারী দল যদি পা মাথার সাহায্যে বিপক্ষদলের গোল-লাইন সম্পূর্ণভাবে পার করিয়ে গোলের মধ্যে বলটিকে পাঠিয়ে দিতে পারে শূন্যে বা মাটিতে বল গোল-রেখা অতিক্রম করলেই গোল হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে, হাত দিয়ে ঠেলে ছুঁড়ে দিলে কিন্তু গোল হ'বে না। যে দল বেশী গোল দেবে, তারা বিজয়ীর সম্মান পাবে। আর কোন পক্ষেই গোল না হ'লে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হ'বে।

**অফসাইড :** বিপক্ষদলের কোন খেলোয়াড় যখন অন্য দলের গোলরক্ষক ও একজন ব্যাকের আগে থাকে, অবশ্য বলের গতি সেই দিকে থাকে। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কিন্তু "অফ্‌সাইড" হ'বে না। যথা—

(ক) যদি কোন খেলোয়াড় অর্ধ মাঠের এদিকে তার নিজের দিকে থাকে।

(খ) তাকে বাদ নিয়ে যদি আরও দু'জন প্রতিপক্ষ তাদের গোলের কাছে উপস্থিত থাকে।

(গ) ঠিক অব্যবহিত আগে প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রতিহত বা আক্রমণকারী কর্তৃক বল স্পর্শিত হ'লে।

(ঘ) যখন গোলকিক, কর্ণার সট অথবা থ্রো-থেকে সরাসরি আক্রমণকারীর কাছে আসে অথবা যে ক্ষেত্রে পরিচালক "ড্রপ" দেয়, তখন অফ্‌সাইড্‌ হয় না।

**ফাউল অথবা অবাঞ্ছিত আচরণ :**—নিম্নলিখিত ৯টি ক্ষেত্রে খেলোয়াড়রা

যখন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কোন অপরাধ করে, তখন তা 'ফাউল' বলে গণ্য হ'বে। যথা—

(১) যদি প্রতিপক্ষকে লাথি মারে বা মারার চেষ্টা করে।

(২) যদি প্রতিপক্ষকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়, সামনে বা পিছনে দাঁড়িয়ে তার গতিরোধ করে, পা দিয়ে ল্যাঙ্ মারে ইত্যাদি।

(৩) যদি প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

(৪) যদি মারাত্মকভাবে প্রতিপক্ষের গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে চার্জ করে।

(৫) প্রতিপক্ষের কোনরূপে গতিরোধ না করা সত্বেও যদি কেউ তাকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে।

(৬) প্রতিপক্ষকে আঘাত করলে বা করতে উদ্যত হ'লে।

(৭) প্রতিপক্ষের হাত বা বাহুর কোন অংশ চেপে ধরলে।

(৮) হাত বা বাহুর কোন অংশ দিয়ে প্রতিপক্ষকে ধাক্কা বা খোঁচা দিলে।

(৯) হাত দিয়ে চেপে ধরলে, অযথা চীৎকার করলে, অথবা হাত বা বাহুর কোন অংশ দিয়ে বল ঘোরালে ( গোলসীমার মধ্যে কেবল গোলরক্ষকই হাত দিয়ে বল ধরতে পারবে )।

**অবৈধ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি:** অন্যায় বা অসঙ্গত ভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির শাস্তি হ'ল পরোক্ষ ফ্রি কিক। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হ'বে, তা নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

যখন কোন বলকে প্রতিহত করবার চেষ্টা না করে প্রতিপক্ষকে অকারণে বাধা দেওয়া হয়, বল ও প্রতিপক্ষের মধ্যে অযথা বাধা সৃষ্টি করে দৌড়ানো, পথ আটকানো প্রভৃতিকে বলে অবৈধ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা। গোলরক্ষক বা ব্যাক যদি কোন বলকে খেলার বাইরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য টাচ্ লাইন বরাবর প্রতিপক্ষের ধাবমান ফরওয়ার্ডকে বাধা দেয়, তা অবৈধ বলে গণ্য হ'বে।

**ফ্রি কিক্:** দু'ধরণের ফ্রি কিক্ আছে। যথা—(১) সরাসরি—যা থেকে সরাসরি এক সটে গোল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। (২) পরোক্ষ—এ থেকে কোন ক্রমে একবারে গোল হয় না, তবে সেটা অবশ্য যে সট করেছে, সে ছাড়া অন্য কেউ অথবা প্রতিপক্ষের কারুর গায়ে লেগে গোলে গেলে গোল হবে। এই উভয়বিধ কিক্ নেওয়ার সময় প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে কমপক্ষে ৯.১৫ মিঃ বা ১০ গজ দূরে থাকতে হবে। পেনাল্টি সীমার বাইরে থেকে সরাসরি ফ্রি কিক্ নেওয়া যায়। একবার কিক্ করার পর সে ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করার আগে—দ্বিতীয়বার সেই বল স্পর্শ করলে, তার বিরুদ্ধে পরোক্ষ ফ্রি কিক্ দেওয়া হবে।

**পেনালটি কিক্ঃ** পেনাল্টি সীমার মধ্যে আক্রমণকারী খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে ধাক্কা দিলে, আঘাত করলে, বা তাণ্ডবল করলে, "আত্ম-রক্ষী" দলের বিরুদ্ধে পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়া হয়। পেনাল্টি কিক্ নেওয়ার সময় পেনাল্টি সীমার মধ্যের নির্দিষ্ট স্থান থেকে সট করতে হবে। তখন গোলরক্ষক এবং যে সট করছে, সে ছাড়া কোন পক্ষের কেউ সেই পেনাল্টি সীমার মধ্যে থাকতে পারবে না।

**কোন্ ক্ষেত্রে পুনর্গৃহীত হবে বা নাকচ হবে ?**

(ক) কিক্ নেওয়ার সময় আত্মরক্ষণকারী দলের কেউ হঠাৎ বাধা দিলে, বা সট করার পরেই অনুরূপ কোন মারাত্মক ফাউল করলে (অবশ্য তার আগে গোল না হলে)।

(খ) গোল হওয়ার ঠিক আগেই আত্মরক্ষণকারী দলের কেউ পেনাল্টি সীমার ৯'১৫ মি. বা ১০ গজের মধ্যে ঢুকে পড়লে, বা ফাউল করলে, আবার পেনালটি সট গৃহীত হবে।

(গ) সট গ্রহণকারী খেলোয়াড় কোন অন্যায় করলে, যেমন—দু'বার বল স্পর্শ করলে, আত্মরক্ষী দল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ফ্রি কিক্ পাবে।

**থ্রো:** খেলার সময় বল যদি উভয় দিকের টাচ্লাইনের কোন দিকে, মাটির উপরে বা শূন্যে সম্পূর্ণভাবে মাঠের বাইরে যায়, তবে যেখান থেকে বল মাঠের বাইরে গেছে, এবং যে দল তা পাঠিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সেই স্থান থেকে থ্রো দেওয়া হবে। ঠিকমত থ্রো করতে না পারলে, অন্য দল আবার থ্রো করার সুযোগ পাবে। অন্য কারুর দ্বারা গায়ে লাগার আগে থ্রোকারী সেই বল স্পর্শ করলে, তার বিরুদ্ধে বিপক্ষ দল পরোক্ষ ফ্রি কিক্ পাবে।

**গোলকিক্ঃ** গোল-পোস্টের উপর দিয়ে অথবা সম্পূর্ণভাবে শূন্যে বা নীচে দিয়ে বল যখনই গোল-লাইন পার হয়ে যাবে, তখন সেই স্থান-বরাবর গোল সীমার সেইদিক থেকে আত্মরক্ষীদল গোলকিক্ পাবে। সরাসরি গোলকিকে বিপক্ষের গোলে বল গেলেও গোল হয় না। বল সরাসরি পেনাল্টি সীমার বাইরে না গেলে, পুনর্বার গোলকিক্ করতে হয়।

**কর্ণার কিক্ঃ** আত্মরক্ষাকারী দলের কোন খেলোয়াড়ের গায়ে, পায়ে বা মাথায় লেগে বল যদি শূন্যে বা নীচে গোল-লাইন সম্পূর্ণভাবে পার হয়ে যায়, তবে আক্রমণকারী দল আত্মরক্ষাকারী দলের বিরুদ্ধে (যে দিক দিয়ে বল গেছে, সেই দিকে) কর্ণার কিক্ পাবে। কর্ণার থেকে সরাসরি গোলে বল গেলে কিন্তু গোল হবে।

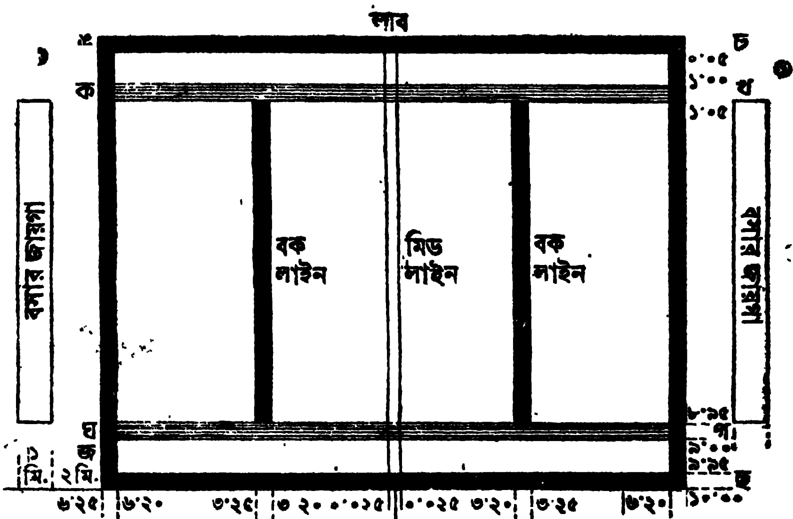
**পরিচালক এবং লাইন্‌স্‌ম্যান :** সর্বক্ষেত্রেই পরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলেই গৃহীত হবে। ক্ষেত্রবিশেষে কোন বিষয়ে পরিচালকের মনে সন্দেহ হ'লে, তিনি (যেদিকে ঘটনাটি ঘটেছে, সেই দিককার) লাইন্‌স্‌ম্যানের পরামর্শ নিতে পারেন; তবে বিচারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরিচালককেই গ্রহণ করতে হ'বে। পরিচালকের কাজে সাহায্য করা, কর্নার, থ্রো ইত্যাদি—কোন্‌ দল কখন কোন্‌ স্থান থেকে করবে—তা দেখিয়ে দেওয়াই লাইন্‌সম্যানদ্বয়ের কাজ।

**টাই-ব্রেকার :** ফুটবল ও হকির নক আউট প্রতিযোগিতায় খেলা বার বার ড্র হলে, খেলাকে মীমাংসার জন্য টাইব্রেকার প্রথা চালু করা হয়েছে। অমীমাংসিত অবস্থার সমাপ্তি ঘটায় বলে এই ব্যবস্থার নাম টাইব্রেকার। এ ব্যবস্থায় দু'দলই ৫টি (প্রয়োজন বোধে বেশি) করে পেনাল্টি-কিক মেরে যে দল বেশি গোল করবে সে দল জয়ী হবে।

**কবাডি বা হু-ডু-ডু-ডু খেলা :** হা-ডু-ডু-ডু একটি দেশী খেলা। একে স্বল্পপরিসর মাঠের খেলা বলে। অঞ্চলভেদে এ খেলা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা—কবাডি, হা-ডু-ডু-ডু বা চিডুগুডু প্রভৃতি।

**মাঠের নক্সা :**

ক খ গ ঘ একটি হা-ডু-ডু-ডু খেলার মাঠ। ক খ চ ঙ এবং গ ঘ জ ছ




কবাডি কোর্ট

আয়তক্ষেত্র সমান দু'ভাগে বিভক্ত। এর দৈর্ঘ্য ১৩ মিঃ (৪২'৬" × ৩২'৯") × প্রস্থ ১০ মিঃ। মধ্যরেখাকে বলে মিড লাইন।

**খেলার কানুন :** (১) যে দল টসে জয় লাভ করবে, সেই দল তাদের পছন্দ মতো দিক নিতে পারে, বা খেলার সূচনায় আক্রমণ বা রেড করতে পারে। দ্বিতীয়ার্ধে হবে কোর্ট বদল, প্রথম দল নেবে দ্বিতীয় দলের স্থান। প্রথমার্ধের শেষে যে সংখ্যক খেলোয়াড় ছিল তাদের নিয়েই দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হবে।

(২) খেলার সময় যদি কোন খেলোয়াড় সীমা-রেখার বাইরে যায়, তবে সে "মোর" হবে। পরিচালক তৎক্ষণাৎ তাকে কোর্টের বাইরে যেতে বলবেন।

(ক) প্রতিপক্ষ দল যদি সীমানার বাইরে গিয়ে আক্রমণকারীকে ধরে, তবে আক্রমণকারী 'মোর' হবে না, এবং তাকে ধরার জন্য যে যে বাইরে গিয়েছিল তারা 'মোর' হবে।

(৩) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে একজন খেলোয়াড় মোর হবে :—

যদি তার (i) দেহের কোন অংশ বহির্সীমানার মাটি স্পর্শ করে, (ii) কিন্তু লড়াই-এর সময় যদি তার কোন অঙ্গ সরাসরি বহির্সীমায় মাটি স্পর্শ করে অথবা কোর্টের অভ্যন্তরের কোন খেলোয়াড়কে যদি সে ছোঁয়।

(৪) লড়াই-এর সময় 'লবি' অংশটিও হবে মাঠের অন্তর্ভুক্ত। লড়াই অন্তে যারা এতে অংশ গ্রহণ করে ছিল, তারা লবি পথেই নিজ নিজ কোর্টে ফিরে যেতে পারবে।

(৫) আক্রমণকারীকে "কবাডি, কবাডি" বা 'কিৎ কিৎ' শব্দ করতে হবে; কেউ এক দমে অনেকক্ষণ তা না পারলে, আমপায়ার প্রতিপক্ষ দলকে আক্রমণ করবার সুযোগ দিতে পারেন।

(৬) দম নিয়ে আক্রমণকারী "বক্ লাইন" অতিক্রম করে বিপক্ষের কোর্টে প্রবেশ করতে হবে। "চু" দিতে যদি সে দেরী করে, তবে আমপায়ার তাকে নিজ কোর্টে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন এবং বিপক্ষ দলকে পাল্টা আক্রমণের সুযোগও দিতে পারেন। কেবল বিপক্ষ কোর্টে প্রবেশ করাটাই সব কথা নয়, কোর্টের মাটিও তাকে স্পর্শ করতে হবে।

(৭) সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি কোন রেডার বা আক্রমণকারী স্বেচ্ছায় এবং আইন অমান্য করে, আমপায়ার তার পালা শেষ হয়েছে বলে অপর পক্ষকে একটি পয়েন্টও দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আক্রমণকারী খেলোয়াড় কিন্তু 'মোর' হবে না।

(৮) রেডার নিজ কোর্টে ফিরে আসা বা বিপক্ষ কোর্টে মোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপর পক্ষকে অতি সত্বরই একজন আক্রমণকারী পাঠাতে হবে। এই ভাবে প্রথম পর্বের খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চলতে থাকবে।

(৯) রেডার কোন রকমে প্রতিপক্ষের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিজ কোর্টে ফিরে আসার পর তাকে কিন্তু আর পাঠানো চলবে না।

(১০) বিপক্ষ দলের কোর্টে মাত্র একজন আক্রমণকারীই হানা দেবে, তার একাধিক জন গেলে, আমপায়ার তাদের নিজ কোর্টে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন এবং তাদের আক্রমণ-পর্ব শেষ হলো বলে ঘোষণা করবেন। আর সেই আক্রমণকারীরা যাদের স্পর্শ করেছিল, তাদের কেউ মোর হ'বে না।

(১১) যে দল একাধিক আক্রমণকারী পাঠাবে, আমপায়ার সেই দলকে সতর্ক করে দেবেন ; তা সত্ত্বেও যদি তারা এই নির্দেশ অমান্য করে, তবে প্রথম জনকে বাদ দিয়ে অন্যান্য আক্রমণকারীদের মোর বলে ঘোষণা করবেন।

(১২) বিপক্ষ কোর্টে কোন আক্রমণকারীর দম ফুরিয়ে গেলে, সে মোর হবে।

(১৩) কোন আক্রমণকারী ধরা পড়লে হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে দম বন্ধ করার চেষ্টা করা চলবে না। অথবা কেউ যদি মারাত্মকভাবে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে চায়, সে ক্ষেত্রে রেডার নিজ কোর্টে নিরাপদে ফিরে গেছে বলে ধরা হবে।

(১৪) রেডার বা কোন প্রতিপক্ষ কখনই কাউকে কোর্ট-সীমার বাইরে ঠেলে দিতে পারবে না। প্রথমে যে সেই চেষ্টা করবে, তাকে মোর বলে ধরা হ'বে। রেডারকে বাইরে ঠেলে দিলে, আমপায়ার ধরে নেবেন যে, সে নিজ কোর্টে ফিরে গিয়েছে।

(১৫) রেডার বিপক্ষ দলের কোর্টে প্রবেশ করলেই প্রতিপক্ষ দলের আর কেউ মধ্য-লাইন অতিক্রম করে আক্রমণকারীর কোর্টের মাটি স্পর্শ করতে পারবে না ; তা করলে সে মোর হবে।

(১৬) বিপক্ষ দলের যে মোর হয়েছে, ১৫ নং কানুন অমান্য করার হেতু, যদি কোন আক্রমণকারী ধরে,—এই ভাবে ধরে সে ঐ কানুন যখন লঙ্ঘনই করছে,—অথবা ধরার কাজে সাহায্য করে,—তা হলে আক্রমণকারী নিরাপদে নিজ কোর্টে ফিরে গেছে, আর যারা তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিল, তাদের সবাই হবে মোর।

(১৭) আক্রমণকারী যদি তার পালা ছাড়া অন্য সময় হানা দেয়, তবে আমপায়ার তাকে নিজ কোর্টে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন। পরিচালকের বিচারে যদি সে স্বেচ্ছাকৃত বলে মনে হয়, তবে বিপক্ষ দল তার বিনিময়ে পাবে এক পয়েন্ট, অবশ্য তার আগে একবার সেই দলকে সতর্ক করে দিতে হবেই।

(১৮) যখন কোন দল অন্য দলের সকলকেই মোর করে দিতে পারে, তখন

যে দল বিজয়ী হয়ে পাবে এক "লোনা"। তার জন্য সে দল বাড়তি চার পয়েন্ট অর্জন করবে। তখন খেলা চলতে থাকবে এবং যে যার কোর্টে ফিরে যাবে। এই ভাবে খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেতে থাকবে।

(১৯) আক্রমণকারী দলের যদি কেউ আক্রমণকারীকে তার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, আমপায়ার তার বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট ঘোষণা করবেন।

(২০) আক্রমণকারী বা প্রতিপক্ষ স্বেচ্ছাকৃতভাবে কারুর হাত, পা বা ঘাড় ছাড়া অন্য জায়গা হাত দিয়ে ধরতে পারবে না। তা করলে অবশ্য তাকে মোর বলে ঘোষণা করা হবে। আক্রমণকারীর ঐ তিন স্থান ছাড়া অন্য কোন জায়গায় ধরলে, ধরে নেওয়া হবে যে সে নিরাপদে নিজ কোর্টে ফিরে গেছে।

(২১) যখন মাত্র দু'তিন জন মোর হতে বাকী আছে, তখন দলের অধিনায়ক টিমের সকলকে নূতন করে পাওয়ার জন্য 'তারা মোর' বলে ঘোষণা করেন, তাহ'লে বিজয়ী দল নির্দিষ্ট পয়েন্টসহ (যত জন খেলোয়াড় ছিল তাদের দরুণ নির্দিষ্ট পয়েন্ট) লোনার ৪ পয়েন্ট পাবে।

(২২) প্রতিপক্ষের একজন মোর হ'লে অন্য দলের যে যেমন ভাবে মোর হয়েছে —সেইভাবে পর পর একজন করে বাঁচবে।

**প্রতিযোগিতার নিয়ম :** (১) প্রতি দলে ১২ জন করে খেলোয়াড় থাকবে। প্রথম সাত জন মাঠে অবতীর্ণ হবে।

(২) খেলার সময়কাল দুই অর্ধেই ২০ মিঃ পুরুষদের পক্ষে, আর মহিলা বা কিশোরদের ক্ষেত্রে ১৫ মিঃ করে ৩০ মিনিট, আর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম।

(৩) প্রতি মোরের জন্য বিপক্ষ দল এক নম্বর পাবে। যারা লোনা পাবে তাদের পক্ষে মিলবে বাড়তি ৪ পয়েন্ট।

(৪) যে দল খেলার শেষে সবচেয়ে বেশী পয়েন্টে পাবে, বিজয়ী বলে সেই দলেরই নাম ঘোষিত হবে।

৫। (ক) খেলা কোন ক্ষেত্রে অমীমাংসিত থাকলে, আবার বাড়তি পাঁচ মিনিট করে দশ মিনিট খেলতে হ'বে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য। দ্বিতীয়ার্ধের শেষে যে সংখ্যক খেলোয়াড় ছিল, তাদের নিয়েই খেলা চলবে।

(খ) যে দল এ খেলায় প্রথম পয়েন্ট পাবে, তাকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করতে হবে। অবশ্য যদি ৫০ মিনিট খেলার পরেও এই 'ড্র' হয়ে থাকে।

(৬) কোন কারণে খেলা বন্ধ হয়ে গেলে, খেলাটি আবার নূতন করে খেলাতে হবে।

(৭) কোন খেলোয়াড় আহত হ'লে দলের অধিনায়ক টাইম আউট চাইতে পারেন। সে বিরতির সময় কিন্তু দু' মিনিটের বেশী হ'বে না। আহত খেলোয়াড় আর খেলতে সক্ষম না হলে, তার বদলে অন্য খেলোয়াড় খেলতে পারবে। প্রথম খেলার শেষে ( অধিক পক্ষে ) মাত্র দু'জন বদলী খেলোয়াড় নেওয়া যেতে পারে। তাও অবশ্য পরিচালকের অনুমতি নিয়ে বিরতির সময় সে ব্যবস্থা করাই হবে বিধেয়।

(৮) দুই বা একটি খেলোয়াড় ছাড়াই কোন একটি খেলা অবশ্যই আরম্ভ করতে পারে। তবে খেলার শেষে যখন সেই দলের সকলেই মোর হ'বে, তখন সেই বাকী ক'জনাই মোর হবে এবং অন্য দলকে লোনাও দেওয়া হবে। সেই বাকী খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা এসে হাজির হবে, তখন পরিচালকের মত নিয়েই তারা মাঠে ঢুকতে পারে। এদের জন্য অবশ্য যে-কোন সময়ই বদলী খেলোয়াড় নেওয়া চলে। একবার কাউকে নেওয়া হ'লে, সেই দলের শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাউকে নেওয়া চলবে না। রিপ্লের সময় আগের খেলোয়াড়দেরই যে থাকতে হবে, এমন নয়।

(৯) ধাক্কা দেওয়া কোন ক্ষেত্রেই চলবে না। খেলোয়াড়দের হাতের নখও কাটা থাকা উচিত। প্রত্যেক খেলোয়াড়দের বুকে পিঠে তাদের নিজস্ব ক্রমিক নম্বর লটকানো থাকা দরকার। দেহে তেল, চর্বি, বা সাবান জাতীয় কোন পিচ্ছিল পদার্থ লাগানো চলবে না। কোন মাদুলী কবচ রাখা চলবে না। পরিধানে গেঞ্জি, হাফ্ প্যান্ট ও পায়ে কেডস সু থাকতে পারে।

(১০) অধিনায়ক ছাড়া আর কেউ খেলোয়াড়দের কোন নির্দেশ দিতে পারবে না।

**পরিচালক মণ্ডলী :** পরিচালকমণ্ডলী বলতে থাকবে—(১) একজন পরিচালক (২) দু'জন আমপায়ার, (৩) দু'জন লাইন্‌ম্যান্, (৪) আর একজন স্কোরার। মাঠে আমপায়ারের মতামতই চূড়ান্ত বলেন ধরা হবে; তবে ক্ষেত্রবিশেষে পরিচালক তাঁদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে পারেন।

## হিন্দুস্থান বল

হিন্দুস্থান বল ভারতীয় খেলা। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগ ছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার খেলাটিকে বন্ধ করে দেন। তারপর এই খেলার প্রচার ও প্রসার তেমন চেষ্টা করা হয়নি।

মাঠের দৈর্ঘ্য—৩০'৫ মিটার ( ১০০ ফুট ), চওড়া ১৮'২৯ মিটার ( ৬০ ফুট )।

সীমানা অনেকটা ফুটবল মাঠের মত, ফুটবলের মতই সেণ্টার সার্কেলসহ লাইন থাকে। গোলের দৈর্ঘ্য—৩·৬৫ মিটার ( ১২ ফুট ), মাটি থেকে পোস্টের উচ্চতা ২·১৩ মিটার ( ৭ ফুট ) মত। গোল এলাকার সীমা ৬ মিটার ( ২০ ফুট ), প্রস্থ ৩·৬৫ মিটার ( ১২ ফুট )। গোল থেকে পেনালটি বক্সের দূরত্ব ৪·৮৭ মিটার ( ১৬ ফুট )।

**খেলার নিয়ম :** খেলার সময় প্রতি অর্ধে—২০+২০=৪০ মিঃ বা ২৫+২৫=৫০মিঃ, বিরতি ৫মিঃ, খেলোয়াড় সংখ্যা—প্রতিদলে ৭ বা ৯জন। পা বাদে হাত ও কোমর যে কোন অংশ এই খেলায় ব্যবহৃত হতে পারে। গোল দেওয়ার ফলা-ফলেই এ খেলার পরিণতি। খেলোয়াড়, গোলকিপার, ব্যাক, হাফ ব্যাক, ফরওয়ার্ড ইত্যাদি থাকে।

তখনকার দিনে গোলে ১, ব্যাকে ২, হাফে ১ ও আক্রমণ ভাগে ৩ জন নিয়ে ম্যাচ খেলা হ'তো।

টসে জিতে বল ছুড়ে খেলার সূচনা হতো। তবে বল হাতে নিয়ে দু কদমের বেশী যাওয়ার নিয়ম নয়। হ্যাণ্ড বলের সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে। অফসাইড ফাউলও ফুটবলের মত। গোলকিপার পা দিয়ে বল থামিয়ে গোল রক্ষা করতে পারে। কিন্তু পা দিয়ে কিক করার রীতি নেই। নিয়ম ভঙ্গ না করে কোন রকমে বল গে'লে দিতে পারলেই গোল হয়।

এ খেলায় কোন কিক নেই, সবই থ্রো। যেমন গোলের পর থ্রো বা কর্ণার হলেও সেণ্টার থ্রো। পাশ লাইন দিয়ে বল আউট হলে সাইড থ্রো। আউট হলে আউট থ্রো, পেনাল্টি হলে পেনাল্টি থ্রো। ফাউলের পরিবর্তেও হয় ফাউল থ্রো।

## ট্যাগ গেমস্ বা অনুসরণ খেলা

এই খেলার জন্য দরকার—চুন দিয়ে সীমারেখা টানা একটি মাঠ। খেলোয়াড় সংখ্যা হয় ৩০—৫০জন। তাদের অবস্থানের স্থান-পরিমাণ হলো লম্বা ও চওড়ায় ১২·২ মিটার (৪০ ফুট)। প্রথম প্রয়োজন একজন নির্বাচিত অধিনায়ক। সে ছুটে গিয়ে যে কোন একজনকে ছুঁয়ে দিলে, সে তখন অধিনায়ক হয়। আগের অধিনায়ক তাকে অণুসরণ করে। নূতন অধিনায়ক আর একজনকে ছুঁয়ে দিয়ে অধিনায়ক করে। এইভাবে খেলা চলে। অন্যেরা তখন স্পর্শ বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা করে। আর অধিনায়করা হাত ধরাধরি করে দড়ির মত লম্বা হয়ে অন্যদের ছোঁয়ার জন্য অনুসরণ করে। এই কারণে একে বলা হয় ট্যাগ গেম বা অনুসরণের খেলা।

**হুইপ ট্যাগ :** ট্যাগ গেমের অনুরূপ খেলা। তফাৎ এইটুকু অন্যের পিছনে তাড়া করে ছুঁয়ে দেওয়ার সময় চাবুক দিয়ে সামান্য আঘাত করতে হয়। যার হাতে চাবুক সে তখন অধিনায়ক। অন্যকে আঘাত করার পর সে অধিনায়কের চাবুক ত্যাগ করে ঐ দলেই যোগদান করে।

**হপিং ট্যাগ**—আগের দুটি খেলারই অনুরূপ। তবে এখানে অধিনায়ক এক পায়ে ছুটে অন্যকে ছুঁয়েই নূতন অধিনায়কত্ব তৈরি করে নিতে হয়।

## রিলে গেমস্

অ্যাথলেটিকসের অন্যতম দৌড় খেলা হচ্ছে রিলে। চার জনের একটি দল। আরম্ভ লাইন থেকে একজন দৌড়ে এসে ঐ দলের দ্বিতীয় জনের হাতে, দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনের হাতে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের হাতে ব্যাটন পৌঁছে দিতে পারলেই এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি। যে দল সকলের আগে এই কাজ করতে পারে, সে দলই জয়ী হয়। একে বলা হয় **সাধারণ রিলে।**

**পরিখা রিলে**—এই রিলেতে প্রতিটি বাঁকে কৃত্রিম পরিখা নির্মাণ করা থাকে। তার পরিমাপ ১·৮০ মিটার। প্রতিযোগীদের ঐ খাদ লাফিয়ে পার হতে হয়। সাধারণ রিলের সঙ্গে এর এইটুকু পার্থক্য মাত্র।

**উচ্চ লম্ফ**—এই রিলেতে গন্তব্যপথের মধ্যবর্তী স্থানে দড়ি বা কাঠ দিয়ে উচ্চ যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা থাকে, তা লাফিয়ে অতিক্রম করতে হয়।

**দৌড় আর ছোঁড়া :** ফুটবল, ভলিবল, বা বাস্কেট বল নিয়ে এই খেলার পথ অতিক্রম করতে হয়। একজন থেকে দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের ব্যবধান থাকে ৬·১০ মিটার। ঐ পথটা ছুটে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে ঐ আরম্ভ রেখার দিকে পিছনে দ্বিতীয় জনের দিকে বল ছুঁড়ে দিতে হয়। সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাবে খেলা চলে। দ্বিতীয় জন ঐভাবে তৃতীয় জনকে, তৃতীয়জন চতুর্থ জনকে সবার আগে পৌঁছে দিতে পারলে, সেই দল জয়লাভ করে। তার বল কোন কারণে মাটিতে পড়ে গেলে আবার ঐ খেলা গোড়া থেকে শুরু হবে। যে দল বল ফেলবে, তাদেরই খেলা শুরু করতে হবে।

## দাড়িয়া বান্ধা

এটিও আমাদের নিজস্ব স্বদেশী খেলা। পশ্চিম ভারতে এ খেলা আত্যা পাত্যা নামে পরিচিত। বাংলা দেশে বহু অঞ্চলে এর নাম গাদী। দাড়িয়া বান্ধার কানুনের সঙ্গে গাদী খেলার অনেক মিল দেখা যায়।

প্রতি দলে থাকে ৯জন করে খেলোয়াড়। টসে বিজয়ী দলই স্থির করে যে, তারা আক্রমণ বা আত্মরক্ষা—কি করবে। দাড়িয়া বান্ধায় যে ক'টি দুর্গ থাকে, সেই দুর্গ আক্রমণ করাই হলো আক্রমণকারীর কাজ। এই দুর্গকে অতিক্রম বা আক্রমণ করতে পারলে, আক্রমণকারী ১০ পয়েন্ট লাভ করে। এই খেলার ৯টি দুর্গই অতিক্রম করতে পারলেই **লোনা** হয়। তখন আক্রমণকারী ৯×২=১৮×১০ =১৮০ পয়েন্ট পায়।

**খেলার সময়**—প্রতি ইনিংসে ৭ মিনিট করে খেলা হয়। তবে পয়েন্ট বেশী হয়ে গেলে, দলের অধিনায়ক ইনিংস ঘোষণা করতে পারেন। প্রতি ইনিংসের শেষে ৫ মিনিট বিরতি থাকে। তবে দল বদল করে মোট তিন ইনিংস খেলা হয়। এই তিন ইনিংসে যে দল বেশী পয়েন্ট পাবে, সেই দল জয়ী হবে। পয়েন্ট সংখ্যা সমান হ'লে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আবার খেলা হয়। এ খেলায় কোন দল যদি প্রতিপক্ষের চেয়ে ১৮০ পয়েন্ট এগিয়ে থাকে, তবে ঐ দল কম পয়েন্ট দলকে **ফলো-অন** করায়। আক্রমণকারীরা সম্মুখে দুর্গ বা বাউণ্ডারি-রেখার মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। রক্ষক দলের খেলোয়াড়রা সম্মুখ-দুর্গের দিকে মুখ করে নিজ নিজ দুর্গে দাঁড়িয়ে থাকে। 'সুর' বা গ্রেনেড়ার স্পর্শের জন্য দাঁড়ায় মাঝ দুর্গে। এই স্পর্শ করার অন্য নাম স্কোয়ার কার্ট। সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শ বা স্কোয়ার কার্ট করতে হয়। আক্রমণকারীকে আউট করার ছাড়পত্র এটা। কারণ স্কোয়ার কার্ট না করতে পারলে, আক্রমণকারীকে আউট করার অধিকার পাওয়া যায় না। অন্যান্য রক্ষকরা আপন আপন দুর্গের যে-কোন দিক দিয়ে আক্রমণকারীদের বাধা দিতে পারে।

**খেলার বয়ঃসীমা :** যাদের উচ্চতা ১'৫২ মিটার (পাঁচ ফুট) কম এবং বয়স ১৫ বছর হয়নি, তাদের জন্য কোর্টের পরিমাপ হবে আড়াআড়ি ৬'৪ মিটার (২১ ফুট) লম্বা ৩০ সেমি. (১ ফুট) চওড়া সামনের রেখা থেকে সমস্ত দুর্গের দূরত্ব হবে ৩ মিটার (১০ ফুট) আর কেন্দ্রীয় দুর্গের পরিমাপ হবে ২৪'৭ মিটার × ৩০ সে. মি. (৮১ ফুট × ১২ ইঞ্চি)।

**পরিচালক :** ম্যাচ পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত পরিচালক মণ্ডলীর দরকার হবে :—১ জন রেফারী, ৯ জন আম্পায়ার, ১ জন স্কোরার, ১ জন মার্কার। আম্পায়ার প্রতিটি দুর্গের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। স্কোরার যোগকেরও কাজ করবেন। রেফরী খেলার আরম্ভ ও শেষ করবেন।

## রিলে রেস

এটি বেশ মজার প্রতিযোগিতামূলক খেলা। সাধারণতঃ চার প্রকার রিলে খেলার প্রচলন দেখা যায়। যথা—(১) হপিং রিলে (২) বলপাস রিলে (৩) সার্কেল পাস রিলে ও (৪) চ্যারিয়ট রিলে।

**হপিং রিলে :** প্রতিযোগিতামূলক একটি দলীয় খেলা। একাধিক দলের মধ্যে (৪ থেকে ৬টি) খেলা হয়। নির্দিষ্ট লাইনের পিছনে প্রতিটি দলের দাঁড়ানোর নিয়ম। প্রথম লাইনের বেশ কিছুটা দূরে সমান্তরালে আরও একটি রেখা টানতে হয়। বাঁশীর সংকেতে খেলার সূচনা হয়। বাঁশী বাজা মাত্র প্রতি দলের খেলোয়াড়েরা এক পা তুলে ছুটে গিয়ে ঐ দূরের লাইন অতিক্রম করে আবার নিজ জায়গায় ফিরে এসে দলের দ্বিতীয় খেলোয়াড়কে স্পর্শ করলে, দ্বিতীয় জনও ঐভাবে ছুটে গিয়ে ঐ পূর্ব রেখা অতিক্রম করে ফিরে আসে। এইভাবে খেলা চলার পর সমসংখ্যক খেলোয়াড়দের মধ্যে সকলের আগে যারা দৌড় শেষ করতে পারবে, তারাই জয়ী হবে।

**(২) বলপাস রিলে :** এটিও মেয়েদের খেলা। এই রিলের সরঞ্জাম একটি ফুটবল। প্রত্যেক দলের খেলোয়াড়রা ১০ ফুট বা ৩'৫ মিটার দূরে দূরে দাঁড়ায়। প্রতি দলের প্রথম দলের হাতে একটি ফুটবল থাকে। বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে প্রথম জন দ্বিতীয়কে, দ্বিতীয় তৃতীয় জনকে বল পাশ করে দেয়। এইভাবে সব খেলোয়াড়ের হাতে ঘুরে সেই বল যে দলের প্রথম জনের হাতে আবার ফিরে আসে, সেই দলই বিজয়ী হয়।

**(৩) সার্কেল পাস রিলে ঃ** একই মাপের পাশাপাশি দুটি বড় আকারের বৃত্ত এঁকে নিতে হবে চুন দিয়ে। দুই বৃত্তের ধারে ধারে সমসংখ্যক খেলোয়াড় দাঁড়াবে। বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে দুই দলের খেলোয়াড়রা বল পাস করা শুরু করবে। ঘড়ির কাঁটার মত নিঃশব্দে কাজ চলবে। সকলের আগে যে দলের শেষ খেলোয়াড়ের হাতে ঐ বল গিয়ে পৌঁছাবে, সেদল জিতবে।

**(৪) চ্যারিয়ট রিলে :** এটিও প্রতিযোগিতামূলক খেলা। চার জন খেলোয়াড় নিয়ে একটি দল গঠিত হয়। এইরকম চারজন চারজন নিয়ে একটি গ্রুপ হয়। গ্রুপের খেলোয়াড়রা দাঁড়ায় স্টার্টিং লাইনে। বাঁশী বাজলেই নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে আবার ফিরে আসে আরম্ভ রেখায়। একজনের শেষ হলে দ্বিতীয় জন দৌড়ায়।

এইভাবে একের পর এক করে চারজনই দৌড়ায়। যারা বা যে দল সকলের আগেই এই দৌড় শেষ করতে পারে, সেই দলই বিজয়ী হয়।

**ক্যাপ্টেন বল :** এই খেলায় বাস্কেট বল খেলার নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। ৪৫·৭২ মিটার বা ৫০ গজ দূরে চেয়ারের উপর বসে থাকে লম্বা ধরনের দু'জন খেলোয়াড়। বিপরীত দিকের খেলোয়াড়ের নিকটে বল পাস করতে হয়। যে কোন আয়তনের মাঠ হলেই চলে। এক এক দলে থাকে সর্বসা কুলো ২০ জন করে খেলোয়াড়।

এছাড়া থাকে ৪৫·৭২ বর্গমিটার বর্গক্ষেত্রের মাঠ। তার চার কোণে চার জন ক্যাপ্টেন বসে থাকে চেয়ারে। এই চার জন ক্যাপ্টেনের খেলায় প্রতিপক্ষ দুজন ক্যাপনের যে কোন একজনের হাতে বল পাস করে দেওয়া যায়।

**থ্রো বল :** এ খেলার মাঠের মাপ—লম্বা ১৮·২৯ থেকে ২১·৩ মিটার চওড়া আন্দাজ মত করে নিতে হবে। সরঞ্জাম—একটি নেট বা ফুটবল। আয়তক্ষেত্র মাঠটি একটি মধ্যরেখা দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত। পিছনের লাইনের দু'দিক থেকে ভিতরের দিকে ৯১ সেন্টিমিটার বা ১ গজ সমান্তরাল করে দুদিকে লাইন টানা থাকে। এই এলাকায় থাকে ৪জন খেলোয়াড়। তার মাঝের লাইনের দুদিকে যে ছজন থাকে তাকে তারা হলো ক্যাচার। আর যারা মাঝের লাইনের দিকে থাকে তারা থ্রোয়ার। এই থ্রোয়ারের বিপরীত দিকে থাকে ক্যাচার। এই একদলের থ্রোয়ার ও ক্যাচারের মাঝে থাকে বিরুদ্ধ দলের থ্রোয়ার। ওদের কাটিয়ে বল পাঠাতে হয় নিজ দলের ক্যাচারের কাছে।

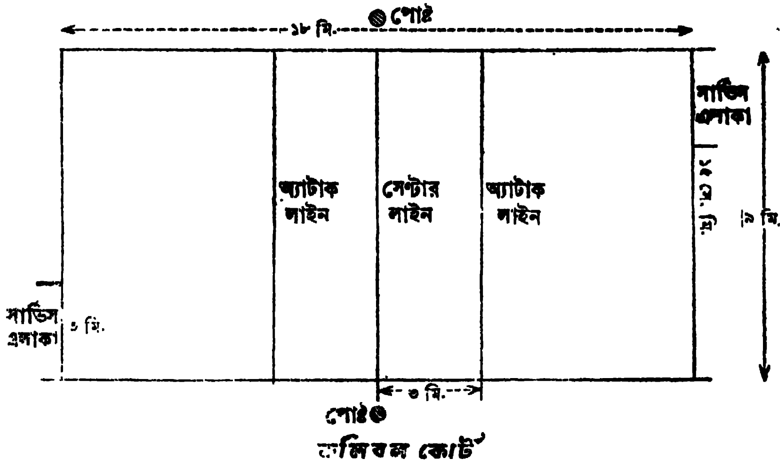
**খেলার সূচনা**—সাইড লাইন থেকে বল ছুঁড়ে খেলার শুরু হয়। থ্রোয়ার সেই বল ধরে নিজ দলের ক্যাচারদের কাছে পাঠায়। ক্যাচার ধরতে পারলে ১ পয়েন্ট হয়। বল ধরে তারা আবার নিজ দলের ক্যাচারদের নিকট পাঠায়। ক্যাচ আইনসঙ্গত হলে, বিপক্ষের থ্রোয়াররা বল পায়। থ্রোয়ার যখন এই বল ছোঁড়ে, তখন বিপক্ষ দলের থ্রোয়াররা বাধা দিয়ে বল দখল করতে পারে।

## ভলিবল খেলার কানুন

ভলিবল আমেরিকার জাতীয় খেলা। আজ অবশ্য সারা পৃথিবীতেই এর বহুল প্রচলন হয়েছে। ভলিবল সাধারণতঃ হলঘরে এবং বাইরের মাঠে—এই উভয় ক্ষেত্রেই খেলা হ'য়ে থাকে। ভারতবর্ষে অবশ্য ভলি বহির্ময়দানের খেলারূপে পরিগণিত হয়েছে। সাধারণতঃ এদেশের গ্রামাঞ্চলে স্থান পরিবর্তন না করে প্রতিযোগিতায় রোটেশনে খেলা হয়ে থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রে ৯ জন, আর

প্রতিযোগিতার সময় কানুন মাফিক ৬ জন করে খেলোয়াড় নিয়েই দল গঠিত হ'য়ে থাকে।

**ভলি কোর্ট বা মাঠ :** মাঠের পরিমাপ হবে ১৮ মিঃ × ৯ মিঃ (৫৯´× ২৯´৬.৬´´)। আনুমানিক ৯ মিটারের মাথায় মাঠটি সমান দু'ভাগে বিভক্ত হবে।



ভলিবল কোর্ট

মধ্য রেখা থেকে উভয় দিকের আক্রমণ রেখার দূরত্ব হবে যথাক্রমে ৩ মিটার বা ৯´১০´´। উভয় প্রান্তের ডান ও বাঁ দিকের সার্ভলাইনের সীমারেখার দূরত্ব হবে ৩ মিঃ বা ৯´১০´´।

**চতুর্দিকের সীমারেখা :** দু'ইঞ্চি বা ৫ সেণ্টিমিটার হবে চতুঃসীমার খোদিত রেখার পরিমাপ। আভ্যন্তরীণ খেলার মাঠের সকল দিকে ৩ মিঃ বা ৯´১০´´ পর্যন্ত থাকবে সর্ব বাধামুক্ত অবাধ বিচরণের স্থান, সর্বক্ষেত্রেই কমপক্ষে ৩মি. বা ৯´১০´´ স্থানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

ভলিনেট লম্বায় হবে ৯.৫০ মিঃ বা ৩১´ ২.৬´´ আর চওড়ায় হবে ১ মিঃ অর্থাৎ ৩´ ৩.৪´´। নেটের উচ্চতা (মাটি থেকে) হবে ২ মিঃ ৪৩ সে. মি. বা ৭´ ১১.৬´´ পুরুষদের উপযোগী আর মেয়েদের জন্য হবে ২ মি. ২৪ সে. মিঃ বা ৭´৪´´। মাঠের বহিঃসীমা থেকে পোষ্টের দূরত্ব হবে ৫০ সে. মিঃ বা ১´৪´´।

**বলের মাপ :** বলের বৃত্তের পরিমাপ হবে ৬৫ থেকে ৬৮.৫ সে. মি. অর্থাৎ ২৫.৪৮´´ থেকে ২৬.৮৫´´ আর ওজন হবে ২৫০ থেকে ৩০[illegible]ম বা ৯।১০ আউন্স। (আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার উপযোগী বলের আয়তন ও ওজন হবে যথাক্রমে ৬৫—৬৭ সে.মি. বা ২৫.৪৮´´—২৬.৩৩´´ এবং ২৫০—২৮০ গ্রাম বা ৯—৯ ৩ আউন্স)।

**খেলোয়াড়দের অধিকার ও কর্তব্য :** (১) প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই খেলার কানুনগুলিকে জানতে ও সেইমত চলতে হবে।

(২) খেলোয়াড়দের প্রতিনিধিরূপে দলের অধিনায়কই কেবল পরিচালক বা রেকারীকে খেলার সময় সম্বোধন করতে পারে।

(৩) খেলোয়াড়দের এই আচরণ দোষণীয় হবে। যথা—

(ক) পরিচালকের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যাবে না।

(খ) অশোভন মন্তব্য করা বিধেয় নয়।

(গ) পরিচালকদের প্রভাবিত করার মত কোন অশোভন কাজ বা মন্তব্য, এমন কি অন্য দলের কারুর উদ্দেশ্যে করা যাবে না।

(ঘ) মাঠের বাইরে থেকে কোন উদ্দেশ্যমূলক নির্দেশ দেওয়া বিধেয় নয়।

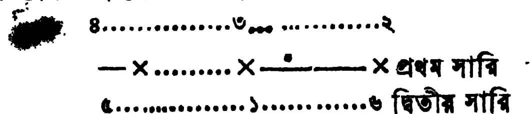
(ঙ) পরিচালকের সম্মতি ছাড়া ( খেলার বিরতির সময় বাদে ) মাঠের বাইরে যাওয়া চলবে না।

(চ) সাধারণ বা গুরুতর অপরাধের জন্য পরিচালক সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ বিরূপ মন্তব্য, চীৎকার ইত্যাদি করে, তবে সেই দলের নম্বর কাটা যেতে পারে বা সার্ভিস-এর হাতবদল হতে পারে। অন্যথায় পরিচালক তাকে বহিষ্কৃতও করতে পারেন।

**খেলোয়াড়দের প্রয়োজনীয় উপকরণ :** জার্সি, হাফপ্যান্ট এবং রবারের জুতা ( হিল-বিহীন ) হবে খেলোয়াড়দের পোষাক।

**খেলোয়াড় ও বদলী খেলোয়াড়ের সংখ্যা :** প্রতিযোগিতার সকল রকম খেলায় খেলোয়াড়ের সংখ্যা হবে ৬ জন, বদলী খেলোয়াড়দের নিয়ে সর্ব সাকুল্যে হবে ১২ জন মাত্র। খেলার ঠিক পূর্বে এদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়ে নিয়ে জানিয়ে দিতে হবে। টাইম আউটের সময় খেলোয়াড় বদল করার নিয়ম। দলের অধিনায়ক বা কোচের মারফতে পরিচালক বা আম্পায়ারের সম্মতি নিতে হবে।

**খেলোয়াড়ের স্থান-বিন্যাস :** সার্ভিসের সময় উভয় দলের খেলোয়াড়রা আপন আপন কোর্টের নিজ নিজ স্থানে থাকে। তিনজন করে খেলোয়াড় দু'টি সারিতে অবস্থান করে। নেটে যে তিনজন থাকে, তারা হলো প্রথম সারির খেলোয়াড়। বাকী তিনজন থাকে পিছনের আক্রমণ-সারিতে। নিম্নে সেই অবস্থানের সারি বিন্যাস করা গেল। যথা—



প্রত্যেক দিকের সার্ভিসের আগে ( যে ভাবের রোটেশন লিখিতভাবে স্বীকৃত হবে ) রোটেশন অনুসারে খেলোয়াড়রা স্থান বদল করবে।

**কোচ, ম্যানেজার এবং অধিনায়ক :** দলের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এঁরাই প্রকৃতপক্ষে দায়ী। কোচ ইচ্ছা করলে পরিচালককে বলে টিমের বা দলের খেলোয়াড় বদলের জন্য **টাইম আউট** প্রার্থনা করতে পারেন। বিরতির সময় মাঠে না ঢুকে কোচ তাঁর খেলোয়াড়দের নির্দেশ বা উপদেশ দিতে পারেন। মাঠে থেকে একমাত্র অধিনায়কই পরিচালকমণ্ডলীর সম্বোধন করে কিছু বলতে পারেন।

**ক্রীড়া পরিচালনার জন্য দরকার :** (১) পরিচালক, (২) ১ জন আম্পায়ার, (৩) ১ জন স্কোরার এবং (৪) দু'জন লাইন্স্‌ম্যান। **পরিচালকই** খেলা পরিচালনা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অন্য অফিসারের সমস্ত অভিমতকে তিনি প্রয়োজনবোধে নাকচ করে দিতে পারেন।

**আম্পায়ার ( পরিচালকের সাহায্যকারী ) :** আম্পায়ার থাকবেন পরিচালকের বিপরীত দিকে। তাঁর লক্ষণীয় বিষয়গুলি হলো যথা—

(১) তিনি দেখবেন যে, খেলোয়াড়রা যাতে উপরে-বা নীচে মধ্য-মাঠের রেখা বা আক্রমণ-সীমা না অতিক্রম করে।

(২) পাশের সীমারেখা বা নেট অতিক্রমণের সমস্ত দিকেই তিনি লক্ষ্য রাখবেন।

(৩) তিনি টাইম আউট বা সাইড আউট ঘোষণা করবেন।

(৪) তিনি কোচ ও বদলী খেলোয়াড়দের উভয় কোর্টের পাশে অবস্থানের ব্যবস্থা করে আয়ত্তের মধ্যে আনবেন।

(৫) তিনি কোচ বা অধিনায়কের অনুরোধে খেলোয়াড় বদলের প্রস্তাব মঞ্জুর করবেন।

(৬) তিনি লক্ষ্য রাখবেন, কোন খেলোয়াড় ( নেটের উপরের বা নীচের সমান্তরাল পর্যায়ের কোন ব্যাপার ছাড়া ) নেট স্পর্শ করল কি না।

(৭) সার্ভিসের সময় খেলোয়াড়রা নিজ নিজ স্থানে আছে কি না, তা তিনি দেখবেন।

(৮) খেলোয়াড়দের কোনরূপ অখেলোয়াড়ী মনোভাব দেখলে তিনি পরিচালক-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

(৯) পরিচালক যেভাবে তাঁর সাহায্য চাইবেন, তিনি সেইভাবে কাজ করবেন।

**স্কোরার :** স্কোরার থাকবেন পরিচালকের বিপরীত দিকে আম্পায়ারের পিছনে। তিনি বদলী খেলোয়াড়দের নাম স্কোরসিটে লিপিবদ্ধ করে নেবেন। সেই

কাগজে অধিনায়ক ও কোচদের স্বাক্ষর করিয়ে নেবেন এবং টাইম আউটের সময় পয়েন্ট ঘোষণা করবেন।

টসের পর খেলা আরম্ভের সময় খেলোয়াড়েরা কে কোন অবস্থায় আছে, তিনি তা লিপিবদ্ধ করে নেবেন। রোটেশন অর্ডার অনুসৃত হচ্ছে কিনা, তিনি তাও লক্ষ্য করবেন।

**লাইন্‌সম্যান :** সাধারণতঃ দু'জন লাইন্‌সম্যান থাকেন। তাঁরা উভয় দিকে সার্ভিস এরিয়ার অপরদিকে ৩ মিটার দূরে অবস্থান করেন। বল আউট হ'ল কি-না, তাঁরা সেটাই লক্ষ্য করেন। সার্ভিসের কোন দোষ হ'লে তিনি পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

**খেলার সময় ও দিক নির্ধারণ :** সাধারণতঃ দুই বা তিন খেলায় প্রতি-যোগিতার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে থাকে। পর পর অথবা তিন খেলার মধ্যে দুটি খেলায় জয়ী হ'লে সেই দলকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। আন্তর্জাতিক খেলা অবশ্য দুইটি গেমেই নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

টসে বিজয়ী দল ইচ্ছে করলে কোর্ট অথবা প্রথম সার্ভিস দিতে পারে। চূড়ান্ত মীমাংসার পূর্বে বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় টসের দ্বারা কোর্ট বা সার্ভিস গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। প্রত্যেক খেলার শেষে কোর্ট বদল করার নিয়ম।

**টাইম আউটের নিয়ম :** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে টাইম আউট দেওয়া হবে যথা—

(ক) বল মাঠের বাইরে গেলে, পরিচালক বা আম্পায়ার টাইম আউট ঘোষণা করতে পারেন। বিশ্রাম বা খেলোয়াড় বদলের জন্যও অধিনায়ক টাইম আউট চাইতে পারেন।

(খ) টাইম আউটের সময় কোচের নির্দেশ ছাড়া কোর্টের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ।

(গ) একটি খেলায় মাত্র দুবার টাইম আউট পাওয়া যেতে পারে ( ১ মিঃ করে দু মিঃ মাত্র )।

(ঘ) ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছায় তৃতীয় বার টাইম আউট প্রার্থনা করলে পরিচালক তাকে ( অধিনায়ককে ) সতর্ক করে দিতে পারেন।

(ঙ) খেলোয়াড় বদল করার অব্যবহিত পরেই খেলার সূচনা করতে হবে।

(চ) কোন খেলোয়াড়ের খুব আঘাত লাগলে তিন মিনিট পর্যন্ত টাইম আউট মঞ্জুর হতে পারে, চতুর্থ বা পঞ্চম বারের খেলার সময় ৫ মিনিটের বিরতি দেওয়াই বিধেয়।

**খেলার সুরু ও সার্ভিস রীতিঃ** সার্ভিস করা থেকেই খেলার সূচনা হবে। পিছনের সারির ডান দিকের খেলোয়াড়ই প্রথম সার্ভিস্ করবে। হাতের তালু দিয়ে (খোলা বা মুঠো অবস্থায়) আঘাত করে নেট টপকে বিপক্ষ কোর্টে বল পাঠানোই সার্ভিসের উদ্দেশ্য। সাইড্ আউট ঘোষিত হলে বা সার্ভিসকারী দল কোন অপরাধ করলেই সার্ভিস বদল হবে।

**কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সার্ভিস নাকচ হবে?** (১) বল যখন নেট স্পর্শ করে বিপক্ষ কোর্টে যাবে।

(২) বল যখন নেটের খুব উপর দিয়ে অন্য কোর্টের বাইরে গিয়ে পড়বে।

(৩) নেটের নীচে দিয়ে বা সাইড্ লাইনের বরাবর নেটের উপর দিয়ে যাবে।

(৪) বিপক্ষ কোর্টে যাওয়ার আগে যদি নিজ কোর্টের কারুর গায়ে লাগে বা অন্য কিছুতে লাগে।

(৫) সার্ভিসের ত্রুটিবশতঃ সার্ভিসের সুযোগ হস্তান্তরিত হবে।

**রোটেশনের নিয়মঃ** যে দল সার্ভিস পাবে, সেই দলের খেলোয়াড়রা ঘড়ির কাঁটার মত বৃত্তাকারে নিজ নিজ স্থান বদল করবে। প্রথম খেলার শেষেও খেলোয়াড়রা স্থান বদল করে খেলতে নামবে।

**কিভাবে বলে আঘাত করতে হবে?** (১) কোমরের উপর অবস্থি যে কোন অঙ্গ দিয়ে বলে আঘাত করা যেতে পারে।

(২) কোমরের নীচের কোন অংশ দিয়ে বল স্পর্শ করা বিধেয় নয়।

(৩) হাতের মধ্যে বা বাহুর কোন স্থানে লেগে বলের গতি (১০ সেকেণ্ডের বেশী সময়) সাময়িকভাবে রুদ্ধ হলে, তাকে হোল্ডিং বলে ধরা হবে।

(৪) স্কুপ করা, টেনে তোলা, ঠেলে দেওয়া প্রভৃতিও হোল্ডিং-এর পর্যায়ভুক্ত হবে।

(৫) একই সঙ্গে একাধিকবার হাতে স্পর্শিত হলে তাকে "দ্বৈত-স্পর্শ" বা ডাবলিং' বলে ধরা হবে (দেহের যে কোন অংশে লেগে হ'লেও)।

**দু'জন খেলোয়াড়ের দ্বারা প্রতিহত হলেঃ** দ্বৈত খেলোয়াড়ের দ্বারা প্রতিহত হয়ে বল যে দিকে পড়বে, সেই দল আবার তিন বার বলটি স্পর্শ করতে (অবশ্য তিন জনের দ্বারা) পারবে। দু'জন প্রতিযোগী খেলোয়াড়ের দ্বারা পৃষ্ট হয়ে বল যে দিকের কোর্টে পড়বে, সেই দলের বিপক্ষে পয়েন্ট হবে। অন্যপক্ষে বল যে দিকের মাঠের বাইরে যাবে, সেই দলের বিপক্ষে একটি পয়েন্ট হবে।

এক সঙ্গে একই টিমের দু'জনে বল স্পর্শ করলে প্রকৃতপক্ষে যদি একজনই বল খেলে থাকে, এ-ক্ষেত্রে একবার স্পর্শিত হয়েছে বলে ধরা হবে। আর যদি একই সঙ্গে দু'জনে বলে আঘাত করে থাকে, তবে তাকে দ্বৈত-স্পর্শ বলে ধরা হবে।

**ডবল ফাউল :** উভয় পক্ষে দলের দু'জনেই যদি একই সঙ্গে ফাউল করে থাকে, তবে আবার খেলা হবে।

**ব্লকিং বা বাধা সৃষ্টি করা :** প্রতিপক্ষের আক্রমণ ধারাকে আত্ম-রক্ষী দলের একাধিক ব্যক্তি দেহের যে কোন অংশ দিয়ে ( অবশ্য কোমরের উপরের অংশ ) প্রতিঘাত করার চেষ্টাকে বলে ব্লকিং। যারা এই কাজে ব্যাপৃত হবে, তারা ছাড়া অন্য খেলোয়াড় দ্বিতীয় বার সেই বল স্পর্শ করতে পারবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে অবশ্য দূরত্ব থাকবে ৩´৩·৪´´ বা (১ মিটার)। এই প্রতিহত হয়ে প্রতিবন্ধকারী দলের বিপক্ষে কোর্টে গেলে, সেই দল আবার তিনটি টাচ করতে পারবে।

**নেটের স্পর্শ ইত্যাদি :** (১) খেলার সময় বল নেট টাচ করলে, খেলা চলতে থাকবে।

(২) নেটের উপরিভাগে লেগে বল গড়িয়ে অন্য দিকে পড়লে খেলা চলবে।

(৩) কোন খেলোয়াড় নেট স্পর্শ না করা অবধি নেট-সংলগ্ন বল নিয়ে খেলা চলতে থাকবে।

(৪) নেটে খুব জোরে বল লাগার পর দোদুল্যমান নেট কাউকে স্পর্শ করলে, তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

(৫) উভয় পক্ষের দু'জন এক সঙ্গে নেট স্পর্শ করলে, আবার রিসার্ভিস হবে।

**নেট ক্রশের নিয়ম :** (১) হাত নেটের উপর দিয়ে গিয়ে যদি অন্য কোর্টের বলকে স্পর্শ করে, তবে তা নেট ক্রশ বলে গণ্য হবে।

(২) অন্যপক্ষে কেবল ব্লক সৃষ্টি করার জন্য বল স্পর্শ না করে হাত দিলে নেট ক্রশ করলেও তা দোষণীয় হবে না।

**মধ্য-রেখার বহির্গমন :** কোন খেলোয়াড় শূন্যে বা নীচে মধ্য-রেখা অতিক্রম করে অন্য পক্ষের কোর্টে গেলে, তা দোষণীয় হবে। প্রতিপক্ষে কোন খেলোয়াড়কে স্পর্শ না করেও শূন্যে দেহের কোন অংশ মধ্য-রেখা অতিক্রম করলেও ঐ দোষ বলে ধরা হবে। বাঁশী বাজার পর অন্য কোর্টে প্রবেশ করা যাবে।

**শেষ লাইনের খেলোয়াড় :** (১) পিছু লাইনের কোন খেলোয়াড় ব্লকিং করতে পারবে না। (২) আক্রমণের লাইনে এসে বার বার প্রতিপক্ষের বল ফিরাতে পারবে না।

(৩) শেষ লাইনের কোন খেলোয়াড় শেষ লাইনের বাইরে সার্ভিস লাইনের কাছে থাকলেও তাকে তার চৌহদ্দির মধ্যেই আছে বলে ধরা হবে। সে নেটের বলকে আঘাত করতে পারবে না।

**কোন্ ক্ষেত্রে বল খেলার অন্তর্গত বলে গণ্য হবে না :** (১) নেটের 'মার্কারে'র বাইরে যে বল স্পর্শ করবে ; (২) যে বল মাঠের বাইরের জমি বা কোন কিছুকে স্পর্শ করবে ; (৩) টাচ্ লাইনকে স্পর্শ করলে, সে বল কিন্তু খেলা চলবে ; (৪) বংশীধ্বনির পরের বলকে **মৃত বা ডেড বল** বলে ধরা হবে।

**পয়েণ্ট বা সাইড আউট :** কি কি ক্ষেত্রে এক দলে সার্ভিস্ নষ্ট হবে আর অন্য দল পয়েণ্ট পাবে, তা নিয়ে দেওয়া গেল। যথা—

এই সব ক্ষেত্রে সার্ভিস যাবে, যখন—

(ক) বল মা'টি স্পর্শ করলে, (খ) কোন দল তিনবারের বেশী স্পর্শ করলে, (গ) কোমরের নীচের কোন অংশ স্পর্শ করলে, (ঘ) লোপিং বা পুশিং-এর জন্য, (ঙ) একই খেলোয়াড় এক সঙ্গে দু'বার স্পর্শ করলে, (চ) সার্ভিসের সময় "ফুট-ফল্ট্" হলে (ছ) দলের কেউ নেট টাচ্ করলে, (জ) মধ্য-রেখা ছুঁলে বা পার হলে, (ঝ) বিপক্ষ কোর্টের বলকে নেটের উপর দিয়ে স্পর্শ করলে, (ঞ) পিছনের খেলোয়াড আক্রমণ সীমায় এসে ভুলক্রমে অন্য কোর্টে বল পাঠালে, (ট) বল আউট হলে নেটের নীচে দিয়ে গেলে, মাঠের বাইরের কোন কিছুতে স্পর্শ করলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে, (ঠ) দলের কোন একটি খেলোয়াড়কে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করা হলে, (ড) পরিচালকের নিষেধ সত্ত্বেও কোচ বা ম্যানেজারের স্বেচ্ছাকৃত নির্দেশের জন্য, (ঢ) দু'দলের দু'জন আগে পিছে এক সঙ্গে দোষ করলে, প্রথম অপরাধই ধরা হবে ; আর একই সঙ্গে হলে আবার খেলা হবে, (ণ) নেটের নীচে গিয়ে বল স্পর্শ করলে, বিপক্ষ দলের কাউকে ছুঁলে প্রভৃতি ক্ষেত্রে, (ত) স্বেচ্ছাকৃতভাবে বার বার খেলায় বিলম্ব ঘটালে, (থ) অবৈধভাবে খেলোয়াড়রা স্থান বদল করলে, (দ) তৃতীয় দফায় বিরতি চাইলে, (ধ) একাধিকবার খেলায় বাধা সৃষ্টি করলে, (ন) খেলোয়াড় বদলের জন্য এক মিনিটের বেশী সময় নিলে, (প) পরিচালকের বিনা অনুমতিতে মাঠ ত্যাগ করলে, (ফ) পায়ের শব্দে বা অন্য কোন উপায়ে বিপক্ষের কাউকে ভয় দেখালে, (ব) অবৈধভাবে বাধা সৃষ্টি করলে।

**সার্ভিসকারী দল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সার্ভ হারাবে :**

(১) সার্ভের নির্ধারিত স্থান থেকে সার্ভ না করলে, (২) সার্ভ নেট পার হয়ে বিপক্ষ কোর্টে প্রবেশ করার আগে সার্ভিসকারী নিজ কোর্টের শেষ রেখা স্পর্শ

করলে, (৩) নিজ দলের কারুর সাহায্যে সার্ভের বল অন্য কোর্টে গেলে (৪) সার্ভের সময় রোটেশনের নিয়ম না মানলে, (৫) ঠিকমত সার্ভ করা না হলে।

**পয়েন্ট গণনার নিয়ম:** (১) ১৫ পয়েন্টের গণনায় খেলা হয়ে থাকে। খেলায় দু'পয়েন্টের ব্যবধান না থাকলে কোন টিম জিততে পারে না। নম্বর গণনায় যখন উভয় দলের সংখ্যা ১৪—১৪ এই পর্যায়ে পৌঁছাবে, তখন সম্ভাব্য জয়ের জন্য ভাবী বিজয়ী দলকে এইভাবে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে হবে। যথাক্রমে এমনতর ফলাফল হওয়া চাই ১৬—১৪, ১৭—১৫, ১৮—১৬, ১৯—১৭ ইত্যাদি।

(২) যখন যে কোর্টে বল আসবে, তখন সেই দল যদি ঠিকভাবে বিপক্ষ কোর্টে বল পাঠাতে না পারে, তবে বিপক্ষদল একটা পয়েন্ট পাবে।

**খেলা বাতিলের নিয়ম:** কোন দল যদি পরিচালকের নির্দেশ সত্ত্বেও খেলতে অনিচ্ছুক হয়, তখন সেই দলের পূর্ব ফলাফলকে বাতিল করে দেওয়া হবে। আর অন্য দলের স্বপক্ষের স্কোর ধরা হবে যথাক্রমে ১৫—০ (সেই পর্বের জন্য) অথবা ৩—০ (সেই খেলার জন্য।

## হকিখেলা

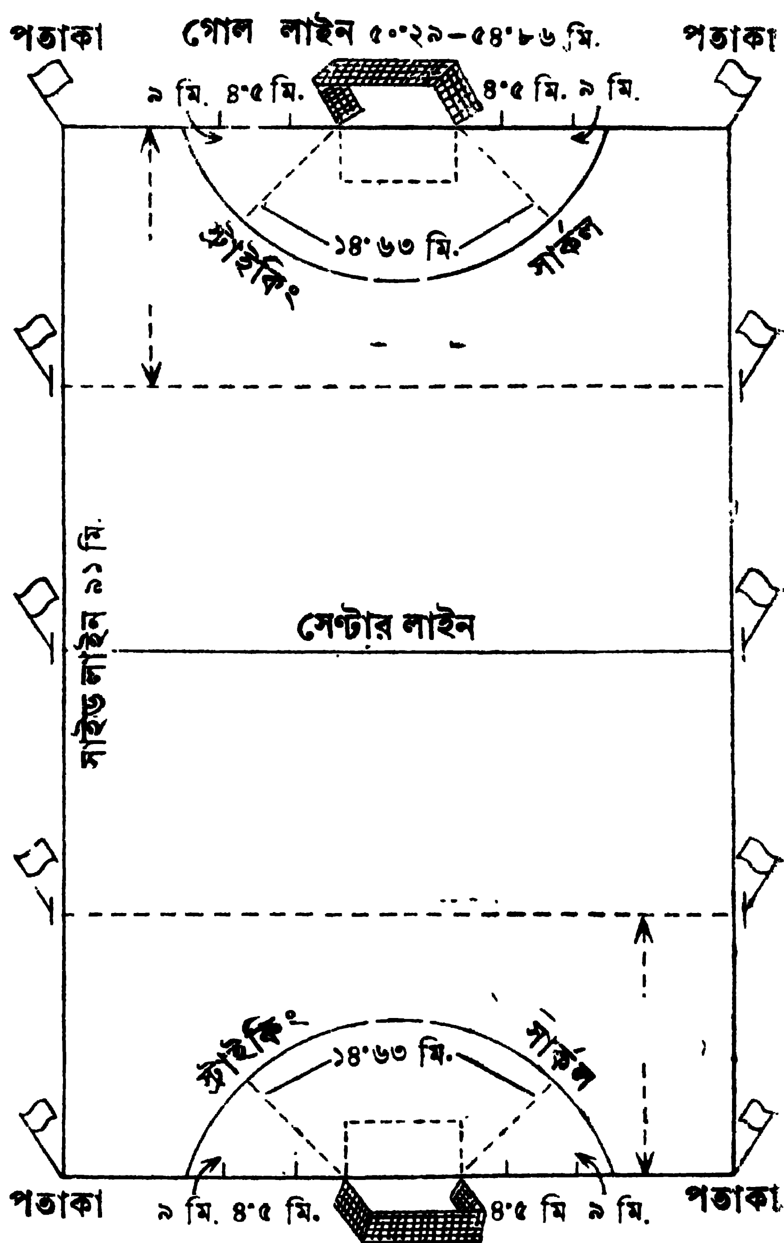
হকি একটি সুপ্রাচীন বহির্ময়দানের (outdoor) এবং ভারতের জাতীয় খেলা। এর উদ্ভব স্থান ভারতবর্ষ বলে অনেকে অনুমান করেন। দু রকমের হকিখেলার রেওয়াজ দেখা যায়, (ক) **ফিল্ড হকি**, ও (খ) **আইস হকি**। এই ফিল্ড হকিতেই ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ১৯২৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। এখন অবশ্য ভারতীয় হকির সে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য নেই।

১। **দল ও খেলার সময়:** (ক) দুই দলের মধ্যে হকি খেলা হয়। উভয় দলেই ১১জন করে খেলোয়াড় থাকে। মাঠে একাধিক গোলকীপার রাখার নিয়ম নেই। খেলা চলাকালীন মাত্র একবার দু'জন খেলোয়াড় বদল করতে দেওয়া হয়।

(খ) প্রতি অর্ধে ৩৫মিনিট করে খেলা হয়, পাঁচ মিনিট থাকে বিরতি। এই বিরতির সময় উভয় দল প্রান্ত পরিবর্তন করবে।

২। **অধিনায়ক:** (ক) খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে অধিনায়করা টসে প্রান্ত বেছে নেবেন।

৩। **খেলার মাঠ:** হকি খেলার আয়তক্ষেত্রাকার মাঠের দৈর্ঘ্য ৯১ মিটার (১০০ গজ), চওড়া ৫০·২৯ থেকে ৫৪·৮৬ মিটার (৫৫ থেকে ৬০ গজ) বেশী


পতাকা
গোল লাইন ৫০·২৯—৫৪·৮৬ মি.
পতাকা
৯ মি. ৪·৫ মি.
৪·৫ মি. ৯ মি.
১৪·৬৩ মি.
স্ট্রাইকিং
সার্কল
সাইড লাইন ৯১ মি.
সেণ্টার লাইন
স্ট্রাইকিং
১৪·৬৩ মি.
সার্কল
পতাকা
৯ মি. ৪·৫ মি.
৪·৫ মি ৯ মি.
পতাকা

হকি মাঠ

হবে না। মাঠের চার পাশে টানতে হয় সাদা সীমা রেখা। দু'পাশের বৃহত্তর সীমা রেখা দুটিকে বলে সাইড-লাইন এবং ক্ষুদ্রতর দুটিকে বলা হয় গোল লাইন। আগাগোড়া গোল লাইনের প্রস্থ হবে ৭·৫ সে.মি. (তিন ইঞ্চি)। [মাঠের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত চিত্র দেখ।]

৪। **গোল পোষ্ট (ক)** : প্রত্যেক গোল-লাইনের ঠিক মাঝখানে গোল-পোষ্ট ওপরে থাকবে ক্রসবার। দু' পোস্টের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে ৩·৬৬ মিটার (৪ গজ)। মাটি থেকে ক্রসবারের উচ্চতা হবে ২·১৩ মিটার (৭ ফুট)। পোষ্ট ও বার হবে ৫ সে. মি. (দু' ইঞ্চি) চওড়া। জাল দিয়ে গোলের তিন পাশ আটকানো থাকবে আর পিছনে থাকবে গোল বোর্ড।

৫। **স্ট্রাইকিং সার্কেল** : প্রত্যেক গোলের সম্মুখে গোল লাইন থেকে ১৪·৬৩ মিটার (১৬ গজ) দূরে গোল লাইনের সমান্তরাল ভাবে ৩·৬৬মিটার (৪ গজ) লম্বা এবং ৭·৫ সে. মি. (৩ ইঞ্চি) চওড়া সাদা লাইন টানতে হয়। এই লাইন দু'টিকে এমন ভাবে টানতে হবে, যাতে সেই রেখা দু'টি গোল লাইনের সঙ্গে মিশে অর্ধবৃত্ত তৈরি হয়। এই লাইনগুলি ও গোল-লাইন দিয়ে ঘেরা এলাকাটুকুকে বলা হয় স্ট্রাইকিং সার্কেল।

৬। **বল** : বলটি হবে সাদা চামড়ায় মোড়া গোলাকার, ওজন ১৬৩ গ্রাম (৫$\frac{3}{4}$ আউন্সের) অনধিক হবে। বলের পরিধি হবে ২২ সে. মি. (৮$\frac{13}{16}$ ইঞ্চি) থেকে ২৩ সে. মি. (৯$\frac{1}{4}$ ইঞ্চির) অনধিক।

৭। **স্টিক** : হকি স্টিকের ওজন ৩৪০ গ্রামের (১২ আউন্স) কম বা ৭৯৪ গ্রামের (২৮ আউন্স) বেশী হবে না।

এই স্টিকটি শুধু বাম ধারেই সমতল মুখ বিশিষ্ট হবে। স্টিকের অগ্রভাগ কখনই ধার বিশিষ্ট বা ধাতু নির্মিত হবে না।

৮। **বুট ইত্যাদি** ; আম্পায়ারদের মতে যে জুতো অন্য পক্ষের পক্ষে বিপদজনক বলে মনে হবে, তা ব্যবহার করা চলবে না।

৯। **বুলি** : বল 'বুলি' করার জন্য উভয় দলের একজন করে খেলোয়াড় স্কোয়ার ভাবে সাইড লাইনের দিকে মুখ করে ও নিজ গোল লাইনের ডান দিকে রেখে দাঁড়াতে হবে। বলটি মাঝখানে রেখে উভয় খেলোয়াড় স্টিক দিয়ে মাটি স্পর্শ করে পর পর তিন বার পরস্পর স্টিকে আঘাত করে যে কোন একজন বল মেরে খেলা আরম্ভ করবে।

**গোল** : দু' গোল পোষ্টের ভিতর দিয়ে এবং ক্রসবারের নিচে দিয়ে বল যদি

গোললাইন পার হয়ে গোলে প্রবেশ করে, তা হলে গোল হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এই পেনাল্টি এলাকার মধ্যে অর্থাৎ বৃত্তের সীমারেখার মধ্যে থেকে বল না মারলে, গোল হবে না।

**ফ্রি-হিট্‌ :** ১৪'৬০ মিটারের ( ১৬ গজে ) মধ্যে প্রতিরক্ষ দল ফ্রি-হিট পেলে, হিটটি আইন লঙ্ঘনের স্থানের উপর দিয়ে সাইড লাইনের সমান্তরাল ঐ দূরত্বের একটি লাইনের উপরের যে কোন জায়গা থেকে নেওয়া যায়। এই বল স্কুপ করা বিধি সঙ্গত নয়। এই বল মারার সময় ৪'৫৭ মিটারের ( ৫ গজ ) মধ্যে কেউ থাকতে পারবে না। বলের গায়ে কোন কারণে স্টিক না লাগলে খেলোয়াড় বল মারতে পারবে না। ফ্রি-হিট করার পর অন্য কোন খেলোয়াড় ঐ বল স্পর্শ না করা পর্যন্ত যিনি হিট করেছেন, তিনি আর ঐ বল হিট করতে পারবেন না।

বৃত্তের বাইরে ঐ নিয়ম লঙ্ঘিত হলে, বিপক্ষ দল ফ্রি-হিট পাবেন। বৃত্তের ভিতরে আক্রমণকারী দলের কেউ যদি ঐ নিয়ম ভঙ্গ করে, তবে, প্রতিরক্ষাকারী দল ফ্রি-হিট পাবেন।

**অফ্‌ সাইড :** যদি কোন আক্রমণকারী বিপক্ষ দলের তিন জনের কম খেলোয়াড়ের আগে থেকে বল ধরে মারার চেষ্টা করে, তবে সে অফ্‌-সাইড হবে। কেউ অফসাইড হলে প্রতিরক্ষা দল ফ্রি-হিট পাবেন।

**রোল-ইন :** বল সাইড-লাইনের বাইরে গেলে, অন্য দলের খেলোয়াড় মাঠের পার্শ্ব লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে, স্টিক ও পা লাইনের বাইরে রেখে বলটি গড়িয়ে ভিতরে দিতে হবে। এর নাম রোল-ইন। অন্য কোন খেলোয়াড় সে বল স্পর্শ করার পূর্বে উক্ত খেলোয়াড় ঐ বল মারতে পারবে না। ঐ নিয়ম লঙ্ঘিত হলে, বিপক্ষ দল রোল-ইন করবেন।

**কর্ণার :** কর্ণার ফ্ল্যাগের তিন গজ দূরবর্তী যে কোন স্থান থেকে কর্ণার হিট নেওয়া যায়। কর্ণার হিটে সরাসরি গোল হয় না। বিপক্ষ দলের যিনি কর্ণার মারবেন, তিনি ছাড়া সকলেই গোল-বৃত্তের বাইরে থাকবেন।

**পেনাল্‌টি কর্ণার :** পেনাল্টি কর্ণারের সময় আত্মরক্ষাকারী দলের গোল লাইনের যে কোন স্থানের উপর থেকে ফ্রি-হিট নেওয়া যায়, অবশ্য তা নিতে হবে গোল পোস্টের দশ গজ দূর থেকে। এ সময় আত্মরক্ষাকারী দলের সর্বাধিক ৬ জন খেলোয়াড় গোল লাইনের পিছনে থাকতে পারবেন।

**পেনাল্টি স্ট্রোক :** যদি কোন প্রতিরক্ষাকারী দলের খেলোয়াড় গোল বাঁচাবার জন্ম বৃত্তের মধ্যে যেচ্ছায় কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন, তা' হলে বিপক্ষ দল

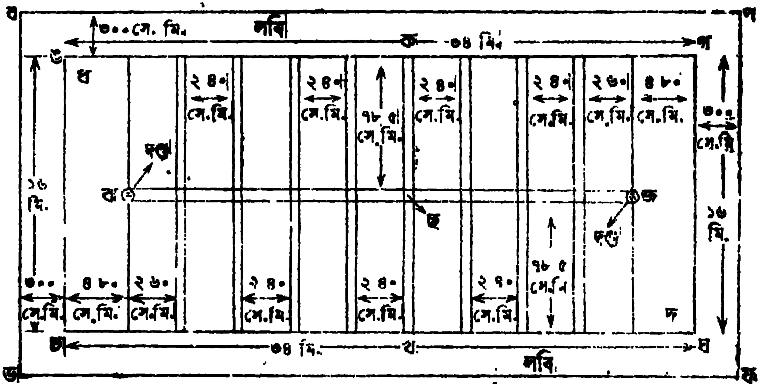
পেনাল্টি স্ট্রোক পাবেন। যদি আত্মরক্ষাকারী খেলোয়াড়ের অনিচ্ছাকৃত অপরাধে অবধারিত গোল রক্ষা পায়, তা হলে বিপক্ষ দল পেনাল্টি স্ট্রোক পাবেন। পেনাল্টি স্ট্রোকের সময় খেলোয়াড়রা থাকবেন ২৫ গজ লাইনের বাইরে।

**আম্পায়ার:** হকি খেলা সাধারণতঃ দু'জন আম্পায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রতি অর্ধ মাঠে থাকেন একজন আম্পায়ার। যেখানে একজন আম্পায়ার থাকেন, সেখানে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য থাকেন দু'জন লাইন্সম্যান। তবে সব ব্যাপারে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

## খো-খো-খেলা

**খো-খো:** মহারাষ্ট্র দেশের অতি জনপ্রিয় দেশী খেলা। ভারতের অন্যান্য অংশেও এ খেলার প্রচলন দেখা যায়।

**খেলার মাঠ:** খো-খো-খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য ৩৪ মিটার, চওড়া ১৬ মিটার:



*খো-খো খেলার মাঠ*

দু'প্রান্তে ১৬ মিঃ দৈর্ঘ্য ও ৪৮০ সে.মি. প্রস্থ পরিমাণ স্থান বাদ রেখে দুটি খুঁটি পোতা হয়। এই দণ্ড দুটিকে একটি পথের দ্বারা সংযোগ করতে হয়। এর নাম **কেন্দ্র পথ**। কেন্দ্র পথের দৈর্ঘ্য হবে ২৪০ সে.মি. এবং প্রস্থ হবে ৩০ সে.মি. এই কেন্দ্র পথের উপরে এক সেন্টিমিটার মাপের ৮টি ছোট বর্গক্ষেত্র থাকবে। আবার কেন্দ্র পথের সমকোণে থাকবে সমান দু ভাগে বিভক্ত ৮টি এড়ো পথ. যে পথ ছোট বর্গক্ষেত্রের উপর দিয়ে অতিক্রম করে এবং দুদিকে ৭৮৫ সেন্টিমিটারে সীমারেখা পর্যন্ত যায়। [ মাঠের চিত্র দেখ ]

মাঠের নক্সাটি দেখলেই বুঝা যাবে।

**দল:** খো-খো-খেলায় থাকে দুটি দল। প্রতি দলে থাকে ৯ জন করে

খেলোয়াড়। এক দলকে বলা হয় **ধাবক**, অন্য দলের নাম **অনুধাবক**। অনু-ধাবকেরা অবস্থান করে ছোট বর্গক্ষেত্রের উপর। তারা বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ধাওয়া করে ও ছুঁতে পারলেই তারা **আউট** হয়। যাদের পিছনে অনুধাবকরা ছুটে যায়, তারাই হলো ধাবক। যে অনুধাবক যখন দৌড়াবে, সে তখন সক্রিয় অনুধাবক।

**খেলা :** টসে জেতার পর বিজয়ী অধিনায়ক ঘোষণা করেন, তারা কোন কোন ভূমিকায়—( ধাবক বা অনুধাবক ) অবতীর্ণ হবে। ৮ জন অনুধাবক ছোট বর্গক্ষেত্রের উপর বিপরীতমুখী হয়ে বসে। আর নবম অনুধাবক সক্রিয়, অনুধাবক হয়ে ধাবকদের অনুসরণ করার জন্য যে কোন একটি দণ্ড ধরে দাঁড়ায়। সে এদিক ওদিক যেতে পাবে না, তাকে কেন্দ্রপথ অতিক্রম করতে হয়।

অনুধাবক বিপক্ষ দলের কাউকে ছুঁতে না পারলে, সে নিজ দলের কোন একজনকে স্পর্শ করে জোরে খো-শব্দ করে। তখন **খো-পাওয়া** খেলোয়াড় উঠে দাঁড়ালে খো-দেওয়া খেলোয়াড় সে জায়গায় বসে পড়ে।

খেলার আগে ধাবক দল তিন উপদলে বিভক্ত হয়ে একসঙ্গে তিনজন করে মাঠে নামে। তখন সক্রিয় অনুধাবকরা ঐ তিন জনকে ছুঁয়ে দিতে পারলে অন্য একটি উপদল মাঠে নামে।

খো-খো- খেলার দুটি ইনিংস, ৭ মিনিটের চারটি আবর্তে বিভক্ত। দু'টি আবর্তে একটি ইনিংস হয়।

অনুধাবক দল ধাবক দলের যত জনকে আউট করতে পারে, ততই অনুধাবক দলের স্বপক্ষে পয়েন্ট হয়। ৭ মিনিটের আগেই যদি সবাই আউট হয়ে যায়, তবে তাকে বলে লোনা। যারা বেশী পয়েন্ট পায়, রেফারী তাদের বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন।

সমান পয়েন্ট হলে অতিরিক্ত একটি পর্যায়ের খেলা হয়। সে খেলাতেও যদি মীমাংসা না হয়, আবার নূতন করে খেলতে হয়। কোন দল ১২ বা ততোধিক পয়েন্ট পেলে, বিপক্ষ দলকে আর একটি পর্যায় খেলতে হয়।

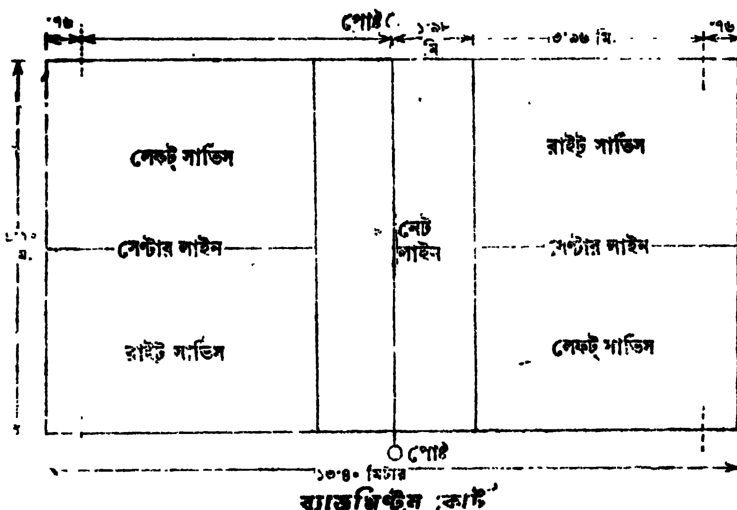
**খেলার পরিচালক :** দু'জন আম্পায়ার মাঠের দু' পাশ থেকে খেলা পরি-চালনা করেন। প্রয়োজনে বাঁশী বাজান। একজন গণনাকারী থাকে। আম্পায়াররাই খেলার ফলাফল ঘোষণা করেন।

## ব্যাডমিণ্টন খেলা

ব্যাডমিণ্টন একটি বিদেশী খেলা। এখন আমাদের দেশেও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্বল্প খরচে অল্পস্থানে ২ থেকে ৪ জনে এই খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে।

**খেলার নিয়ম :** দু'ভাবে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়। যথা (১) সিঙ্গলস্ (২) ডাবলস্। প্রথমটিতে ১ + ১ জন করে মোট দুজন খেলোয়াড় লাগে। দ্বিতীয়টিতে ২ জন + ২ জন = মোট ৪জন খেলতে পারে।

**খেলার মাঠ :** আয়তক্ষেত্রাকারের মাঠের দৈর্ঘ্য ১৩'৪৯ মিটার (৪৪ ফুট), চওড়া ৬'১ মিটার (২০ ফুট), ৪ সে. মি. (দেড় ইঞ্চি ) চওড়া সাদা চুনের দাগ দিয়া লাইন




ব্যাডমিণ্টন কোর্ট

গুলি টানতে হয়। মূল কোর্টটি লম্বালম্বি দু' ভাগে ভাগ করা হয়। সেন্টার লাইন টানা বাউণ্ডারী থেকে সর্ট সার্ভিস লাইন অবধি। দুদিকে সর্ট সার্ভিস লাইনের ঠিক মাঝখানে দু'পাশের খুঁটির সঙ্গে লাগিয়ে নেট টাঙানো হয়। এই খুঁটি বা পোস্টের উচ্চতা হবে ১'৫৫ মি. (৫ ফুট ১ ইঞ্চি)। জালের উচ্চতার মাপও হবে ১'৫৫ মিটার (৫ ফুট ১ ইঞ্চি)। তবে মধ্যবর্তী স্থানে ঐ নেটের উচ্চতার মাপ হবে ১'৫২ মিটার (৫ ফুট)। নেটের বুনন ঘন ও জালের ঘরগুলি ছোট হওয়া দরকার।

**বল বা শাটল্ :** ব্যাটমিণ্টন বলকে শাটল্ বলে। পালক বা কর্কের তৈরি ওজন ৫'৫ গ্রামের বেশী নয়। ১৪ থেকে ১৬টি পালক কর্কে গেঁথে এই শাটল তৈরী হয়। পালকগুলি অনধিক ৭ সে. মি. (২½ ইঞ্চি) লম্বা হবে।

**খেলার নিয়ম :** বিজয়ী দল টসে বিজয়ী হয়ে ঠিক করে কোর্ট সার্ভিস কে নেবে। সাধারণতঃ ১৫ বা ২১ পয়েন্টে খেলা হয়। ১৫ পয়েন্টের খেলা যখন উভয় পক্ষেরই ১৩ পয়েন্ট হয়, তখন ১৩ পয়েন্ট পাওয়ার পর আরও ৫ পয়েন্ট পর্যন্ত

খেলা চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। আবার যখন উভয় পক্ষ ১৪ পয়েন্ট পায়, তখন যে পক্ষ প্রথম ১৪ পেয়েছে, সেই পক্ষ আরও ৪ পয়েন্ট খেলা চালানোর নির্দেশ দিয়ে থাকে। ২১, ১৯ বা ২০ পয়েন্টের সময়ও অনুরূপ নীতি অনুসৃত হবে।

**মেয়েদের খেলা :** মেয়েদের সিঙ্গলস্ খেলা ১১ পয়েন্টে শেষ হয়। উভয় পক্ষ ৯ পয়েন্ট পেলে যে প্রথম ৯ পয়েন্ট পেয়েছে, সে আরও ৩ পয়েন্ট খেলা চালাবার নির্দেশ দিতে পারে। আবার প্রত্যেকে যখন ১০ পয়েন্ট পায়, তখন যে প্রথম ১০ পয়েন্ট পেয়েছে, সে আরও দু পয়েন্ট খেলা চালিয়ে যেতে পারে।

**খেলার সুরু :** খেলা শুরু হয় লাভ, অল, প্লে-বলে। সিঙ্গলস খেলার সময় কোন খেলোয়াড় সার্ভিস হারালে, বলা হয় সার্ভিস ওভার। আবার ডাবলসের সময় প্রথম সার্ভারের, সার্ভিসের সময় বলা হয় স্কোর। দ্বিতীয় সার্ভার সার্ভিস হারালে বলা হয় **সার্ভিস ওভার**।

ছেলেদের কোন দলের ১৪ পয়েন্ট বা মেয়েদের কোন দলের ১০ পয়েন্ট হলে গেমে পয়েন্ট বা ম্যাচ পয়েন্ট ডাকতে হয়। খেলার শেষে ফল ও স্কোর ঘোষণা করতে হয়।

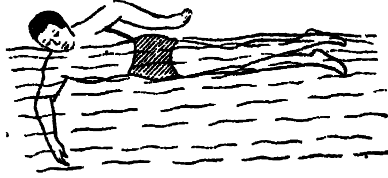
## সাঁতার

**সাঁতারের ইতিবৃত্ত :** প্রথম আদিম মানুষ কিভাবে সাঁতার কেটে ছিল, তা জানা যায়নি তবে নদী-হ্রদ পারাপারের জন্য সাঁতার শেখার প্রয়োজন হয়েছিলো। অনুমান করা হয় যে, জীবজন্তুদের সন্তরণ কৌশল অনুকরণেই মানুষ প্রথম সাঁতার কাটতে শেখে। সেটাও অবশ্য বিজ্ঞান সম্মত সাঁতার বলা চলে না, তাঁকে কুকুরে জলক্রীড়ার ভঙ্গীবলে সাঁতারুরা অভিহিত করেছেন। সাঁতার-রত মানুষের ছবি পাওয়া যায় গ্রীসের পোম্পিতে।

বিধিসম্মতভাবে সাঁতার কাটা শুরু হয় ইংলণ্ডে ১৮শ শতকে। সেই সাঁতার **সাঁতার-শৈলী ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক**। বিলাতের জাতীয় সন্তরণ সমিতি সন্তরণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন ১৮৩৭ সালে। জনৈক সেনানায়ক ম্যাথুওয়েব ১৮৭৫ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে বিশ্ববিশ্রুত হন। আমেরিকান ক্রলের উদ্ভব হয় আমেরিকায়। ট্রুডজেন ঐ সাঁতার শিখে এসে ইংলণ্ডে চালু করেন। হায়ুই অধিবাসী ডিউক খানামেবকু **বাটার ফ্লাই** সাঁতারের প্রবর্তক। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার সাঁতারু জনি উইলমুলারের নাম উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৫ সালে ১০০ গজ অতিক্রম করে বিশ্ব রেকর্ড করেন **এ্যালেন** ফোর্ড।

## আমেরিকান ক্রল বা ফ্রী-ষ্টাইল

আমেরিকান ক্রলে হাত পা হালের ও দাঁড়ের কাজ করে আর প্রতি হাতের ছুটো ভঙ্গির সঙ্গে পায়ের চারটি ষ্ট্রোক হয়। ফ্রী-স্টাইলে মাথা থেকে পা অবধি শরীরের পিছন দিকটা থাকে জলের উপরে। কিন্তু সাঁতারু যখন মাথার সামনে হাত বাড়িয়ে



আমেরিকান ক্রল সাঁতার

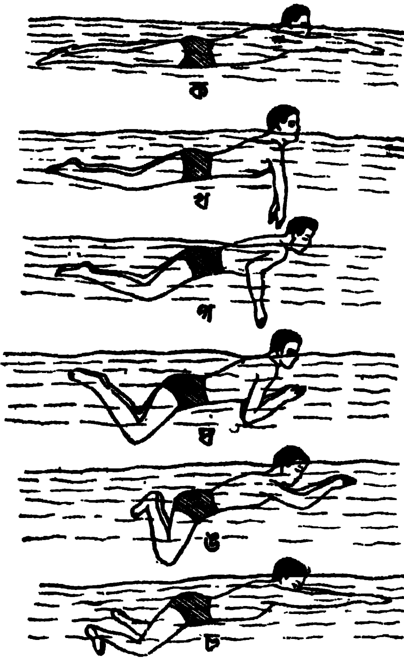
ক্রমান্বয়ে ছু'হাত বাড়িয়ে জল টানতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে দম নেওয়ার সময় সাঁতারুর মুখ দেখা যায়। এসময় তার পিঠ, গোড়ালি ও পায়ের পাতা অবধি দেখা যায় এই পদ্ধতিতে সাঁতারু হাত দিয়ে জল টেনে,পা দিয়ে জল কেটে সাবলীল ভঙ্গীমায় এগিয়ে যেতে পারে। আমেরিকান ক্রলেই বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে ৫০ সেকেণ্ড ১০০ গজ অতিক্রম করে।

**ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক :** ব্রেস্ট ষ্ট্রোক যেন ব্যাঙের সাঁতার কাটা পদ্ধতির অনুকরণ। এ সাঁতারে কিন্তু জলের উপরে সাঁতরানো যায় না। বুকের কাছ থেকে ছু'হাত সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে জল টেনে পিছনের দিকে আনতে হয়। জলের উপরে শুধু কাঁধ ও মাথা আর দেহের ভারসাম্য থাকে বুকের উপরে। পা খাড়াখাড়ি ভাবে উঠানো চলে না। সমাপ্তি রেখায় বা টার্ণ নিতে ছুহাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয়।

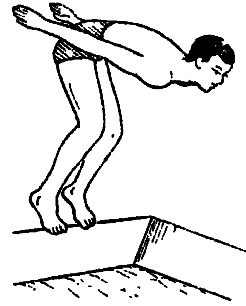
**ব্যাক ষ্ট্রোক :** আরম্ভের সময়, এই সাঁতারে ডাইভ দিয়ে নামতে হয় না। স্টার্টিং বুকের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হয়। অন্যান্য সাঁতারে যেমন মাথার দিক থেকে জল টেনে পিছনে আনতে হয়, এই সাঁতারেও চিৎ হয়ে সেই কাজ করতে হয়। এই সাঁতারে পায়ের পাতা উপরে ওঠে, আর গোঁড়ালি থাকে জলের নিচে।

## কাঁধ থাকে জলের উপর ভাসানো

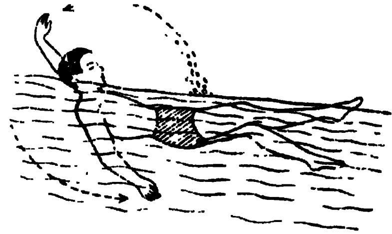
**বাটার ফ্লাই ষ্ট্রোক :** এই সাঁতারে একই সঙ্গে ছু'হাত দিয়ে সামনে থেকে পিছনে জল টেনে আনতে হয়। এ সাঁতারেও সমস্ত দেহের ভারসাম্য থাকে বুকের উপর। এই সাঁতারে পা খাড়া ভাবে উঁচু নিচু করা চলে। টার্ন নিতে বা সমাপ্তি রেখায় পৌঁছুতে হয় ছুহাত দিয়ে স্পর্শ করে।




বুক সাঁতারের বিভিন্ন ভঙ্গী।



সাঁতারে নামার মুহূর্তে



চিৎ সাঁতার

## ছেলে-মেয়েদের যে সব ইভেণ্টে প্রতিযোগিতা হয়।

(১) ফ্রী-ষ্টাইল ১০০, ২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিঃ।

(২) বেষ্ট বাটার ফ্লাই, ব্যাক ষ্ট্রোক প্রত্যেকটি ১০০ ও ২০০ মিটার।

(৩) ব্যক্তিগত মেডলি—মোট ৪০০ মিটার। পর পর করতে হয় বাটার ফ্লাই, ব্যাক ব্রেষ্ট ও ফ্রী-ষ্টাইলে।

# জাতীয় সংগীত, শিবির, নৃত্য ও ব্রতচারী

## জাতীয় সংগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ।
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ।।

**আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :** যখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় তখন সবাই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে উঠে দাঁড়ানো দরকার। ঐ সময় হাত দুখানি দেহের দু পাশে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ঝোলানো থাকবে। গান শেষ না হওয়া অবধি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

**বিদ্যালয়ের নিজস্ব গান :** প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিজস্ব যে গান শ্রেণী আরম্ভের পূর্বে বা বিশেষ অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়, সেই গানই হবে কমিউনিটি সংগীত।

**স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের জাতীয় উৎসব।** জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আমরা সবাই এই উৎসব পালন করে থাকি।

**স্বাধীনতা দিবস ঃ** ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। এ দিনে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। প্রতি বছর এই পুণ্য দিনটি প্রতি বিদ্যালয়ে পালিত হয়। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা জমায়েত হন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, জাতীয় পতাকা তোলা হয়, বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত সমবেতভাবে গাওয়া হয়। এদিনে আমরা স্মরণ করি শহীদদের, সংকল্প করি দেশের সংহতি ও স্বাধীনতা রক্ষার।

**প্রজাতন্ত্র দিবস ঃ** ২৬শে জানুয়ারী আমাদের আর এক জাতীয় উৎসব। সারা ভারত জুড়ে পালিত হয় এ দিনটি।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয় আর ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় ও প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে ঘোষিত হয়। এই দিনটিতে সারা দেশের পল্লী ও শহরবাসীরা জাতীয় পতাকা তোলেন এবং জাতীয় সঙ্গীতও গাওয়া হয়। বিদ্যালয়ে ও নানাস্থানে সভাসমিতি করা হয়। দেশ গড়ার সংকল্প নেওয়া হয় এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

**জাতীয় পাতাকাঃ** জাতীয় পতাকা হল জাতীয় মর্যাদা বোধের প্রতীক। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব পতাকা আছে। আমাদের জাতীয় পতাকায় তিনটি রঙ সমান্তরালভাবে আছে। পতাকার উপরে গেরুয়া রঙ সেবা ও ত্যাগের প্রতীক; মাঝে সাদা রঙ সত্য ও শান্তির প্রতীক; আর নিচে সবুজ রঙ—বিশ্বাস ও বীরত্বের প্রতীক। পতাকার মাঝখানে সাদা রঙের উপর গাঢ় নীল রঙের চক্র আছে। এ চক্র প্রগতি ও ন্যায়ের প্রতীক। জাতীয় পতাকা ব্যবহারের কতকগুলো নিয়ম আছে। নিয়মগুলো নিচে দেওয়া হল :—

(১) জাতীয় পতাকা তোলার সময় লক্ষ্য রাখবে যেন গেরুয়া রঙটি উপরের দিকে থাকে। (২) জাতীয় পতাকা থাকবে সব পতাকার উপরে। (৩) পতাকা কখনোও কাত বা শায়িত করে বয়ে নিয়ে যাবে না। উপরে তুলে নিয়ে যাবে। শোভাযাত্রায় পতাকা পুরোভাগে থাকবে। পতাকাবাহী তার ডান কাঁধে উঁচু করে বয়ে নিয়ে যাবে। (৪) কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের দিনে সাধারণ মানুষ জাতীয় পতাকা তুলতে পারেন। (৫) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রধান প্রধান অফিসে বারো মাসই জাতীয় পতাকা উড়িয়ে রাখবে। (৬) সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পতাকা নামিয়ে নিতে হবে।

## ভ্রমণ শিবির (বা ক্যাম্পিং)

বছরের তিনশ পয়ষট্টি দিন যদি একই ছকের মধ্য দিয়ে মানুষকে দিন কাটাতে হয় তাহলে মানুষের মন নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্যই প্রয়োজন মাঝে মাঝে একটু বাইরে ঘুরে আসার—সেই বাইরে খুব কাছেও হতে পারে আবার দূরেও হতে পারে। একটানা কাজের মধ্যে হঠাৎ দু চারদিন বাইরে মুক্ত হাওয়ার বন্ধনহীন জীবন কাটিয়ে এলে পরবর্তী কাজের জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনাও পাওয়া যায়।

ছাত্রছাত্রীদেরও এই দু একদিন বাইরে মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে আসা প্রয়োজন। এই ঘুরে আসাকে বলা হয় ভ্রমণ শিবির বা ক্যাম্পিং। বিদেশে এই ক্যাম্পিং-এর প্রচলন খুব বেশী, আমাদের দেশে এন, সি, সি, স্কাউট বা কয়েকটি সংস্থা আছে যারা এই ভ্রমণ শিবিরের আয়োজন করে থাকেন।

একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষ, তাঁবু, খাবার-দাবারসহ কিছু ছাত্রছাত্রী নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোনো অঞ্চলে চলে যাবেন। তার আগে অবশ্য সে জায়গাটি দেখে আসবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন। শিক্ষক শিক্ষিকারাও থাকবে তাদের সঙ্গে। জায়গাটি এমন হওয়া প্রয়োজন, যেখান থেকে লোকালয় বেশ কিছুটা দূরে, পানীয় জলের অভাব নেই, রান্না করার জন্য

যথেষ্ট জ্বালানী পাওয়া যাবে। নৌকা, মোটরগাড়ী, সাইকেল অথবা পায়ে হেঁটেও যাওয়া যেতে পারে। যদি স্থানটি আগে দেখে না আসা হয়ে থাকে, তবে সন্ধ্যার আগেই পছন্দ মত জায়গা বেছে নিতে হবে। এ ধরণের তাঁবু খাটিয়ে ঠিক পাশে খোলা জায়গায় উনুন করে রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে। ভ্রমণ শিবিরের সদস্যদের সাথে থাকবে—চাদর, মশারি, স্লীপিং ব্যাগ, শীতকালে সোয়েটার, বর্ষার সময়ে বর্ষাতি, জুতো, হাওয়া ভরা বালিশ, গামছা, ফার্স্ট এইডের বাক্স, সাবান, দাঁতন, থালা-বাটি-গেলাস, টর্চ, ছুরি, দিয়াশলাই, নোটবুক, পেন্সিল, স্টোভ, জলের জাগ, ফ্লাস্ক, দড়ি, তার, পেরেক, হাতুড়ি ইত্যাদি। একটা ক্যামেরা সাথে থাকলে ভালো হয়। তবে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া যেন বাড়তি কিছু নেওয়া না হয়।

একদিন বা দুদিন নিজেরাই রান্না করে, তাঁবুতে থেকে ফিরে আসবে ছাত্র-ছাত্রীরা। ফিরে আসার সময় সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে আসতে হবে। সম্ভব হলে নোংরাগুলি পুড়িয়ে ফেলবে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চার-পাঁচটি দলে ভাগ করতে হবে। এক এক দলে থাকবে পঞ্চাশ থেকে একশ' জন। বছরের বিভিন্ন সময়ে এক একটি দলকে নিয়ে একজন বা দুজন শিক্ষক-শিক্ষিকা বেরিয়ে পড়বেন বিভিন্ন দিকে। তবে মনে রাখতে হবে, যে অঞ্চলে তারা যাবে, সে অঞ্চলে যেন এমন কিছু করে না আসে যাতে তাদের বিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট হয়।

এই ভ্রমণ শিবির মানসিক উৎসাহলাভ ছাড়াও ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার কাজেও লাগে। বাড়ির বাইরে অপরিচিত আবহাওয়ায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া দলগতভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করা, এবং হঠাৎ উদ্ভূত কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার শিক্ষা পেতে পারে ছাত্রছাত্রীরা।

সুতরাং ভ্রমণ শিবির ছাত্রছাত্রীদের কাছে যেমন আনন্দের বিষয় তেমনি শিক্ষারও বিষয়।

## লোকসংগীত

লোকসঙ্গীত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তার কারণ এই গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাওয়া হয়ে থাকে। কোন শাস্ত্র বা কোন বাঁধাবন্ধ নিয়মের মধ্যে এই সঙ্গীত গীত হয় না। উদাস করা মাঠে, ফসল কাটবার সময়, নৌকো বাইবার সময়, নানা রকম লোক-উৎসব এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। শুধু একক কণ্ঠে নয়, সমবেত কণ্ঠেও গাওয়া হয়ে থাকে এই গান।

লোকনৃত্যের মতো লোকসঙ্গীতও গাওয়া হয়ে থাকে বংশানুক্রমিক এবং জাতিগতভাবে। এজন্য বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কেবল শোনার ওপর নির্ভর করেই এর শিক্ষা। জন্ম থেকেই এর শিক্ষা শুরু হয়।

সহজভাবে লোকজীবনের আনন্দ এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়। সুতরাং সহজভাবেই এই গান শ্রোতার মনে পৌঁছোয়। কখনও কোনো কাহিনী ব্যক্ত হয় এই গানে। কখনও কোনো একটি গানের মধ্য দিয়েই সুখ-দুঃখ-আনন্দের প্রকাশ হয়, দেবতার বন্দনাও হয় এই গানের মধ্য দিয়েই। যে কোন পূজোয় লোকসঙ্গীত একটি বিশেষ জায়গা অধিকার করে থাকে।

শুধু আনন্দ বা বেদনাই প্রকাশ হয় না এই গানের মধ্য দিয়ে, নানা রকম শিক্ষার কথাও থাকে এই গানে। কখনও কখনও আধ্যাত্মিক চেতনাও থাকে। লোকসঙ্গীতের মধ্যে সে অঞ্চলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ হয়।

লোকসঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্রও খুব সহজ হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের লোক সঙ্গীতের সঙ্গে যে যে বাদ্যযন্ত্র থাকে তা হল, দোতরা, খোল, করতাল, খমক, ঢোল, কাঁসর ইত্যাদি। এগুলি তারাই খুব সহজে তৈরী করে নেয়।

লোকনৃত্যের মতো লোকসংগীত সম্পর্কেও ছাত্রছাত্রীদের জানা উচিত। তাতে বিভিন্ন প্রদেশের লোকজীবনের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় যেমন পাবে তেমনি সে অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনার সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠবে। এই পরিচয় স্বাধীন দেশের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

তবে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকশিক্ষিকার সাহায্যে লোকসঙ্গীতের অর্থ বুঝে নেবে; কারণ সব অঞ্চলের ভাষা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এতে তাদের পক্ষে ভাষা-পরিচয়ও সহজ হবে।

লোক সঙ্গীত শেখার সময় সতর্ক থাকবে তারা—কারণ যে অঞ্চলের গান তারা গাইবে, সে অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য যেন গানে ফুটে ওঠে।

একটি লোকসঙ্গীত এখানে দেওয়া করা হল।

ও কাইয়ে ধান খাইল রে খেদানের মানুষ নাই ;
খাওয়ার বেলায় আছে মানুষ—কামের বেলায় নাই—
কাইয়ে ধান খাইল রে ॥
ওরে হাত পাও থাকিতে তোরা অবশ হইয়া রইলি ;
কাইয়ে না খেদাইয়া তোরা খাইবার বসিলি—
কাইয়ে ধান খাইল রে ॥

ওরে ও পাড়াতে পাঁটা নাই পুতা নাই মরিচ বাটে গালে,
তারা খাইল তাড়াতাড়ি আমরা মরি ঝালে—
কাইয়ে ধান খাইল রে ॥
তারে না না রেনা নারে তারে নারে রে
তারে না তারে না নারে তারে নারে রে
কাইয়ে ধান খাইল রে ॥

## লোক নৃত্য

ভারতের লোক-সংস্কৃতি জাতীয় জীবনে বিশেষ একটি জায়গা অধিকার করে আছে। শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতেই বিশেষ কৌতুহল এবং আগ্রহের বিষয় এই লোক-সংস্কৃতি।

লোক-সংস্কৃতির একটি ধারা নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বলা যায়, নৃত্যই লোক-সংস্কৃতির সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয়। আনন্দে, উৎসবে সর্বত্র এবং সবসময় লোক-জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এই নৃত্যের মধ্য দিয়েই।

তার কতগুলো বিশেষ কারণও আছে। আনন্দের সব চাইতে সহজ প্রকাশ শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে। তারা সেইজন্যই নৃত্যকে তাদের উৎসবের এবং আনন্দের প্রকাশ হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাছাড়া লোকজীবনে এমন কিছু উপকরণ বা পথ নেই, যার মধ্য দিয়ে সহজে তারা নিজেদের প্রকাশ করতে পারে।

বংশানুক্রমিকভাবে যেমন, তেমনি জাতিগত ভাবেই এরা নৃত্যকে আনন্দের এব উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ভেবে এসেছে বলে তাদের কাছে বিষয়টি সহজ হয়ে উঠেছে। তারা জন্ম থেকেই অনুকরণের মধ্য দিয়ে নৃত্যকে সহজে গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং নৃত্যই লোক-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

গ্রামের নিভৃত কোন অরণ্যে বা পাহাড়ের কোলে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে সহজ সরল অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে বীররস, করুণরস ইত্যাদি নৃত্যের সমস্ত রসগুলোই প্রকাশ করা সম্ভব। এবং তাই যেন মানায়। ফলে নৃত্যই লোক-জীবনের একমাত্র অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

নৃত্যের মধ্য দিয়ে অবশ্য শুধুমাত্র আনন্দ উৎসবের কাজই সাধন করা হয় না, তার আরেকটি উদ্দেশ্য আছে। সেটি হলো শরীর সঞ্চালন—এক কথায় বলা যায় ব্যায়াম। অর্থাৎ নৃত্যের মধ্য দিয়ে ব্যায়ামের কাজটিও হয়। ফলে বিশেষভাবে লোক-জীবনের ক্ষেত্রে নৃত্য প্রয়োজনীও হয়ে উঠেছে।

ধর্মীয় ব্যাপারও আছে নৃত্যের মধ্যে। লোক জীবনকে গোষ্ঠীবদ্ধ করে রাখে

ধর্ম। অর্থাৎ ধর্মীয় শাসন না থাকলে লোকজীবন ভেঙে পড়তে পারে যে কোন মুহূর্তে। নৃত্যের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের একতা বদ্ধ করে রাখবার জন্য ধর্মীয়



লোক-নৃত্য

উৎসবের বিশেষ অঙ্গ হিসেবে নৃত্যকে রেখেছে। পূজা থেকে বিবাহ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই আমরা তাই দেখতে পাই এই নৃত্যের প্রকাশ। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্যের মধ্যে ঢালী, রাইবেশে, ছৌ, কাঠি ভাদু, জারি ভাজো, ঘাটু, ঘাট ওলানো, মনসাভাসান, ব্রতচারী ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। গরবা ও রাস গুজরাটের লোকনৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের লোকনৃত্যের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে কোলকালি, ভেলাকালি, থেরায়ট্টম তিয়াত্তম, পরায়ণ কেলি, কেনিয়ার কেলি, ডাপ্পু (অন্ধ্র প্রদেশ), মাথুরী ইত্যাদি লোকনৃত্যগুলির।

ছাত্রছাত্রীদের এই লোকনৃত্য সম্পর্কে জানতে হবে বিশেষভাবে। এই নৃত্য চর্চাও করতে হবে।

শিক্ষকশিক্ষিকারা এই নৃত্য সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করবেন। লোকনৃত্যের প্রায় সবই দলগতভাবে অনুসিত হয়। অর্থাৎ নৃত্য হয় দলবদ্ধভাবে। সেজন্য ছাত্রছাত্রীদের শেখানো সহজ হবে। তাছাড়া উচ্চাঙ্গ ( Classical ) নৃত্যের মতো সুক্ষ্ম কলাকৌশল এতে প্রয়োজন হয়,না বলে ছাত্রদের কাছে এই ইহা সহজ বলেই মনে হবে।

যোগ্যতা অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের ভাগ করতে হবে বিভিন্ন দলে। কোন উন্মুক্ত

জায়গায় তাদের শেখাতে হবে। তেমন সুযোগ থাকলে যে লোকনৃত্য তারা শিখবে, সেই প্রদেশের কোন ব্যক্তিকে এসে দেখাতে হবে। তাছাড়াও শেখার পর কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এনে দেখতে হবে, যাতে ভুল থাকলে ধরা পড়ে।

যে নৃত্য তারা শিখবে, তার উদ্দেশ্য এবং অর্থের সঙ্গে সেই অঞ্চলের লোক গাঁথা এবং লোকজীবনের কথাও তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে; তাহলে শেখার উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে উঠবে। নৃত্যের সময়ের ছবি যোগাড় করা সম্ভব হলে তা করতে হবে। এবং নৃত্যের সময়ের প্রয়োজনী পোষাক ও বাদ্যযন্ত্র যোগাড় ক'রে নিতে হবে। নাহলে যথাযথভাবে সব প্রকাশ হবে না।

এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রী যেমন আনন্দ পাবে, তেমনি তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে নিজের দেশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি ধারণা। যা না হ'লে আমাদের জাতীয় সংহতি গ'ড়ে ওঠে না। তাছাড়া নিজের দেশ সম্পর্কে সব কিছু জানবার চেষ্টাও ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য কর্তব্য।

এর মধ্য দিয়ে যে শারীরিক উন্নতি ঘটবে তাই বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। আনন্দের মধ্য দিয়ে শরীর চর্চাও হবে তাদের।

## রবীন্দ্র-নৃত্য

পূজার ছুটির সময় সাধারণতঃ প্রত্যেক বিদ্যালয়েই উৎসব হয়ে থাকে। যদিও বার্ষিক পরীক্ষা বিদ্যালয় পুনরারম্ভের পরেই তবুও দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, ভাই ফোঁটার উৎসবের আনন্দে ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া বর্ষার শেষে প্রকৃতিও সুন্দর হয়ে উঠে। ভোরবেলা শেফালী ফুলের গন্ধ, দুপুরে স্নিগ্ধ রৌদ্র, সন্ধ্যার শীতলতা সব মিলিয়ে চারদিকে আনন্দের একটা বাতাস বইতে থাকে। কাজেই বিদ্যালয়ে শারদোৎসব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য প্রদর্শন করতে পারে। গানটি হবে 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা।'

যে শিক্ষক-শিক্ষিকার উপর অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকবে তিনিই মঞ্চ সাজাবেন। মঞ্চের পশ্চাৎপটে থাকবে আগাগোড়া সাদা পর্দা। পর্দার মধ্যে কাগজ কেটে সাদা মেঘ তৈরী করা হবে, তৈরী করা হবে বলাকার দল, সূর্যও থাকবে। সেখানে যদি সম্ভব হয় কাশ ফুল কিছু এনে তার সামনে টবে লাগিয়ে দিতে হবে। ফলে মঞ্চটিতে শরতের আবহাওয়া তৈরী হবে। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে-ঐ গানটি শিখিয়ে নিতে হবে। যারা নাচবে তাদের পোষাক হবে সাদা। গেরুয়া পাড় থাকবে তাতে। তাতে গলায় শেফালী ফুলের মালা পরবে। ছাত্রীরা খোঁপায়

এবং মাথায় চুলে কাশফুল লাগিয়ে নেবে। যদি শেফালী ফুল না পাওয়া যায় তবে সাদা কাগজ কেটে ফুল আর গোলাপী কাগজ কেটে বোঁটা বানিয়ে শেফালী ফুলের মালা বানাতে হবে।

গান শুরু হবার পর নাচবে যারা তারা এসে ঢুকবে এবং গানের কথার সংগে মুদ্রা সহকারে নাচবে।

## গান

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই,—লুকোচুরি খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই-লুকোচুরি খেলা॥
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে—উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা॥
ওরে, যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।
ওরে, আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট ক'রে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকাল বেলা॥

এছাড়াও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে মহাপুরুষ, দেশনেতাদের জন্মদিন পালন করা হয়। সেই সব দিন অনুষ্ঠান শুরু করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের মাধ্যমে। সেই গানটি হবে—'ঐ মহামানব আসে'।

উৎসবের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে মনোনয়ন করবেন গানটি গাইবার জন্য। মঞ্চের মধ্যখানে অথবা এক কোণায় যাঁর জন্মদিন তার একটি প্রতিমূর্তি থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের হাতে আঁকা ছবি হলেই ভালো হয়। অনুষ্ঠান শুরু হতেই সাদা পোষাকে একটি ছাত্র/ছাত্রী মালা পরাবে ঐ প্রতিমূর্তিতে সেই সঙ্গে আর কয়েকজন শংখ বাজাবে শংখধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তিনজন অথবা পাঁচজন ছাত্র/-ছাত্রী মঞ্চে নাচতে নাচতে এসে ঢুকবে। গানও শুরু হবে সেই সঙ্গে। মেয়েদের পোষাক হবে লাল পাড় সাদা শাড়ী, ছেলেদের পোষাক হবে ধুতি ও পাঞ্জাবী। তাদের চোখে মুখে শ্রদ্ধার প্রকাশ থাকবে।

## গান

ওই মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে॥
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।

আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ'
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি-উঠিল মহাকাশে ॥

গানটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা নেমে আসবে।

## উচ্চাঙ্গ নৃত্য

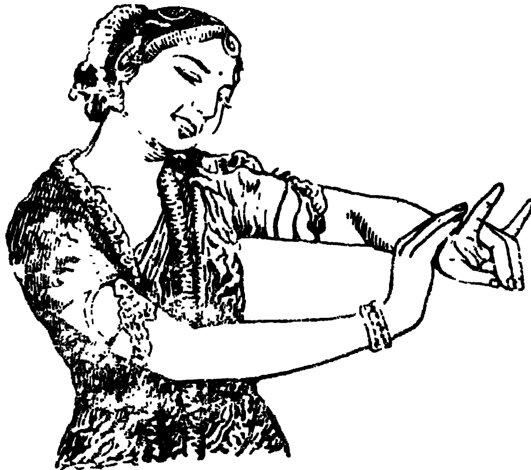
উচ্চাঙ্গের নৃত্য ভারতীয় চারুকলার একটি বিশিষ্ট অবদান। চৌষট্টি শিল্প কলার অন্যতম। ভাবাবেশে, মুদ্রায় ঠাটে, দেহের লীলায়িত ভঙ্গীমায়, তাল লয়ে —সে এক অপূর্ব অভিব্যক্তি। ভারতীয় সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক। সমস্ত পৃথিবীতে আজ এর মর্যাদার আসর বিস্তৃত হয়েছে। বলা যায় যেন ভারতের নূপুর-নিক্কন চলেছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। উচ্চাঙ্গ নৃত্য কলার মধ্যে আছে ভরত নাট্যম, মণিপুরী, কথাকলি। কথককে ঠিক উচ্চাঙ্গ নৃত্য কলা বলা হয় না। কারণ এই নৃত্যের উৎপত্তির ইতিহাস অন্য।

মূলতঃ ধর্মীয় বিষয় থেকে উচ্চাঙ্গ। নৃত্যকলা উৎপত্তি হয়েছে। পূজা, উৎসব ইত্যাদির সময় দেবতাকে উপাচার দেবার ভঙ্গি থেকেই উৎপত্তি হয়েছে এই নৃত্য। ফলে এই নৃত্য সর্বসাধারণের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার বিষয় ছিলো প্রাচীন কালে তারপর নানা কারণে এর পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ আবার একে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসালেন। উদয়শংকর একে ছড়িয়ে দিলেন সমস্ত পৃথিবীতে।

যেহেতু ধর্মীয় বিষয় থেকে উৎপত্তি হয়েছে উচ্চাঙ্গ নৃত্যকলার, সেই কারণে এই নৃত্যের মধ্যে আছে একটি অনির্বচনীয় ভাব। সেইভাব যেমন নৃত্যের তালে তালে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানা মুদ্রায়, চোখের ভঙ্গীমার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

হাতের দশটি আঙুল উচ্চাঙ্গ নৃত্যে একটি বিশেষ উল্লেখ্য বিষয় আঙুলের মুদ্রার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয় নানা বিচিত্র ভবে। দুঃখ বেদনা ইত্যাদি যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে শুধুমাত্র আঙুলের মুদ্রার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ সাধনায় এগুলোকে আয়ত্ব করতে হয়। অনেক সময় নাটকের মত হয়ে উঠে মুদ্রাগুলি। তালের সঙ্গে সঙ্গে নেচে ওঠে আঙুল। সে কারণেই উচ্চাঙ্গ নৃত্যে আঙুলকে বিশেষ একটি স্থান দেওয়া হয়েছে।

(১) ভরত দশটি বাহুকরণের উল্লেখ করেছেন—তির্যক, উর্ধ্বসংস্থ, অধোমুখ, অঞ্চিত, অপবিদ্ধ, মণ্ডলগতি, স্বস্তিক, পৃষ্ঠানুসারী, উদ্বেষ্টিত ও প্রসারিত। ভরতের এই দশটি বাহু করণের সঙ্গে আরও ছ'টি বাহুকরণ যুক্ত করলেন শার্ঙ্গদেব। এগুলি হল—আবিদ্ধ, কুঞ্চিত, নম্র, সরল, আন্দোলিত, উৎসারিত।



হাতের পরেই পায়ের বিশেষ স্থান রয়েছে এই নৃত্যে। পায়ে ধরা হয় তাল; ঘুঙুরের শব্দে যেন তাদের বাণী মুখর হয়ে ওঠে তখন নাচে মুদ্রাগুলো অর্থবহ



হয় দর্শকের মনে। নৃত্যের অর্থও সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কখনও তা চঞ্চল কখনও বা ধীর ভাব, কখনও বেদনা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে পায়ের ছন্দে।

সুতরাং পায়ের মুদ্রাও উচ্চাঙ্গ নৃত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরো একটি বিষয় নির্ভর করে পায়ের মুদ্রার ওপর। সেটি হলো সমস্ত শরীরের ভঙ্গী। অর্থাৎ পায়ের মুদ্রার সঙ্গে সমস্ত শরীর সম্পর্কিত। সেজন্যে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের শুরুতে যেমন হাতের আঙুল তেমনি পা দু'টিকে নানাভাবে আয়ত্ত করবার কৌশল শেখানো হয়ে থাকে।

(২) পায়ের পাঁচ প্রকারের ব্যবহার দেখা যায়—উদ্ঘটিত, সম, অগ্রত সঞ্চর, অঞ্চিত ও কুঞ্চিত।

ছাত্রছাত্রীদের এই বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করা উচিৎ। কারণ এই সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে তাদের পক্ষে ভারতের যথার্থ সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না।

শিক্ষক শিক্ষিকারা এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করবেন। তারা বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে আসবেন বিদ্যালয়ে। ছাত্রছাত্রীদের তারা শুধু এগুলো দেখিয়েই দেবেন না, তাদের শিখিয়েও দেবেন কিছু কিছু। শিক্ষক শিক্ষিকারাও শেখাবেন সম্ভব হ'লে।

এর ফলে তারা যেমন আনন্দ পাবে, তেমনি উৎসাহিতও হয়ে উঠবে। তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে সাংস্কৃতিক চেতনা। সমস্ত পৃথিবীতে আমাদের যা নিয়ে গৌরব, তারা নিশ্চয়ই সেই গৌরবেরও অংশীদার হতে পারবে।

## ব্রতচারী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য

**ইতিহাস:** বাংলার ব্রতচারী গান ও নৃত্যের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত ছিলেন শ্রীহট্ট জেলার বীরশ্রী গ্রামের অধিবাসী। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে তাঁর জন্ম হয়। জেলাশাসকের দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকেও, দেশ ও দশের জন্য কি করা যায়, সে সম্পর্কে তিনি অনেক ভেবেছেন। দেশের যা কিছু মহৎ ঐতিহ্য, লোক-সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের পুনরুদ্ধার কল্পে ব্রতী হন।

তাঁর ভাবোত্তম, এই পরিকল্পনার স্বপ্ন, বাস্তবে রূপায়িত হয় আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে, ১৯৩২ সালে। তখন তিনি বীরভূমের জেলাশাসক। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখলেন বীরভূমের লুপ্তপ্রায় লোকনৃত্যের মধ্যে ছিল কি বীরত্ব ব্যঞ্জক অভিব্যক্তি। দেহমনকে মজবুত করে গড়ে তোলবার বীজমন্ত্র রয়েছে গান ও নৃত্যগুলির মধ্যে। রায়বেশে নৃত্যের তাণ্ডবতা, রণহুংকার—তাঁকে মুগ্ধ করলো। গভীরভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করলো এই সব গ্রামীণ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য। তাঁর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হলো পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতির। ১৯৩২ সালের লোকনৃত্য শিক্ষাশিবিরে, তিনি ব্রতচারী অনুচেষ্টার পরিকল্পনা রচনা করেন।

এই ব্রতচারী নৃত্যগীত একদিন বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে আন্দোলনের আকারে দেখা দেয়। ব্রতচারী লোকনৃত্যের মধ্যে কেবল গ্রাম বাংলার তাজা প্রাণের স্পর্শ নেই, আছে আনন্দ উদ্দীপনা, আর পরোক্ষভাবে শরীর চর্চার অনুশীলনী। এগুলির মাধ্যমে বাংলার তরুণরা কেবল নিজেদের গড়ে পিটে তোলার সুযোগ পাবে তা নয়, জানতে চিনতে শিখবে নিজের দেশের মাটি ও মানুষকে। আর দেশ সেবার সাধনার প্রেরণা লাভ করবে।

ব্রতচারীর কয়েকটি গান নিয়ে দেওয়া হল।

হেলো মাটিতে চাঁদের উদয় কে দেখবি আয়
এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিস্ নাই দেখসে নদীয়ায়।
তোরা কে দেখবি আয়, তোরা কে দেখ্‌বি আয়
এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিস নাই দেখসে নদীয়ায়।

## ঝুমুর নৃত্যের গান

আগা ডালে ব'স কোকিল মাঝ ডালে বাসা রে
ভাঙ্গিল বিরিখির ডাল জীবনের নাই আশা রে।
অকালে পুষিলাম পাখী ঘিরৃত মধু দিয়া রে—
সুকালে পলাইলেন পাখী দারুণ শেল দিয়া রে।
অকালে পুষিলাম পাখী খুদ কুঁড়া দিয়া রে—
সুকালে পলাইলেন পাখী দারুণ শেল দিয়া রে।
হেনু ব্রেনু রামে কয় বহুত মিলানি রে—
সুকালে পলাইলেন পাখী দারুণ শেল দিয়া রে।
[ হাতে হাতে ধরাধরি তালে তালে পা রে—
হেসে খেলে নেচে ভুলি ভয় আর ভাবনা রে।

## কর্মযোগ

কোদাল হাতে কাজের ক্ষেতে
কোমর বেঁধে চল্‌রে চল্—
বসুধা'র বক্ষ হ'তে তোল্‌রে খেটে সোনার ফল॥
থাকিসনে আর অসাড় অবশ
জীবন-ধারা কর নিরলস;
ভূমির সেবায় লাগরে সেজে কর্মযোগী বীরের দল॥

সবাই চলে যায় রে আগে—
রইবে কি আর তোদের ভাগে ?
বিশ্বমানব সভার তলে দেখরে তোদের কোথায় স্থল !
শক্তির আধার মায়ের জাতি—
জালিয়ে দে তার জ্ঞানের বাতি ;
ঘুচবে তোদের দাসের খ্যাতি
জাগবে দেশে নবীন বল ॥

## আগুয়ান বাংলা

বাংলার মাটি, বাংলার হাওয়া, বাংলার ভাষা, বাংলার গান ;
বাংলার নদী সলিল-ধারা সফল হোক, হে ভগবান।
বাংলার ছেলে মেয়ে লভুক দেহের শক্তি মনের জ্ঞান ;
বাংলার মায়ের স্তন্য-দুগ্ধে গড়ে উঠুক বীরের প্রাণ।
বাংলার ভদ্রলোকের বংশ খেটে শিখুক শ্রমের মান ;
বাংলার যুবক বাপের অন্ন ধ্বংসের বুঝুক অপমান।
বাংলার পুরুষ নারী করুক দশের সেবায় আত্মদান ;
বাংলার হিন্দু মুসলমানের প্রাণে বহুক প্রেমের বান।
বাংলার ধেনু পুষ্টি পেয়ে করুক প্রচুর দুগ্ধ দান ;
বাংলার ছোট বড় সবাই হউক পূর্ণ স্বাস্থ্যবান।
বাংলার প্রতি গ্রামে জাগুক শিল্প কর্মের প্রতিষ্ঠান ;
বাংলার পণ্যদ্রব্যের সম্ভার জগৎ জুড়ে লভুক মান।
বাংলার গৃহে গড়ে উঠুক ধনে পুণ্যে বুদ্ধিমান।
বাংলার জীবন হয়ে উঠুক ধর্ম্মে কর্ম্মে মহীয়ান।
বাংলার মানুষ চলুক হয়ে সকল কাজে আগুয়ান ;
বাংলার বলে লভুক ভারত বিশ্ব-সভার শীর্ষস্থান।

## বাংলার ব্রতচারীর প্রতিজ্ঞা

ব্র — ত লয়ে সাধব মোরা বাংলা সেবার কাজ
বাংলা সেবার সাথে সাথে ভারত সেবার কাজ
ভারত সেবার সঙ্গে বিশ্ব-মানব সেবার কাজ
ত — রুণতার সজীব ধারা আনব জীবন মাঝ
চা — ই আমাদের শক্ত দেহ মুক্ত উদার মন
রী — তিমত অনুসরণ করব প্রতি পণ

## ব্রতচারির ষোলপণ

জ্ঞা নের সীমা প্রসারণ<br>
জ ঙ্গল পানার নির্বাসন<br>
শ্র মে র মর্যাদা বর্দ্ধন<br>
স ব্জী ফলের উৎপাদন<br>
আ লো হাওয়ায় সঞ্চালন<br>
গ রুর পুষ্টি সম্পাদন<br>
জ লের শুদ্ধি সুরক্ষণ<br>
প রিপাটিতা রচন<br>
ব্যা য়াম ক্রীড়ার প্রবর্তন<br>
না রীর মুক্তি সংসাধন<br>
বি য়ের আগে উপার্জন*<br>
শি ল্প শক্তি প্রস্ফুরণ<br>
স ময় নিষ্ঠানুবর্তন<br>
সে বায় আত্ম-নিয়োজন<br>
সং ঘ সাম্য সংস্থাপন<br>
আ নন্দোৎস সঞ্জীবন

## ভূমি প্রেমের তিন উক্তি

"আমি বাংলাকে ভালবাসি"<br>
"আমি বাংলার সেবা করব"<br>
"আমি বাংলার ব্রতচারী"

বাংলার অল্পবয়স্ক ব্রতচারীগণকে পূর্বোক্ত ভূমি-প্রেম সূচক তিন উক্তি করতে হয়। কিন্তু বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাভূমির প্রত্যেক ব্রতচারীকে ভারতভূমির প্রতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভুবনের মানব সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। কারণ ব্রতচারীর আদর্শ পূর্ণতা ও সর্বসংস্থিতিময়। তাই কিশোর ব্রতচারীদের জন্য ভূমি-প্রেমের তিন উক্তির একটি মধ্যম রূপ গ্রহণ করার বিধান হয়েছে। যথা :—

---

* নারী ব্রতচারীর গণ্য "বিয়ের আগে উপার্জন" পনের জায়গায় ধার্য হয়েছে—বিনয়-নম্র-আচরণ।

"আমি বাংলাকে ভালবাসি ; ভারতকে ভালবাসি"
"আমি বাংলার সেবা করব , ভারতের সেবা করব"
'আমি বাংলার ব্রতচারী ; ভারতের ব্রতচারী"

বয়স্ক ব্রতচারীর ভূমি-প্রেমের তিন উক্তির রূপ হবে চূড়ান্তভাবে পূর্ণতাময়। যথা :—

"আমি বাংলাকে ভালবাসি : ভারতকে ভালবাসি ,
বিশ্বভুবনকে ভালবাসি"
আমি বাংলার সেবা করব ; ভারতের সেবা করব ;
বিশ্বভুবনের সেবা করব"
আমি বাংলার ব্রতচারী , ভারতের ব্রতচারী
বিশ্বভুবনের ব্রতচারী"

বাংলার ব্রতচারীর জন্য নিম্নের যোল পণ অথবা কর্তব্যসূচক উক্তি নির্দিষ্ট হয়েছে—

## মোদের বাংলা ভূমির মাটি

মোদের বাংলা ভূমির মাটি
তোমার সহর গ্রাম ও বাটি
সযতনে সবাই মোরা রাখব পরিপাটি।
করব পানার নির্বাসন ;
কেটে গাছের নিবিড় বন—
মোরা বইয়ে দিব আলো হাওয়ার মুক্ত বিচরণ ;
সাধ্‌ব মোরা নিত্য তোমার ধনের বিবর্দ্ধন—
রচে' তরকারি ফল ফুলের বাগান কোদাল হাতে খাটি'॥

## চল্ আয় কচুরি নাশি

চল্ আয় কচুরি নাশি—
এই রাক্ষসী যে বাংলা দেশের দিচ্ছে গলায় ফাঁসি।
ওরে কেমন বাড়ে পানা রক্তবীজের ঝাড়—
সে যে বোঝা বিষম ভার ;

১৪

দেশের খাল নদী বিল পুকুর ফসল
ফেলল যে এ গ্রাসি ॥

এ যে গরুর ঘটায় উদর-পীড়া মাছের রোধে শ্বাস
একে করতে নেই বিশ্বাস ;
এ যে শুকিয়ে মরেও আবার বাঁচে—
এক থেকে হয় আশী ।
হয় গর্ত্তে পুঁতে পচিয়ে নে, নয় টেনে শুক্‌নো ঠাঁই
করে নে আগুন দিয়ে ছাই,—
জমির শস্য হবে দ্বিগুণ, পেলে কচুরি-সার-রাশি ॥
শুকনো হোক বা সবুজ, ক'রে সব কচুরি নাশ
প্রাণে লাগিয়ে দে তার ত্রাস—
যেন ফোটায় না আর পিশাচী তার
ফুলের বিকট হাসি ॥
কচুরি যে মারবে না সে দেশের কুসন্তান—
(ও) তার ধিক্ ধন' ধিক মান ।
সবাই আয়রে ত্বরা দেশের যারা মঙ্গল-অভিলাষী ॥

———

# সমাজ-সেবা

## প্রথম অধ্যায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সাথে ব্যবহারিক জীবনে অবশ্য করণীয় কাজকর্ম কিছু কিছু শেখানো হয়। সেবাদল হল ব্যবহারিক জীবনে সেই অবশ্য করণীয় কর্তব্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়েরা এই কর্তব্য পালনে সহায়তা করেন। স্বাস্থ্যই যখন ছাত্রজীবনের অমূল্য সম্পদ, তখন এই স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেকেরই আছে। ইংরেজীতে একটি শব্দ আছে—'To serve men to Serve God' অর্থাৎ মানব সেবাই ভগবৎসেবা। সুতরাং মানুষ কোন অসুবিধায় পড়লে তাকে সেই অসুবিধা থেকে মুক্ত করাই মানবসেবা। এই মানবসেবার প্রস্তুতির সময় ছাত্রজীবন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে সপ্তাহান্তে একটি দিন সমাজ-সেবার বিভিন্ন কাজে ব্যয়িত হওয়া দরকার। প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে লাগান হয়।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রগোষ্ঠীকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। যাদের নামকরণ 'ক'-দল, 'খ'-দল, 'গ'-দল, 'ঘ'-দল, 'ঙ'-দল এইভাবে রাখা হবে। ধরা যাক প্রথম সপ্তাহে 'ক'-দল শুশ্রূসা কেন্দ্রের কাজ কর্ম করল এবং অপরাপর দল যথাক্রমে প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ, নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিবস পালনের দায়িত্ব নিল। এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পালাক্রমে সারা বছর ধরে কোন দল কি কাজ করবে নিচে তার একটা তালিকা দেওয়া হল :-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ক-দল | শুশ্রূষা কেন্দ্রের কাজ করবে | ... | ১ম সপ্তাহ |
| ২। | খ-দল | প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ | ... | ২য় ,, |
| ৩। | গ-দল | পরিবেশ সাফাই-এর | ... | ৩য় ,, |
| ৪। | ঘ-দল | সাক্ষরতার অভিযান | ... | ৪র্থ ,, |
| ৫। | ঙ-দল | বীরবরণ দিবস | ... | ৫ম ,, |

## সমাজসেবা দল

শুশ্রূষা কথার অর্থ সেবা। সেবা বলতে রোগ সেবাকেই বোঝায়। কোন কারণে কারুর শরীর রোগে আক্রান্ত হলে অথবা কোন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে আক্রান্তকারী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তখনই প্রয়োজন শুশ্রূষার। এই শুশ্রূষা যে কেউ করতে পারে। তবে শুশ্রূষা নিয়মানুগ পদ্ধতিতে সবার পক্ষে করা সম্ভব হয় না বলেই দরকার হয় একটা প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রের। ঐ প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রে যারা শুশ্রূষা করে তাদের **শুশ্রূষাকারী** বলে। অবশ্য শুশ্রূষাকারীর গুণাবলী কারুর জানা থাকলে গৃহেতে শুশ্রূষা করা যেতে পারে। আজকাল আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রতিষ্ঠান সেই কারণেই গড়ে উঠেছে। গ্রামে বা শহরে যে কোন সময়ে মহামারী দেখা দিলে একমাত্র শুশ্রূষা দ্বারাই রোগমুক্তি ঘটানো সম্ভব। অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে আহত যোদ্ধা ভাইদেরও শুশ্রূষা দ্বারা আরোগ্য করে তোলা হয়। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের ( Florance Nightangle ) ঘটনায় আমরা জানতে পারি ইনি খুব সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ধনী কন্যা হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে এক সাধারণ শুশ্রূষাকারিণী হিসেবে সবার কাছে পরিচিত করে গিয়েছেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে অনেকেই শুশ্রূষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে ভয় পেতেন। কিন্তু বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক হওয়ায় অনেকেই সাড়া দিয়েছেন। প্রত্যেকের জীবন নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান করে তুলতে প্রত্যেকেরই এই গুণগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ এমন অনেক রোগ আছে যেখানে রোগ যন্ত্রনা ঔষুধ অপেক্ষা শুশ্রূষাতেই উপশম হয়।

শুশ্রূষার প্রধান চারিটি অঙ্গ—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সহানুভূতি।

**পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা:** শুশ্রূষাকারীর অঙ্গ, পোষাক পরিচ্ছদ, রোগীর গৃহের আসবাব এবং বিছানা পত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা বিশেষ দরকার। রোগীর বিছানাপত্র এবং রোগীদেহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রোগযন্ত্রণা অনেকটা কমিয়ে দেয়, রোগী নিজেকে অনেকটা সুস্থ অনুভব করে।

**ধৈর্য:** শুশ্রূষাকারীকে সদা প্রফুল্ল, রোগীর প্রতি স্নেহ, প্রীতি ও সহানুভূতি সম্পন্ন হতে হবে। শুশ্রূষাকারী ধৈর্য অবলম্বন না করলে এবং রোগীর সামনে কথায় ও ব্যবহারে দুর্বলতা প্রকাশ করলে রোগী হতাশ হয়ে পড়বে। একাদিক্রমে অনেকক্ষণ এবং অনেকদিন রোগীর শুশ্রূষা করলে স্বভাবতই বিরক্তির ভাব আসা স্বাভাবিক। শুশ্রূষাকারীর ব্যবহারে এবং কথাবার্তায় যেন সেই বিরক্তির ভাব না প্রকাশ পায়।

**নিষ্ঠা:** নিষ্ঠা শুশ্রূষা কাজের একটা প্রধান অঙ্গ। রোগীকে সব রকমের সাহায্য করে তাকে আরোগ্য পথে আনার সংকল্পে যিনি ব্রতী হন, তিনিই শুশ্রূষাকারী নামের যোগ্য। পার্থিব প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে রোগীর আরোগ্যলাভে সহায়তা করাই একমাত্র কর্তব্য—এই জ্ঞান, বিশ্বাস যার আছে তিনিই যথাযথভাবে রোগীর শুশ্রূষা করতে পারেন।

**সহানুভূতি:** রোগ পরিচর্যার প্রধান অঙ্গ হল সহানুভূতি। সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা রোগীকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা শুশ্রূষাকারীর প্রধান গুণ। যে সব রোগী সহানুভূতি ও মৃদু ব্যবহারে বশীভূত হয় না, তাদের প্রভুত্বব্যঞ্জক আদেশ ও ব্যবহারে বশীভূত রাখা সঙ্গত। সহানুভূতি ও প্রবোধ বাক্যাদি দ্বারা রোগীর মন জয় করে তাকে চিকিৎসকের নির্দেশগুলো মেনে চলতে উৎসাহ দিতে হবে। অর্থাৎ রোগ পরিচর্যার জন্য দরকার একটি সংবেদনশীল মন। গৃহ এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুশ্রূষার ভার ন্যস্ত হয় নারীর উপরেই। কারণ নারীর মন স্বভাবতই স্নেহপ্রবণ সহানুভূতিশীল ও সেবাপরায়ণা হয়ে থাকে।

## শুশ্রূষাকারীর লক্ষণীয় বিষয়

**রোগীর ঘর:** রোগীর সেবায় প্রথমেই লক্ষ্য রাখিতে হয় রোগীর ঘরের প্রতি। রোগীর ঘর এমন হওয়া উচিত যেখানে প্রচুর আলো, বাতাস পাওয়া যায়। দালান বাড়ী হইলে রোগীর ঘর সর্বোচ্চ তলায় ও গৃহের একাংশে হওয়া প্রয়োজন। কারণ সর্বোচ্চ-তলায় হইলে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকে এবং উপরে অবস্থিত বলিয়া বায়ুও বিশুদ্ধ থাকে। রোগীর ঘর দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিমমুখী হওয়া প্রয়োজন। ঘরের দেওয়ালের গায়ে ঘুলঘুলির ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহাতে ঘরের দূষিত বায়ু সহজেই বাহির হইয়া যাইতে পারে এবং বাহিরের বায়ু ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। রোগীর ঘরের পাশে একটি ছোট ঘর থাকিলে সেখানে রোগীর প্রয়োজনীয় জিনিষ রাখা যায়।

**আসবাবপত্র:** রোগীর ঘরে যত কম আসবাবপত্র থাকে ততই ভাল। রোগীর ঘরে নিম্নলিখিত আসবাবপত্রগুলি রাখা দরকার। যথা—(ক) রোগীর খাট (খ) হাতমুখ ধোয়ার জন্য একটি গামলা (গ) ঔষধপত্র, ফল, খাবার ইত্যাদি রাখার জন্য একটি আলমারী (ঘ) শুশ্রূষাকারিণীদের বসিবার জন্য চেয়ার এবং একটি টেবিল (ঙ) রোগীকে যাহারা দেখিতে আসিবে তাহাদের জন্য রোগীর বিছানা হইতে দূরে চেয়ার রাখিতে হইবে।

রোগীর ব্যবহারের জন্য কুঁজো, ঢাকনিযুক্ত পিকদানি, মুখ ধোবার গামলা,

প্রস্রাবের জন্য ইউরিন্যাল, বেডপ্যান বা শৌচ ত্যাগের পাত্র ঘরের এক পাশে রাখা উচিত। পাউডার, চিরুণী, রোগীর সেন্ট প্রভৃতি যাবতীয় সরঞ্জাম ঐ ঘরে টেবিলের উপর গুছাইয়া রাখা উচিত। রোগীর গরম জলের ব্যাগ, বরফের ব্যাগ প্রভৃতির জল ফেলিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখা উচিত। রোগীর ঘরে শুশ্রূষাকারীর জন্য একটি খাতা, কলম, সেকেণ্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ি, একখানি ছোট টেবিল এবং একখানি চেয়ারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

**রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো ঃ** রোগীকে সময়মত ওষধ খাওয়ানোর ভার শুশ্রূষাকারীর উপর ন্যস্ত থাকে। সাধারণতঃ ওষুধ যে রকমেরই হউক না কেন, প্রতিটি শিশির গায়ে রোগীর নাম, দাগ, কতঘণ্টা অন্তর সেবা ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিষ্কার ভাবে লিখে রাখা উচিত। রোগীকে সময়মত ওষুধ খাওয়ানোর ব্যতিক্রম যেন কোন সময়েই না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ওষুধ দেওয়ার সময় সর্বদা একটা পরিষ্কার ট্রেতে কাপ,চামচ,ওষুধের শিশি ও খাবার জলের গ্লাস সাজিয়ে নিতে হবে। সেইসঙ্গে একটা শুশ্রূষা নির্দেশ নিয়মিত লিখে যেতে হবে।

**রোগীর পথ্য :** সুস্থ অবস্থায় কোন ব্যক্তির যে কর্মশক্তি প্রয়োজন, অসুস্থ অবস্থায়ও ঠিক সেই কর্মশক্তির প্রয়োজন। বরং জ্বর বা এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর কর্মশক্তির ব্যয় সুস্থ অবস্থা অপেক্ষা অনেকখানি বেশী হয়। জ্বর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শরীর সর্বদা পুষ্টির অভাবে জীর্ণ হতে থাকলে, উহাদের প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিন বহুল খাদ্য পথ্য হিসেবে দেওয়া হয়। কোন সংক্রামক রোগে রোগী আক্রান্ত হলে, তাকে ভিটামিন 'এ', 'বি', 'সি' ইত্যাদি গুণাবলী সম্বলিত পথ্য দেওয়া হয়। প্রত্যেক রোগীর পথ্যই যাতে সহজপাচ্য, টাটকা, ভেজালশূন্য এবং ভিটামিনবহুল হয়, এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

রোগীকে খাদ্য পরিবেশনের সময় ওষুধের মত চিকিৎসকের নির্দেশমত পথ্য নির্বাচন ও পথ্য খাওয়ানো উচিত। তরল খাদ্য দুই ঘণ্টা অন্তর এবং কঠিন পথ্য সাধারণত ৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হয়ে থাকে। পথ্য পরিবেশনের সময় যথাসম্ভব প্রফুল্ল অন্তরে পরিবেশন করা দরকার।

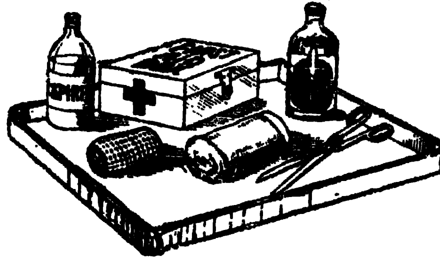
**রোগীর স্নান ঃ** রোগীকে স্নান করানোর দিকে শুশ্রূষাকারীর যথেষ্ট লক্ষ্য থাকা দরকার। রোগীকে স্নান করাবার জন্য ছোট গামছা, গরম জলের পাত্র, পাউডার, চিরুণী ইত্যাদি সামনে রাখতে হবে। স্নানের পর ভালভাবে গা মুছিয়ে ঠাণ্ডাজল, দেওয়া দরকার।

**রোগীর বিছানা ঃ** সর্বশেষ লক্ষণীয় বিষয় রোগীর বিছানা। বিছানা যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। বালিশটি চাদরের নীচে থাকবে। অয়েল ক্লথের উপর রোগীকে শোয়াতে হবে। শোয়াবার পর রোগীর শরীর একটি চাদর কিংবা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা দরকার।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**প্রাথমিক চিকিৎসা**—মানুষের জীবনে যেকোন সময়ে যেকোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মানুষ অনেক সময় বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারে না, সব সময় ধারে কাছে ডাক্তার পাওয়া যায় না। ডাক্তার বা চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত দুর্ঘটনায় পতিত বা আকস্মিক পীড়ায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ যে সাময়িক চিকিৎসা করা হয় তাকেই প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। দুর্ঘটনায় পতিত কোন মানুষের জীবনরক্ষা, দুর্ঘটনাজনিত আঘাত থেকে আরোগ্যলাভে সাহায্য করাই প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য। এতে রোগী কিছুটা আরামবোধ করে, বিপদের সম্ভাবনা কম হয় এবং অনেকক্ষেত্রে রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়।

হাতের কাছে অনায়াসেই পাওয়া যায় এরূপ সহজলভ্য দ্রব্যাদির দ্বারাই প্রাথমিক চিকিৎসা করার নিয়ম। এজন্য ডেটল, লিষ্টারিণ, তুলো, পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট,



প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স

রেকটিফায়েড স্পিরিট, ব্যাণ্ডেজ, ছোট কাঁচি, ছুরি, ফিনাইল, আয়োডিন প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। এসব ওষুধ ও সরঞ্জাম সমেত একপ্রকারের বাক্স বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এরকমের বাক্সকে **প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স বা ফার্ষ্ট এড বাক্স** নামে অভিহিত করা হয়।

**প্রাথমিক চিকিৎসার মূলনীতি**। প্রাথমিক চিকিৎসার নিম্নলিখিত মূল-নীতিগুলি জেনে রাখা ভাল।

(১) সর্বপ্রথমে যা করণীয় তাই করবে এবং চিকিৎসার কাজ ঠাণ্ডা মাথায় অথচ তাড়াতাড়ি শেষ করবে। ভয় পাবে না অথবা কোনরূপ গোলমাল করবে না।

(২) নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালাবার ব্যবস্থা করবে।

(৩) রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে।

(৪) প্রত্যেক আকস্মিক আঘাতের ফলে অল্পবিস্তর "শক" বা স্নায়ু-বিক্ষেপ

ঘটে থাকে। স্নায়ুবিক্ষেপ বেশি হলে আহত ব্যক্তিকে খুব সাবধানে যতদূর সম্ভব কম নাড়া চাড়া করে চিকিৎসা করবে।

(৫) আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে আশ্বাস বাক্যে উৎসাহিত করে চিকিৎসা করবে।

(৬) অতিরিক্ত কিছু করতে উদ্যোগী হবে না। জীবন রক্ষার জন্য এবং অবস্থার অবনতি বোধ করবার জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন তাই করবে।

(৭) আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির চারদিকে ভীড় করতে দেবে না কারণ এসময় মুক্ত বাতাসের খুব প্রয়োজন।

(৮) প্রয়োজন না হলে জামাকাপড় খুলে দেবে না।

(৯) দুর্ঘটনায় পড়েছে এমন ব্যক্তিকে হাসপাতালে অথবা কোন চিকিৎসকের নিকট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে কিম্বা ডাক্তারকে আনার ব্যবস্থা করবে।

নীচে কয়েকটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা কিরূপ হবে তা বর্ণনা করা হ'ল।

**কেটে যাওয়া :** খুব ধারাল বস্তুর আঘাতে আমাদের শরীরের কোন অংশ হঠাৎ কেটে যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা দু ভাবে করা যায় ; (১) আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা এবং (২) রক্ত-দূষণ নিবারণ করা।

(ক) **ক্ষত যদি সামান্য হয় ও পরিষ্কার থাকে :** এক্ষেত্রে রক্ত-দূষণের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম। কাজেই ক্ষতস্থানকে স্পর্শ করার বা ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার কাপড় প্যাডের মত করে অথবা বোরিক তুলোর প্যাড ক্ষতস্থানের উপর বসিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবে। রক্তপড়া বন্ধ না হলে তুলো বা কাপড়ের প্যাড়টি ক্ষতের মুখে দিয়ে ব্যাণ্ডেজটি শক্ত করে বাঁধতে হবে। শক্ত বাঁধনের চাপে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

(খ) **ক্ষত যদি সামান্য হয় কিন্তু অপরিষ্কার থাকে :** কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্ষতস্থানে ধূলাবালি প্রভৃতি লেগে যায় অথবা কোন নোংরা অপরিষ্কার ধারালো বস্তুর আঘাতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাহলে রক্ত-দূষণের সম্ভাবনা আরও বেশী। এক্ষেত্রে ক্ষতস্থানকে সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ক্ষত ধোয়ার জন্য জল ফুটিয়ে নিলে ভাল হয়, কারণ জল ফোটালে জীবাণু মরে যায়। পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো বা তুলো জলে ভিজিয়ে ক্ষতস্থান থেকে আরম্ভ করে

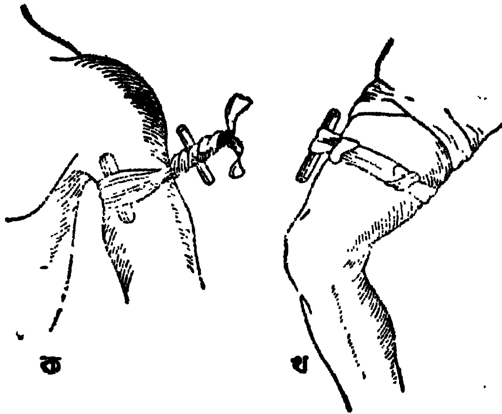
ক্ষতের বাইরের চারদিকে বার বার মুছে নিতে হবে। পরে টিংচার আয়োডিনে তুলো ভিজিয়ে ক্ষতস্থানটি মুছে ব্যাণ্ডেজ করে দেবে।

**(গ) ক্ষত গভীর হলে।** এরূপ ক্ষেত্রে ধমনী অথবা শিরা কেটে প্রচুর রক্তপাত হয় বলে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ থাকে। ধমনী কেটে গেলে ক্ষতস্থান উজ্জ্বল লাল-বর্ণের রক্ত নাড়ীর গতির সঙ্গে ঝলকে ঝলকে বের হতে থাকে। এরূপক্ষেত্রে—

(১) প্রথমেই রোগীকে শুইয়ে দেবে।

(২) তারপর রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য পরিষ্কার তুলোর একটি শক্ত প্যাড ক্ষতের মুখে চাপা দিয়ে আঁট করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবে। শিরা থেকে রক্তক্ষরণ হলে এভাবে প্রায়ই বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ না হলে ক্ষতের কাছাকাছি হৃৎপিণ্ড হতে দূরের দিকে শক্ত করে একটি বাঁধন দেবে। এতে শিরার রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে।

(৩) যদি ধমনী থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং ক্ষতের উপর চাপ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করার পরও রক্ত পড়া বন্ধ না হয়, তবে ক্ষতের পাশে হৃৎপিণ্ড থেকে




টুর্নিকেট-এর বন্ধন

নিকটের দিকে ধমনীর উপর চাপ দেবে। হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেবে. কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে চাপ দেবার প্রয়োজন হলে অথবা ক্ষত যদি হাতে বা পায়ে হয়, তবে টুর্নিকেটের ব্যবহার করাই ভাল। এজন্য প্রথমে ক্ষতস্থানের উপরে বা নীচে এক টুকরো কাপড় বা রবার নলের কিছুটা অংশ দিয়ে শিথিলভাবে বেঁধে দিতে হয়। পরে ঐ বন্ধনের ফাঁকের ভিতর একটি শক্ত কাঠি দিয়ে কয়েকবার মোচড় দিতে হয়। মোচড় দেবার দরুণ পাক খেয়ে ব্যাণ্ডেজটি খুব শক্ত হয়। এরকম বাঁধাকে টুর্নিকেট বলে।

**পুড়ে যাওয়া**—অগ্নিশিখা, উত্তপ্ত ধাতুপাত্র, উত্তপ্ত বাষ্প ও তরল পদার্থ, এ্যাসিড এবং বিদ্যুতের সংস্পর্শে আমাদের দেহের চামড়া ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে ক্ষতি হয় তাকে পুড়ে যাওয়া বলে।

উত্তাপের তীব্রতা অনুসারে চামড়া সামান্য লাল, বড় বড় ফোস্কা এমন কি নীচের মাংসপেশীও কখন কখন পুড়ে কাল হয়ে যেতে পারে। দেহের চামড়ার শতকরা ৫০ ভাগের বেশী পুড়ে গেলে স্নায়ুবিক্ষেপ হতে পারে। স্নায়ুবিক্ষেপ ঘটলে রোগী বিবর্ণ ও ঠাণ্ডা হয়ে আসে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ীর গতি মন্দীভূত হয় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসার সময় এগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

**প্রাথমিক চিকিৎসা।** (১) শরীরের পোড়া জায়গা থেকে খুব সাবধানে জামা-কাপড় খুলে দিতে হবে। পোড়া জায়গায় যদি জামা-কাপড় সেঁটে গিয়ে থাকে তবে এর চারপাশ থেকে সাবধানে কাঁচি দিয়ে জামা-কাপড় কেটে দিতে হবে।

(২) ফোস্কা পড়লে তা গেলে দেবে না।

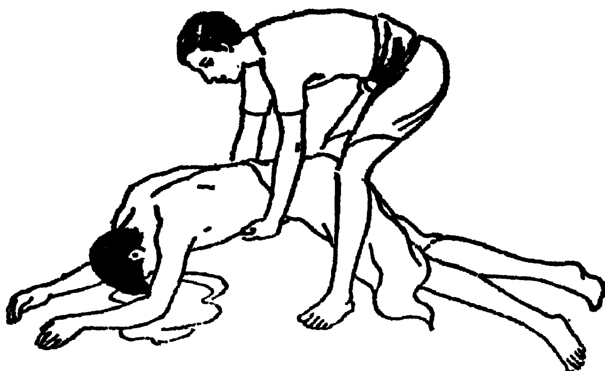
(৩) কোনরকম তেল লাগাবে না।

(৪) পোড়া জায়গায় বাতাসের সংস্পর্শ হতে রক্ষা করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢেকে দেবে। এরপর অল্প তুলো দিয়ে হাল্কাভাবে ব্যাণ্ডেজ করবে।

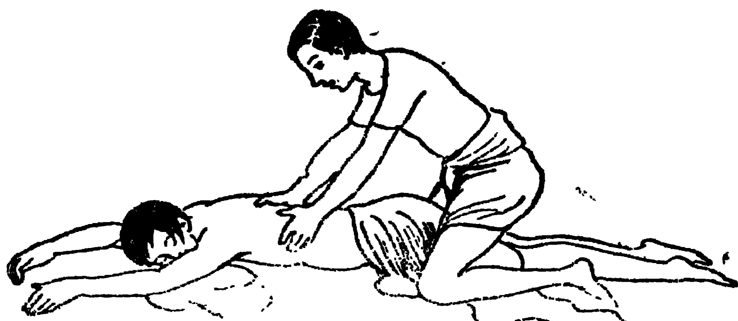
(৫) স্নায়ু-বিক্ষেপ ঘটলে পোড়া জায়গার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে প্রথমেই স্নায়ু-বিক্ষেপের চিকিৎসা করবে। এরূপক্ষেত্রে কম্বল চাপা দিয়ে শরীরে উত্তাপ সংরক্ষণের চেষ্টা করবে। অল্পপরিমাণে গরম দুধ এবং মিষ্টি চা বা কফি খেতে দেবে।

সামান্য পুড়ে গেলে বার্ণল লাগালে উপকার পাওয়া যায়। যে কোন রকমের পোড়া হোক, পোড়া ঢেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ।

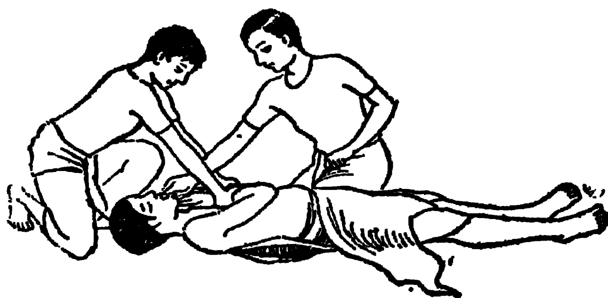
**জামাকাপড়ে আগুন লাগা।** মনে রাখবে জামাকাপড়ে হঠাৎ আগুন লাগলে আক্রান্ত ব্যক্তি যেন সাহায্যের জন্য ছোটাছুটি না করে। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি যেন সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দেয়। সম্ভব হলে ঐ সময় কোন কম্বল, কাঁথা অথবা টেবিল ক্লথ হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ আবৃত করে নেয়। তাহলে বাতাসের অভাবে আগুন নিভে যাবে। এ সময় আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে দ্বিতীয় কোন্ ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি অবশ্যই আগুনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তার উপর কম্বল অথবা ঐ জাতীয় যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া যায় তা দিয়ে সর্বাঙ্গে চেপে ধরবে। তাতে



১ম অবস্থা



২য় অবস্থা



৩য় অবস্থা

আগুন নিভে যাবে। আগুন নিভে গেলে পূর্ববর্ণিত প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্য নেবে।

**এ্যাসিডে পুড়ে গেলে**—এ্যাসিডে পুড়ে গেলে পূর্ববর্ণিত প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্য নেবে। তবে সর্বপ্রথমে পোড়া জায়গাটা বাই কার্বনেট অব সোডা মিশ্রিত জলে ধুয়ে নেবে।

**বিদ্যুতে পুড়ে গেলে**—বিদ্যুতস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না। মেন সুইচ বন্ধ করে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে তার থেকে ছাড়িয়ে মাটিতে শুইয়ে দেবে। এসব ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি ডাক্তার-এর পরামর্শ নেওয়া উচিত। শরীরের উত্তাপ সংরক্ষণ করার জন্য মোটা কম্বল দিয়ে রোগীর শরীর ঢেকে দেবে। শ্বাস-প্রশ্বাস না চললে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ করবার চেষ্টা করতে হবে। পোড়ার জন্যে ক্ষতস্থানের চিকিৎসার চেয়ে রোগীর প্রাণ বাঁচানো প্রথম কর্তব্য। ক্ষতস্থানের জন্যে পূর্ববর্ণিত প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্য নেবে।

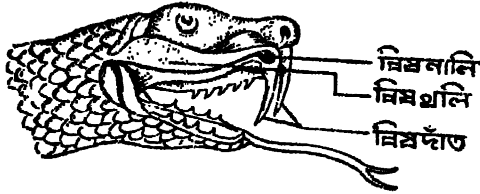
**জলে ডোবা :**—জলে ডোবার দুর্ঘটনা গ্রামে ও শহরে অনেক সময়েই ঘটে। বিশেষ করে ছোট ছেলে-মেয়েরাই এই দুর্ঘটনায় বেশী পড়ে।

কেউ জলে ডুবে গেলে তৎক্ষণাৎ জল থেকে তুলে আনবে। তারপর গলায় আঙুল দিয়ে রোগীর মুখ থেকে জল-কাদা-শ্লেষ্মা বের করে দেবে ও মাথা নিচের দিকে রাখবে। জিভটা মুখের একপাশে রেখে হাত দুখানি যতটা সম্ভব উপরে তুলে ধরবে। হাত দুখানি উপরে তুলবার সময় পিঠ চেপে ধরে কয়েকবার মাঝে মাঝে নাড়ি দেখবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দেবে। এরপর রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে পিঠের নিচে একটা বালিশ দেবে এবং মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসবে। তারপর জিভটা টেনে সোজা করে ধরবে। রোগীর হাত দুখানি কনুয়ের ঠিক নিচের অংশ এমনভাবে টেনে নেবে যাতে রোগীর হাত দুটি মাথার দুপাশে এসে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে হাত দুখানি মাথার সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে বুকের দুপাশের পাঁজরের উপরে নিয়ে চাপ দেবে। প্রতি মিনিটে বারো বার এরূপ করবে। স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হলে গরম কাপড়ে রোগীর শরীর ঢেকে দেবে। জলে ডুবলে রোগীর ফুসফুসে ও পেটে জল ঢুকে যায়।

**কুকুরে কামড়ানো :** মানুষকে পাগলা কুকুরে কামড় দিলে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। যে কুকুর কামড়াবে তাকে কামড়ানোর পর থেকে দশ দিন লক্ষ্য করতে হবে। ঐ সময়ের মধ্যে মরলে বুঝবে কুকুরটি পাগলা। কুকুরের মুখের লালায় জলাতঙ্ক রোগের বীজ থাকে। ঠিক সময়ে চিকিৎসা

না ক'রলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। কুকুরে কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা কার্বলিক অ্যাসিড্ দিয়ে পুড়িয়ে দেবে। কুকুরে কামড়ানো রোগীকে পাস্তুর চিকিৎসা করা হয়। কুকুরে কামড়ালে ভয় পাবে না। প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

**সাপে কামড়ানো:** সাপে কামড়ালে সাপের বিষ রোগীর রক্তে মিশে সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়ে; ফলে তার মৃত্যু হয়। সাপের বিষের খুব জ্বালা; আবার সাপের বিষ ওষুধ ও মাদকরূপেও ব্যবহার করা হয়।




সাপের বিষদাঁত

সাপে কামড়ালে চামড়ার উপর প্রায় দুই সেন্টিমিটার ব্যবধানে বিষ দাঁতের দু'টি চিহ্ন দেখা যায়। কাজেই সাপে কামড়েছে সন্দেহ হ'লে তৎক্ষণাৎ দেখবে জায়গাটিতে দাঁতের চিহ্ন আছে কি না? সাপে কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত জায়গাটির তিন-চার আঙুল উপরে শক্ত দড়ি বা কাপড় দিয়ে খুব শক্ত বাঁধন দেবে যাতে রক্ত চলাচল ক'রতে না পারে। তারপর আরও ৭।৮ সেন্টিমিটার উপরে ঐরূপ আর একটা বাঁধন দিয়ে, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব হ'লে নিজেরাই পরিষ্কার (আইওডিন মাখানো বা গরম জলে সিদ্ধ করা) ধারালো ছুরি দিয়ে জায়গাটি চিরে দিয়ে চাপ দিতে থাকবে। তাতে রক্ত বের হ'তে থাকবে। সাপের বিষ মেশানো এই রক্তের রং কিছুটা কালচে। রক্তের সঙ্গে বিষ বের হ'য়ে যাবে। পরে ক্ষতস্থানে পটাশ পারমাংগানেটের গুড়ো লাগিয়ে দেবে।

**বোলতা, কাঁকড়াবিছা প্রভৃতির কামড়:** বোলতা, মৌমাছি, ভিমরুল, কাঁকড়াবিছা প্রভৃতি কীটপতঙ্গগুলি কামড়ায় না, হুল ফুটিয়ে দেয়। এদের হুল খুব বিষাক্ত। শরীরের কোন অংশে হুল ফুটলে খুব যন্ত্রণা হয়। কাঁকড়াবিছার কামড়ে অনেক সময়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে মারা যায়। হুলে যে বিষ থাকে তা এক ধরণের এ্যাসিড তা রক্তের সঙ্গে মিশে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। কাঁকড়াবিছা কামড়ালে আহত স্থানের কয়েক আঙুল উপরে শক্ত করে বাঁধন দিবে। তারপর

লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে আহতস্থানে হুলটি ঢুকে আছে। তার উপর ফাঁপা চাবি রেখে চাপ দিলে হুলটি বের হয়ে আসবে। তখন অ্যামোনিয়া, ফটকিরির গুঁড়া বা থানকুনি পাতার রস লাগালে কিছু উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা অল্পক্ষণের জন্য। সেই অবস্থায় রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখো (Keep the area Clean)

পরিবেশের প্রভাব ছাত্রজীবনে বড় কম নয়। পরিবেশই ছাত্রদের শুচি-রুচির পরিচয় দেয়। এর পরিচ্ছন্নতাই ছাত্রদের মনে প্রসন্নতা এনে দেয়। অন্যদিকে নোংরা পরিবেশ বিদ্যার্থীদের মনে এনে দেয় বিকার-বিষণ্ণতা। পরিচ্ছন্নতার এই শুচিশুভ্রতার কথা চিন্তা করেই বলা হয়েছে, ভগবৎ অনুভূতির পরের ধাপই হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। অর্থাৎ Cleanliness is next to Godliness—গান্ধীজী ঐ প্রবাচনিক তত্ত্বে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তিনি ওকে নয়া শিক্ষার ভিত্তিভূমি বলে স্থির করেছিলেন, বলেছিলেন 'নঈ-তালিম সাফাইসে সুরু হোতী হ্যায়'। গান্ধীজী দ্বিবিধ সাফাই বা পরিচ্ছন্নতার কথা বলেছিলেন। যথা বাহ্যিক ও মানসিক। আর এই বাইরে ভিতরে প্রকৃত সাফাই হল, তা ভগবৎ সান্নিধ্যের কাছাকাছি আমাদের নিয়ে যেতে পারে।

এই হ'লো "পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখো" অভিযানের নেপথ্য ইতিহাস, অন্তর্নিহিত কারণ। এখন এই অভিযানকে সফল করার জন্য ছাত্রদের কিভাবে অগ্রসর হতে হবে, এক্ষেত্রে তাদের দল বা ব্যক্তিগতভাবে কি করণীয় আছে, নিয়ে তার একটি ব্যবহারিক কার্যসূচী দেওয়া হল। কাজের সুবিধার জন্য কার্যসূচীকে সাতটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—(১) **বিদ্যালয় পরিবেশ সাফাই** (২) **সামুদায়িক সাফাই** (৩) **দেওয়াল লিখন মোছ অভিযান** (৪) **শ্রেণীকক্ষ বিন্যাস ও সাফাই** (৫) **নিজ নিজ এলাকা পরিচ্ছন্ন** (৬) **ছাত্রদের বাক্স-বিছানা প্রভৃতি পরিদর্শন** (Kit Inspection) এবং (৭) **নির্বীজন বা স্বাস্থ্য দিবস প্রভৃতি**। এইসব কাজগুলোই বিভিন্ন দলে ভাগ করে নিয়ে কিভাবে সুসম্পন্ন করতে হবে, সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

(১) **বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশ সাফাই:** বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ (থাকলে), উদ্যান ও চারপাশের পরিবেশকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। সেই সব ভাগের দলনেতার দলে থাকবে ৬।১০ জন ছাত্র বা ছাত্রী। তারা বিদ্যালয় সম্মুখস্থ এলাকাকে কয়েকটি প্লটে ভাগ করে নিয়ে তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করবে। যেমন—দশম শ্রেণীর 'ক'দল রোল নং………এত……, ফুল বাগান থেকে অফিস ঘরের সামনেটুকু—কাজ—গাছের শুকনো পাতা, কাগজের টুকরো সিগারেট কুচি ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে সার বেদিকায় ফেলা; ঐ শ্রেণীর খ দলের ছাত্ররা রোল নং………এত……তাদের হাতের এলাকা হবে অফিস ঘরের সামনে থেকে বিদ্যালয় ময়দানের প্রথমার্ধে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব। এইভাবে প্লট ভাগ করে নিতে হয়।

(২) **সামুদায়িক সাফাই:** বিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ পরিবেশ সাফাই-এর কাজে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী একজন শিক্ষকের অধীনে সামুদায়িক সাফাইয়ের কাজ করবে। প্রতি মাসের শেষ শনিবারে এই সামুদায়িক সাফাই-এর কাজ হবে। তার আগে স্থান নির্বাচন ও পরিদর্শন করেই দলনেতা একটি পূর্ণাঙ্গ কার্য-সূচী গ্রহণ করবে। সেখানে কাজের ধারা স্থির ও দায়িত্ব বণ্টন করে দিতে হবে, নইলে, কার্যক্ষেত্রে গিয়ে অসুবিধা হ'তে পারে।

(৩) **দেওয়াল-লিখন মোছা অভিযান:** অনুরূপভাবে দলগঠন করে বিদ্যালয়ের সমস্ত দালান কক্ষের ভিতর, বাইরের দেওয়াল লিখন মোছা ও ঝুল ঝাড়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে। দরকার হলে চুনকামের কাজেও হাত দিতে হ'বে।

(৪) **শ্রেণী কক্ষ বিন্যাস ও সাফাই:** পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা হ'বে পূর্ববৎ। তবে এই কার্যসূচীর অন্তর্গত হ'বে নিম্নলিখিত কাজকর্ম। যথা—কাঠের ব্লাকবোর্ডে কালি দেওয়া, শ্রেণী কক্ষের ঝুল ঝাড়া, ছবি চার্ট ঝাড়া, চেয়ার বেঞ্চি পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ।

(৫) **নিজ নিজ এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখো:** বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্য এক একটা প্লট ভাগ করা থাকবে, তার সৌন্দর্য বর্ধন, তত্ত্বাবধান ও পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে থাকবে প্রত্যেকটি ছাত্রের। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের কোথাও যাতে একটুকরা কাগজ, অন্য কোন নোংরা পড়ে না থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

(৬) **ছাত্রদের বাক্স-বিছানা পরিদর্শন (Kit Inspection):** যে সমস্ত বিদ্যালয় আবাসিকা অথবা যে সমস্ত বিদ্যালয়ে এন-সি-সি, ব্রতচারী দল আছে,

সেই সব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাক্স-বিছানা-ছাত্রাবাস, অথবা তাদের পোষাক পরিচ্ছদ মাসে একবার পরিদর্শন করানোর ব্যবস্থা করবেন প্রধান শিক্ষক।

**নির্বীজন বা স্বাস্থ্য দিবস (Disinfection day):** এই দিনে হবে ব্যাপক ভাবে স্বাস্থ্য বিধিসম্মত বিশেষ সাফাই। জীবাণুনাশক ওষুধ, ফিনাইল, ডি-ডি-টি ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি পায়খানা, প্রস্রাবাগার, রান্নাঘর, ড্রেন ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে। পানীয় জলের পাত্র, বাসন-পত্তর, প্যান বেসিন প্রভৃতি ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে। যেখানে রোগীর ঘর (Sick room) আছে, সেই ঘরে মাসে একবার চুনকাম করা, লাইজল দিয়ে ঘরের মেঝে বাসন পত্তর ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে।

এইভাবে উক্ত সাত দফা কার্যসূচী সুসম্পন্ন হলে, পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখো-আন্দোলন সার্থক হ'বে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান

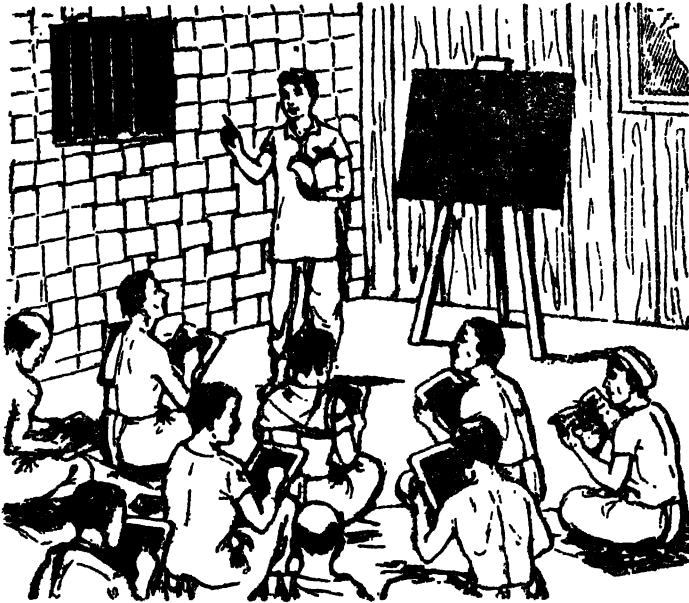
শিক্ষাই 'যথার্থ মানুষ' হয়ে উঠতে সাহায্য করে। যে দেশে শিক্ষিতের হার যতো বেশী, সে দেশ ততো উন্নত, এ কথা বলাই বাহুল্য। শিক্ষা দেশের জনসাধারণকে দেশ সম্পর্কে ভাবতে শেখায়। অর্থাৎ কি করলে দেশের মঙ্গল হবে, কোন্ বিষয়টি দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়, এসব সম্পর্কে তাকে সচেতন ক'রে তোলে। শুধু তাই নয়, জ্ঞানের আলোও এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশের জনসাধারণকে আলোকিত করে তোলে। দেশের যাঁরা জ্ঞানী গুণী তাঁদের বাণী এবং জীবন কাহিনী পাঠ দেশের মানুষকে সৎ এবং সুস্থ জীবনযাপনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তাছাড়াও শিক্ষার দ্বারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। যে কোন তুচ্ছ ব্যাপারেও না হলে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এ নিশ্চয়ই যে কারো পক্ষে অগৌরবের বিষয়। প্রিয়জনকে চিঠি লেখা অথবা প্রিয়জনের চিঠি এলে পড়াবার জন্যও যদি কারো সাহায্য নিতে হয়, তাহলে তার চাইতে অগৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে? স্বাধীন দেশে কোন

নাগরিক যদি শিক্ষাহীন হয় তাহলে যে নাগরিকের জন্য সে দেশেরও অগৌরব এবং লজ্জার বোঝা বইতে হয়।

আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার খুব কম। স্বাধীনতা লাভের এতদিন পরও শতকরা ২৫।৩০ জনের বেশী অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন লোক এদেশে নেই। সুতরাং এই অগৌরবের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সবারই এগিয়ে আসা উচিত। ছাত্রদের বিশেষ ক'রে এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসা বিশেষ প্রয়োজন।

নিরক্ষরের সংখ্যা শুধুমাত্র গ্রামেই নয়, শহরেও যথেষ্ট। সুতরাং নিরক্ষরদের শিক্ষিত ক'রে তুলবার জন্য যে সংগঠন গ'ড়ে উঠবে তাদের এমনভাবে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যাতে গ্রামে ও শহরে তারা সহজে এবং দ্রুতগতিতে কাজ করতে



বয়স্কদের বিদ্যালয়

পারে। না হলে বিশাল এই দেশের বিপুলসংখ্যক নিরক্ষরকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হবে না।

বিদ্যালয়ের উঁচু শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই শিক্ষক শিক্ষিকারা একটি দল তৈরি করবেন। তাদের অবসর সময়ে নিরক্ষরদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য,

পদ্ধতি এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন। শুধু তাই নয়, তারা কি ক'রে বিপুলসংখ্যক নিরক্ষরকে আস্তে আস্তে সাক্ষর ক'রে তুলতে পারবে, সে সম্পর্কেও শিক্ষিক-শিক্ষিকারা তাদের সচেতন করবেন।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে প্রথমে কাছাকাছি একটি গ্রাম ঠিক করা হবে, যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা মোটামুটি মত। ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে সেখানে যাবে। প্রত্যেক ঘরে গিয়ে খোঁজ নেবে নিরক্ষরের সংখ্যা কত। সঙ্গে সঙ্গে তালিকা তৈরি করে ফেলবে একটি। বয়স, আয় ইত্যাদি সব লেখা থাকবে তাতে। একটি রেজিষ্টারে সেটি তোলা হবে। তারপর দেখা হবে কত সময় লাগতে পারে তাদের সাক্ষর করে তুলতে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তারই ওপর নির্ভর ক'রে তাদের দিয়ে শিক্ষাদান শুরু করাবেন। সবাইকে হয়তো একসঙ্গে সাক্ষর ক'রে তোলা সম্ভব হবে না। সুতরাং বিভিন্ন দলে ভাগ ক'রে শিক্ষা দান করা শুরু হবে। প্রতিদিনের রিপোর্ট রাখতে হবে একটি খাতায়।

যাদের শিক্ষাগ্রহণ শেষ হবে, তাদের নামের পাশে রেজিষ্টারে তা লিখতে হবে। যে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাদান করালো, তাদের নামও থাকবে সেই সঙ্গে।

শিক্ষা দেবার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা নানা অসুবিধায় পড়তে পারে। তখন সেই ব্যাপারে তারা সাহায্য নেবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা কি রকম ভাবে শেখাচ্ছে, তাদের ত্রুটি কোথায়, তাও শিক্ষাদানের সময় পেছনে বসে তাঁরা দেখবেন।

সাধারণভাবে শিক্ষা দেবার যে সমস্ত পদ্ধতি আছে সেভাবে কিন্তু এই নিরক্ষরদের শিক্ষাদান সম্ভবপর নয়। ছেলেবেলায় শিক্ষাগ্রহণের স্বাভাবিক একটা আগ্রহ থাকে। তখন অধ্যবসায়, পরিশ্রমের ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদিও বেশী থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া নিরক্ষরদের মধ্যে বয়স্করা জীবন ধারণের জন্য অফিসে, কৃষিকাজে, অথবা কলকারখানায় নিযুক্ত থাকে। সুতরাং চাকরীর সমস্যা মিটিয়ে, সংসারের সারাদিনের কাজ ক'রে তবে তাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়।

এই কারণেই তাদের অন্যরকম হবে শিক্ষাদান পদ্ধতি। অর্থাৎ শিক্ষার বিষয়, সময় এবং শিক্ষার মাধ্যম সবই তাদের প্রয়োজন এবং সুবিধানুসারে রচনা করতে হবে।

শিক্ষাগ্রহণ ব্যাপারে নিরক্ষরদের মধ্যে আগ্রহের অভাব দেখা যেতে পারে। কারণ সারাদিন পরিশ্রম ক'রে ক্লান্ত শরীরের বিশ্রাম প্রয়োজন হয়। সেই সময়

পড়াশুনোর মতো একটি গভীর বিষয় নিশ্চয় তাকে আগ্রহী ক'রে তুলবে না। শুধু তাই নয়, শিক্ষালাভ ক'রে কি লাভ এ প্রশ্নও তাদের মনে জেগে উঠতে পারে। এ সময় অসম্ভব ধৈর্য্যের সঙ্গে তাদের বোঝাতে হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। বোঝাতে হবে, শিক্ষাই সম্মান দেয় অসম্মানকে মুছে দিয়ে। সেই সঙ্গে নানাভাবে আনন্দময় ক'রে তুলতে হবে পাঠ্য বিষয়কে। তার জন্য খেলাধূলো, বেতার, নানা ধরণের গল্পের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পড়াশুনো তাহলে বোঝা হ'য়ে উঠবে না। সারাদিনের কাজকর্মের পর মানসিক আনন্দও সারাদিনের পরিশ্রমকে কমিয়ে দেবে।

মোটামুটি একটা খোলামেলা জায়গা প্রয়োজন শিক্ষাদানের জায়গা হিসেবে। নাহলে ঠিক মনোযোগ আসবে না। যথেষ্ট আলোর প্রয়োজন সেই সঙ্গে। গ্রামে খোলামেলা জায়গার অভাব নেই। তেমন প্রয়োজন হলে গ্রামে স্থায়ী যে পূজো প্রাঙ্গণ থাকে সেখানেও ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক গ্রামে একটি স্কুল বা পাঠশালা থাকেই। রাত্রে সেখানে অনায়াসেই শিক্ষাদানের কাজ চলতে পারে। শহরে সে সুবিধাটুকু অনেক সময় পাওয়া যায় না।

শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে সহজ এবং প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখে। অর্থাৎ সহজ ক'রে শিক্ষার বিষয়কে নিরক্ষরদের কাছে তুলে ধরতে হবে। নাহলে শিক্ষার প্রতি বিমুখ হয়ে উঠবে তাদের মন। তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া বিষয়বস্তু যদি প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখে তৈরী করা না হয়, তাহলে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ জন্মাবে না। কারণ এই ধরণের শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োজনের কথাটাই বড়। কাজেই সেইভাবেই তাদের শিক্ষায় আগ্রহী ক'রে তুলতে হবে। তাদের পাঠ্যক্রমে থাকবে কিছু অঙ্ক, সমাজবিদ্যা, কলকারখানা, চাষবাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ইত্যাদি। আর থাকবে দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির যতোটা সম্ভব পরিচয় দেবার চেষ্টা। এতে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জন্মাবে।

আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে, নিরক্ষরদের শিক্ষাদান যথার্থ নাগরিকের কর্তব্য। সুতরাং একাজে ছাত্রদের নিশ্চয়ই সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

এই ব্যাপারে কিছু খরচ হয়েই থাকে। চক, ডাস্টার, ব্লাকবোর্ড, আলোর ব্যবস্থা করা ছাড়াও অনেক সময় কিছু বই শিক্ষার্থীদের কিনে দিতে হয়। এই সমস্ত কাজে বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ পাবার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলতে হবে। শিক্ষার্থীরাও যে যেমন পারবে সাহায্য করবে। সব সময়ই যে আর্থিক সাহায্য হবে তা নয়। অন্যভাবেও আসতে পারে সে সাহায্য।

ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা অনুষ্ঠান করেও অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। তেমন প্রয়োজন হলে শিক্ষাবিভাগের কাছে আবেদন করতে হবে। শিক্ষাবিভাগ এ সম্পর্কে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

এভাবেই দেশকে গৌরবময় করে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে 'শিক্ষাই মানুষকে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে।'

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## স্মরণোৎসব দিবস

বিদ্যালয় থেকেই ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য নিজেদের তৈরি করে। তাদের ওপরই নির্ভর ক'রে দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি। তাদের চিন্তায়, কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে যদি দেশের মহান ব্যক্তিদের চিন্তাভাবনার ছাপ পড়ে, তবেই তারা দেশের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠতে পারে।

বিদ্যালয়ে এই কারণেই মনীষী এবং দেশনেতাদের জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়, উদ্‌যাপিত হয় জাতির জীবনের উল্লেখযোগ্য দিনগুলো। এই দিনগুলোয় বিদ্যালয়ে আসেন জ্ঞানীগুণীরা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উপস্থিত থাকেন। ছাত্রছাত্রীরা পবিত্র মন নিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসে। ফলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যাতে ছাত্রছাত্রীরা উপলব্ধি করতে পারে দিনটির গুরুত্ব। মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে মনীষীদের বাণী।

এই দিনগুলোয় বিদ্যালয়ে কোনো ছাত্রছাত্রীরই অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। অবশ্য শারীরিক অসুস্থতা হ'লে আলাদা কথা। বিদ্যালয়কে সাজিয়ে তোলা উচিত সবাই মিলে। এমনভাবে সাজিয়ে তোলা উচিত, যাতে অন্যান্যদিনের চাইতে বিদ্যালয় খানিকটা আলাদা হয়ে ওঠে। দরকার হলে শিক্ষকশিক্ষিকাদের সাহায্য নেয়া উচিত। যাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপিত হবে তাঁর ছবি সাজাতে হবে, তাঁর বাণী হাতে লিখে রাখতে হবে। জাতীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য দিন উদ্‌যাপিত হ'লে সেদিনের সম্পর্কে যে সব তথ্য যোগাড় করা সম্ভব সেগুলো লিখে রাখতে হবে। সেবিষয়ের ছবি যদি কোথাও পাওয়া যায় সেগুলো টাঙিয়ে দিতে হবে। সেদিন সম্পর্কে বিখ্যাত লেখকদের, মনীষীদের লেখা সংগ্রহ ক'রে হাতে লিখে সাজাতে হবে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

নিমন্ত্রিত জ্ঞানীগুণীরা এবং শিক্ষকশিক্ষিকারা যেমন দিনটি সম্পর্কে অথবা মনীষী সম্পর্কে বলবেন, তেমনি ছাত্রছাত্রীদেরও কিছু বলা প্রয়োজন। তারাও যে, কোনো বিষয়ে পিছিয়ে নেই সে সম্পর্কে যেন তাঁরা বুঝতে পারেন। শুধু তাই নয়, তাদের চিন্তা এবং বলবার শক্তি সম্পর্কেও তারা তাদের যোগ্যতার পরিচয় রাখবে।

এজন্য এক সপ্তাহ আগে থেকেই শিক্ষকশিক্ষিকাদের কাছ থেকে তারা সে সম্পর্কে জেনে নেবে। লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়বে। প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ যাঁরা তাঁদের কাছে যাবে। এইভাবে যদি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উল্লেখযোগ্য দিনগুলো উদ্‌যাপন করতে পারে, তবেই তাদের শিক্ষা সার্থক হ'য়ে উঠবে। তবেই তারা গাইতে পারবে, 'আমাদের বিদ্যানিকেতন আমাদের গৌরবের ধন।'

সারা বছরে বেশ কয়েকটি দিন এর জন্য বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষকশিক্ষিকারা একটি বিভাগ তৈরি করবেন। তাদের দায়িত্ব হবে বছরের প্রথমে একটি তালিকা তৈরী ক'রে এই দিনগুলো সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা, অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাদের নিজেদের পরিকল্পনা তৈরি শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানের দিন বিদ্যালয় ভবনকে কি ক'রে সাজানো হবে, কি কি প্রয়োজন অনুষ্ঠানের জন্য, অনুষ্ঠানের দিন সমাজের কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে, তাও তারা ঠিক করবে। তাদের সাহায্যেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা, প্রদর্শনী, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন। এই কারণেই এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উঁচু শ্রেণী থেকে নির্বাচন করা প্রয়োজন।

এইভাবে বিভাগ তৈরি করার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুধু উৎসাহের সঞ্চারই হবে না, কি ক'রে অনুষ্ঠান চালনা করতে হয় তা যেমন তারা শিখবে, তেমনি তাদের মধ্যে জেগে উঠবে দায়িত্ববোধ এবং শৃঙ্খলাবোধ। ছাত্রছাত্রীরাই ভবিষ্যতের মহান নাগরিক। এই গুণগুলি তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই জেগে ওঠা প্রয়োজন—দেশের এবং দশের স্বার্থেই।

এই দিনগুলো সারা বছর প্রতিপালিত হবে কিভাবে, তাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা যদি সেভাবে উদ্‌যাপন করে সেই উল্লেখযোগ্য দিনগুলো, তবেই তা সার্থক হয়ে উঠবে।

## বীর বরণ দিবস

মানুষের প্রতিভা নানাদিক দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। কেউ খেলায়, কেউ লেখায়, কেউ রাজনীতিতে, কেউ বা শিল্পে নিজের প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে

নেন। তাঁরা সবাই চিরকাল দেশের গৌরব হয়ে বেঁচে থাকেন। তাঁদের মৃত্যু নেই। সাধারণ মানুষ তাঁদের বাঁচিয়ে রাখে, তাঁদের অনুসরণ ক'রে, তাঁদের বাণীকে নিজের জীবনে সফল করে।

সমাজে এই প্রতিভাবানেরা যে কত উঁচুতে, তার প্রমাণ তাঁদের জন্মদিন এলেই বুঝতে পারি। চতুর্দিকে যেন উৎসবের সমারোহ শুরু হয়ে যায় এবং একথা সত্যি তাঁরা যেন জাতির জীবনে উৎসবের মতোই।

আমাদের দেশে অনেক দেশপ্রেমিক জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা দেশের জন্য নিজেদের জীবন দিয়েছেন বীরের মতো। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের দিকে তাকালেই তাঁদের পরিচয় পাই। সোনার অক্ষরে তাঁদের নাম লেখা আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে। সমস্ত পৃথিবী অবাক হয়ে স্মরণ করছে তাঁদের সেই বীরের মতো আত্মদানকে, প্রশংসা করেছে মুক্তকণ্ঠে। এমন কি যাদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সেই ইংরেজও তাঁদের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের দেশে দেশনেতাও এসেছেন অনেক। তাঁরা অসীম ধৈর্যে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কত দুঃসময় তাঁদের নেতৃত্বে অবলীলায় অতিক্রম করে এসেছে দেশের মানুষ। তাঁদের কথাও সোনার অক্ষরে লেখা আছে ইতিহাসে।

বিদ্যালয়ে তাঁদের জন্মদিন পালন করা ছাত্রছাত্রীদের পবিত্র কর্তব্য। তাঁদের আদর্শ, আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত, শোকে, দুঃখে, বিপদে তাঁদের ধৈর্য এবং অবিচল থাকবার ক্ষমতা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুধু উৎসাহের সঞ্চারই করবে না, তাদের উদ্বুদ্ধ করবে দেশের জন্য আত্মত্যাগে, অবিচল রাখবে শোকে-দুঃখে-বিপদে। এইভাবেই দেশপ্রেমিকদের বীরত্ব গাঁথা গড়ে তুলবে সৎ এবং সুস্থ নাগরিক।

এদিন বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণটুকু সাজাতে হবে আল্পনায়, ফুলে, পাতায়, রঙিন কাগজে। তা যদি সম্ভব না হয়, তবে রঙিন কাগজ কেটে মালা বানিয়ে, ফুল তৈরি করে সাজাতে হবে। যাদের বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণ থাকবে না, তারা বিদ্যালয় ভবনটিকেই সাজিয়ে তুলবে সুন্দর ক'রে। যে দেশপ্রেমিকের জন্মদিন, প্রবেশ-পথেই থাকবে তাঁর বড় একটি প্রতিকৃতি। যদি প্রতিকৃতি যোগাড় করা সম্ভবপর না হয়, তবে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদেরই এঁকে নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে তারা সাহায্য নেবে। ছবির তলায় সেই বীর দেশপ্রেমিকের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ এবং সাল লিখতে হবে সেখানে, যাতে সবাই প্রথমেই যাঁর জন্মদিন পালন হচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে এতটা ধারণা গড়ে তুলতে পারে। তাহ'লে অনুষ্ঠানের সময় যে আলোচনা হবে, বক্তৃতা হবে, তা বুঝতে কারো-কোনোরকম অসুবিধে হবে না।

ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের হাতেই মঞ্চ সাজাবে। সেখানে দেশপ্রেমিকদের ছবি সাজানো থাকবে। মালা দিতে হবে সেই সব ছবিতে। ধূপের গন্ধে যেন পবিত্র হ'য়ে ওঠে সেই জায়গাটি। ছাত্রছাত্রীরা কোনোরকম গোলমাল করবে না সেখানে তাতে নষ্ট হয়ে যাবে উৎসবের গাম্ভীর্য। শুধু তাই নয়, যাঁর জন্মদিন পালন করা হচ্ছে তাঁর প্রতিও তাহ'লে যথাযথ সম্মান দেখানো হবে না।

প্রথমে আলোচনা করতে হবে সেই দেশপ্রেমিক বীরের জীবনী। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা আলোচনায় যোগ দেবে। তাদের আলোচনা যেন যুক্তি নির্ভর হয়। তারজন্য আগে থেকেই তৈরি হতে হবে তাদের।

তারপর তাঁর আত্মত্যাগ, তাঁর জীবনের আদর্শ, তাঁর দেশপ্রেম, সমাজের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

এমনভাবে সমস্ত বিষয়টি আলোচনা করতে হবে, যাতে বিষয়টি বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরই বোধগম্য হয়। নাহলে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে পড়বে।

অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে শপথ নিতে হবে দেশপ্রেমিক সেই বীরের আদর্শকে অনুসরণ করবার শপথ। এই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে সমস্ত অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠান শেষে যেন অযথা হট্টগোলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ভোরে না ও'ঠে। কারণ তা হলে সেই শপথ গ্রহণের মর্যাদা আর থাকবে না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় বীর। তাঁর জন্মদিবস কি করে পালন করা হবে, তা আলোচনা করলেই ছাত্রছাত্রীদের স্পষ্ট একটা ধারণা হবে এ সম্পর্কে।

২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। বিদ্যালয়ে বীর দিবসে নেতাজী জন্মতিথি পালন করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রবেশপথে নেতাজীর একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি সাজানো হবে। তাঁর গলায় মালা থাকবে। সম্ভব হ'লে ছাত্রছাত্রীরাই ভোরবেলা ফুল তুলে এনে মালা গাঁথবে।

প্রতিকৃতির পাশে লেখা থাকবে নেতাজীর জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, পিতামাতার নাম এবং নেতাজীর যে কোনো একটি বাণী—যেমন ধরা যাক, Give me blood, I will give you freedoom.

বিদ্যালয়ের ভেতরটা ফুলে আর রঙিন কাগজের মালায় সাজিয়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মঞ্চ তৈরি করতে হবে।

মঞ্চের উপরেও নেতাজীর ছবি থাকবে, ফুলে ফুলে সাজানো থাকবে সেই ছবি। ধূপ জ্বলবে, প্রদীপ জ্বলবে। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সুরু হবে অনুষ্ঠান। প্রাঙ্গণ না থাকলে অবশ্য বিদ্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে গানের মধ্য দিয়েই

অনুষ্ঠান সুরু হবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অথবা জ্ঞানীগুণী কেউ সেই পতাকা উত্তোলন করবেন। তারপর নেতাজীর জীবন, তাঁর বাণী এবং কি ক'রে সেই আদর্শে সবাই উদ্বুদ্ধ হতে পারি, তা নিয়ে আলোচনা হবে, বক্তৃতা হবে। এতে অংশগ্রহণ করবে ছাত্রছাত্রীরাই শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং বিশিষ্ট অতিথিরা ভাষণ দেবেন এরপরে। নেতাজীর ছেলেবেলায় আদর্শের কথা ব'ড়ো করে তুলে ধরতে হবে তাদের সামনে।

সবশেষে ছাত্রছাত্রীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের গান গাইবে—কদম কদম বঢ়ায়ে যা। সঙ্গে ব্যাণ্ড বাজলে ভালো লাগবে। অবশ্য যাদের স্কুলে ব্যাণ্ড নেই তাদের খালি গলাতে গাইলেই হবে। গানের শেষে ছাত্রছাত্রীরা শারীরিক কলা-কৌশল প্রদর্শন করবে। তাদের পোষাক হবে সাদা। পায়ে থাকবে সাদা কেড্‌স্‌। না হলে সাদাগেঞ্জি এবং খালি পায়ে শারীরিক কলাকৌশল দেখাবে। সমাপ্তি সংগীতও ছাত্রছাত্রীরাই গাইবে। সমাপ্তি সংগীতটি হবে রবীন্দ্রনাথের একটি গান, 'তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ কর।'

অনুষ্ঠান শেষে ব্যাণ্ড বাজাবে তারই তালে তালে ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে যাবে; আর ব্যাণ্ড না থাকলে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবে।

এইভাবেই উদ্‌যাপিত হবে ২৩শে জানুয়ারী—নেতজীর জন্মদিন।

এইভাবেই বিদ্যালয়ে বীর দিবস পালন ক'রে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের দেশের ঐতিহ্য এবং গৌরবকে প্রতিষ্ঠা দেবে।

**জাতীয় সংহতি দিবস :** বিশাল এই ভারতবর্ষ। একদিকে তার আদিগিন্ত নীল সমুদ্র, অন্যদিকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো হিমালয়ের বিশাল পাষাণ প্রাচীর। তার মাঝখানে কোথাও শস্য শ্যামল সমতলভূমি, কোথাও ঊষর মরুভূমি, কোথাও যোজনের পর যোজন অরণ্য, কোথাও ছোট ছোট পাহাড়—তার মাঝে অসংখ্য নদ-নদী দুরন্ত ধারায় ছুটে চলেছে পাহাড় থেকে সমুদ্রে।

বলা যায় অপর সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে আমাদের ভারতের বিপুল এবং রহস্যময় ভূ-প্রকৃতির মধ্যে। সে সৌন্দর্য পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবিও বুঝি তাই বলেছেন, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—'

এই সৌন্দর্যময় প্রাকৃতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আর জনপদ গ'ড়ে উঠেছে বিভিন্ন মনোভাব-সংস্কৃতি আর ভাষা নিয়ে। চেহারেতেও এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের পার্থক্য গ'ড়ে উঠেছে। আসাম অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে তামিলনাড়ুর ভাষার কোন মিল নেই, মিল নেই

আচারে, ব্যবহারে, পোষাকে। এই যে বিভিন্নতা- এই বিভিন্নতার মধ্যে কিন্তু একটা ঐক্যের সুর, সংহতির সুর বেজে চলেছে অনাদি কাল থেকে। সেই ঐক্য এসেছে ধর্মের মধ্য দিয়ে, এসেছে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার তাগিদে। শুধু তাই নয়, সমস্ত ভাষারই মূল সংস্কৃত হবার ফলে ভাষাগত ঐক্যও গ'ড়ে উঠেছে। হয়ত মাঝে মাঝে নানা কারণে সে ঐক্যে ফাটল ধরেছে কিন্তু সে ফাটল বেশীদিন থাকে নি, আবার সবাই এক হয়েছি 'মহামানবের সাগরতীরে।' 'মায়ের ডাকে' মিলেছি, এক হয়ে গেছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষ অখণ্ড ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল। বাঙালী-বিহারী-মারাঠী পাঞ্জাবীতে কোন তফাৎ ছিলো না। সবার ছিলো একলক্ষ্য, এক ধ্যান—ভারতের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা লাভের পরে আজ এই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে গেছে। ঐক্যহীনতা মানুষকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। একথা যে সর্বাংশে সত্যি, পৃথিবীর ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ আছে। শুধু গঠনমূলক কাজেই নয়, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেও জাতীয় সংহতি একান্ত প্রয়োজন। বাইরের শত্রু সবসময়েই থাকবে। ঐক্যবদ্ধ না হলে তাদের কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে। নিজেদের উন্নতির জন্য, প্রত্যেকের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যেও এই সংহতির গুরুত্ব অসাধারণ। আমাদের পরিচয় বাঙালী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, বিহারী, উড়িয়া, অসমীয়া হিসেবে নয়—আমরা প্রথম এবং শেষ পরিচয় আমরা 'ভারতবাসী।' এই বোধকে দেশবাসীর মনে বিশেষভাবে জাগিয়ে তুলতে হবে। তার জন্য চাই নিরলস শ্রম, ধৈর্য এবং নূতন নূতন পরিকল্পনা। এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্বই সব চাইতে বেশী। তারা যে শুধু নিজেরাই এ ব্যাপারে কাজ করবে তা নয়, তারা নিজেদের জীবন এবং কর্মের মধ্য দিয়েও তা সার্থক করবে। ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষা শেষে কাজে ছড়িয়ে পড়বে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। পরিচিত হবে নতুন দেশ, নতুন পরিবেশের সঙ্গে। বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় ভারতকে উপলব্ধি করবে। সুতরাং সবার মধ্যে তখন এই ঐক্য-বোধ জাগিয়ে তুলতে পারবে তারাই। কাজেই জাতীয় সংহতি রচনা করবে তারাই। আর সে জন্যই বিদ্যালয়ে জাতীয় সংহতি দিবস বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা একান্ত প্রয়োজনীয় একটি কর্তব্য।

জাতীয় সংহতি দিবসে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় ভবনকে এমনভাবে সাজাবে যাতে সমগ্র ভারতের পূর্ণরূপ ফুটে ওঠে সেখানে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অথবা হলঘরে ছোট্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করবে তারা। সেখানে তারা ভারতের একটা বড়

রাজনৈতিক মানচিত্র আঁকবে। সেই মানচিত্রের পাশে বিভিন্ন প্রদেশের পোষাক পরিচ্ছদ সাজানো থাকবে। সত্যিকারের পোষাক যোগাড় করা হয়তো সম্ভব নয়। কাজেই তা রঙিন কাগজ কেটে অথবা রঙ দিয়ে এঁকে রাখবে। বিভিন্ন অঞ্চলের স্ত্রী-পুরুষের ছবিও থাকবে সেখানে। প্রয়োজন হলে এঁকে নিতে হবে সে ছবি। বিভিন্ন প্রদেশের লেখা বইও থাকবে কিছু। থাকবে ভাষা ও লিপির ছোট ছোট কার্ড। এ ছাড়া কোন্ প্রদেশে কি পাওয়া যায় এবং এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের উপর নানাভাবে কতখানি নির্ভরশীল তারও বিবরণ, সম্ভব হলে ছবি সহ সেখানে থাকবে।

ছাত্রছাত্রীরা ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে নানা কথা বলবে। সম্ভব হলে অন্য বিদ্যালয়কে আমন্ত্রণ করবে বিতর্ক সভার জন্য। সে বিতর্কের বিষয় হবে জাতীয় সংহতি। এরপর ছাত্রছাত্রীরা নানা প্রদেশের গান কবিতা আবৃত্তি করবে। এ নিয়ে প্রতিযোগিতাও হতে পারে। অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রছাত্রীরা যদি যোগ দেয় তাহলে অনুষ্ঠানটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সেইসব গান কবিতা জাতীয় সংহতিমূলক হলেই ভালো হয়। এ সব ব্যাপারে অবশ্য শিক্ষকদের সঙ্গে তারা পরামর্শ করে নেবে। বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সবাই মিলে নাটকও করা যেতে পাবে। যে প্রদেশের যে অভিনয় সে সেই প্রদেশের কথা না বলে অন্য কোন প্রদেশের কথা বললে অনুষ্ঠানটি আরও উপভোগ্য হতে পারে।

এইভাবে আলোচনা, বিতর্ক, প্রদর্শনী, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় সংহতি ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরো বেশী করে সচেতন হতে পারবে এবং ভবিষ্যতের ভারতবর্ষের যথার্থ নাগরিক হতে পারবে।

**ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক-দিবস:** আমাদের দেশ অনেক প্রাচীন দেশ। প্রাচীন দেশ বলেই যুগে যুগে নানারকম সামাজিক এবং ধর্মীয় সমস্যা এসে অগ্রগতি রোধ ক'রে দাঁড়ায়। তখন সেই সমস্যাগুলোকে দূর করতে না পারলে দেশের মুক্তি ঘটে না। দেশ ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু চিরকালই সেই মুহূর্তে সামাজিক এবং ধর্মীয় মুক্তির জন্য কোনো একজন মহাপুরুষ এসে দাঁড়ান। তিনি তাঁর প্রবল শক্তিতে সংগ্রাম ক'রে যান অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে এবং জয়ীও হন শেষ পর্যন্ত। এরা আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষদের জন্য ভারত তার পুরোনো ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে যুগযুগান্তর ধ'রে চলে এসেছে, সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করেছে সেই ঐতিহ্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি।

ছাত্রছাত্রীদের নিশ্চয়ই সেই মহাপুরুষদের সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে হবে। জানতে হবে তাঁদের জীবন এবং আদর্শ।

এজন্য বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি বিভাগ তৈরী করতে হবে। তাদের সঙ্গে থাকবেন একজন কি দুজন শিক্ষক-শিক্ষিকা, তাঁদের পরামর্শে পরিচালিত হবে তারা।

সারা বছরে ক'দিন এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের স্মরণে অনুষ্ঠান হবে, ছাত্রছাত্রীরা আগেই তার একটি তালিকা তৈরি করবে। সেই তালিকা অনুযায়ী তারা পরিকল্পনা তৈরি করবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিপালিত হবে সেই দিনগুলো।

অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরাই অংশ গ্রহণ করবে।

যেমন অন্যান্য অনুষ্ঠানে, তেমনি এই অনুষ্ঠানেও ছাত্রছাত্রীদের আঁকা মহাপুরুষের প্রতিকৃতি থাকবে মঞ্চে। বাইরেও সম্ভব হ'লে একটি হাতে আঁকা প্রতিকৃতি রাখতে হবে। প্রতিকৃতি দুটি সাজাতে হবে ফুলের মালায়, চন্দনে। তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখ লেখা থাকবে ছবির তলায়। জীবনী সংক্ষিপ্ত ক'রে লেখা পাশে থাকবে।

তারপর বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি, ইত্যাদি সব কিছুই হবে মঞ্চের ওপরে। প্রধান অতিথি এবং সভাপতি করতে হবে এমন দু'জনকে, যাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে এবং যে অনুষ্ঠান হচ্ছে সে সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের কাছ থেকে দিনটির তাৎপর্য এবং প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের সম্পর্কে শুনবে। প্রয়োজন হ'লে প্রশ্ন করেও জেনে নেবে অনেককিছু। সঙ্গে একটি নোটবই রেখে তাতে বিষয়গুলি লিখে নিলে আরো ভালো হয় নিশ্চয়ই। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আগে থেকেই এ ব্যাপারে তাদের অভ্যস্ত করাবেন।

সেদিন ছাত্রছাত্রীরা হাতে লেখা একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতে পারে। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবনী এবং বাণী থাকবে তাতে। মহাপুরুষদের ছবিও থাকবে। সেগুলো তারা নিজেরাই হাতে আঁকবে। তারাই সম্পাদনা করবে।

আরেকটি আকর্ষণীয় জিনিষও করা যায় সেদিন। ভারতবর্ষে ধর্মীয় এবং সামাজিক ঐতিহ্য কি ছিলো এবং তা কিভাবে যুগের পর যুগ পার হয়ে এসেছে সে সম্পর্কে ছোট্ট একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায় বিদ্যালয়ে। সেখানে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ছবি থাকবে, থাকবে সামাজিক উৎসবের ছবি। উৎসবগুলো সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরাই দর্শকদের বুঝিয়ে বলবে। জিনিসটি যেমন উৎসাহ দেবে ছাত্রছাত্রীদের, তেমনি জ্ঞানও বৃদ্ধি করবে। এই ছবিগুলোও কিন্তু আঁকিয়ে নিতে হবে ছেলেদের দিয়ে। অনুষ্ঠান শেষে ছবিগুলো যত্ন ক'রে সাজিয়ে রাখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভারতের ঐতিহ্য সংক্রান্ত কোন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা উচিৎ। এই দিন সেই প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেওয়া হবে। শুধু তাই নয় সেই প্রবন্ধটি পাঠ করা হবে অনুষ্ঠানে।

জাতীয় সংগীতের শেষে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হবে।

পরের দিন প্রত্যেকটি ক্লাশে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে অথবা একটি নিবন্ধ রচনা করতে দিয়ে শিক্ষকশিক্ষিকারা আগের দিনের অনুষ্ঠানের উৎসব সম্পর্কে এবং প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের সম্পর্কে নতুন কি তথ্য জেনেছে, তা জেনে নেবেন।

**বিজ্ঞান দিবস:** বিংশ শতাব্দীকে নিশ্চয়ই আমরা বিজ্ঞানের যুগ বলবো। এ যুগে কোন বিষয় যদি সব চাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করে থাকে জীবনের সকল স্তরে, তবে তা বিজ্ঞান। এমন কোন দিন নেই যেখানে বিজ্ঞান একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে নি। সকাল থেকে শুরু করে সমস্ত দিন এবং রাত্রি বিজ্ঞানের কোন না কোন আবিষ্কার আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে। সুতরাং বিংশ-শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ হয়ে আমাদের জীবনে আশীর্বাদের যুগ হয়ে এসেছে।

অবশ্য শুধু আশীর্বাদই নয়, বিজ্ঞান খানিকটা অভিশাপ হ'য়েও এসেছে পৃথিবীতে। তবে তারজন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়, মানুষের মধ্যে যে অশুভ চিন্তা আছে, সেই অশুভ চিন্তাই তার জন্য দায়ী। অর্থাৎ বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারকে মানুষ নিজের ক্ষমতা এবং স্বার্থসিদ্ধির আশায় মানুষ মারার কাজে ব্যবহার করেছে এবং করছে। পরমাণু শক্তিতে যখন অসাধ্য সাধন করা সম্ভব মানুষের মঙ্গল করা সম্ভব তখন তা দিয়ে মানুষ হত্যার জন্য মারণাস্ত্র বানিয়ে মানুষ নিজের অশুভ বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছে।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদি তাদের আগ্রহ, ঔৎসুক্য বেড়ে ওঠে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে যদি তারা সচেতন থাকে, পৃথিবীর মহান বিজ্ঞানীদের কল্যাণ-মুখী চিন্তাধারার সঙ্গে যদি তারা পরিচিত হতে পারে, তবেই তাদের পক্ষে সম্ভব হবে বিজ্ঞানকে কেবল মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা। আর এর জন্য বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান দিবস পালন করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। এই দিবস পালনের মধ্য দিয়ে তারা যেমন আকৃষ্ট হবে বিজ্ঞানের দিকে তেমনি বিজ্ঞানকে মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহারের কথা ভাবতে পারবে।

বিজ্ঞান দিবসে বিদ্যালয়ের একটি অথবা দুটি কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবে। তাতে থাকবে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তৈরী বিজ্ঞানের মডেল, চার্ট, বিজ্ঞানীদের ছবি ইত্যাদি। অন্য একটি কক্ষে 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা'

বিষয়টি নিয়ে ছবি এবং লেখা ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিজ্ঞান কি করছে তারই পরিচয় থাকবে। যেখানে বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষের যে অকল্যাণ সাধিত হয়েছে, তার পরিচয়ও দেওয়া হবে, যাতে তার বিরুদ্ধে সবার মত তৈরী হয়।

এই ঘরগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরাই থাকবে। তারাই প্রদর্শনীর চার্ট, মডেল ইত্যাদি বুঝিয়ে দেবে দর্শকদের। ছাত্র-ছাত্রীরা যারা যে মডেলটি তৈরী করেছে, সেটি তারাই বুঝিয়ে দেবে। তা'তে তার উৎসাহ বেড়ে উঠবে আরো বেশী। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও ভবিষ্যতে নতুন কিছু তৈরীর কথা ভাবতে পারবে। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেবার জন্য এক সঙ্গে দু'তিন ভাগ ক'রে ছাত্রছাত্রী থাকবে। তারা সর্বক্ষণ থাকবে না। আধ ঘণ্টা পর পর তারা অন্য দলকে জায়গা ছেড়ে দেবে। এতে অনেক বেশী ছাত্রছাত্রীর সুযোগ হবে। উৎসাহিতও হ'য়ে উঠবে তারা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই দলগুলোকে আগে থেকে নানাভাবে তৈরী ক'রে দেবেন। যেন তারা প্রদর্শিত বিষয় সম্পর্কে সম্ভাব্য যে কোন প্রশ্নের উত্তর দর্শকদের দিতে পারে। তাতে যেমন তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটবে, তেমনি তারা বিজ্ঞান সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতেও শিখবে।

প্রদর্শনী ছাড়াও একটি অনুষ্ঠান হবে এই দিনতে। সে অনুষ্ঠানে সম্ভব হলে কোনো বিজ্ঞান সাধককে নিয়ে আসতে হবে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সামনে যা বলবেন, তাতে ছাত্রছাত্রীদের মনে উৎসাহের সঞ্চার হবে. ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে প্রশ্ন করে নিজেদের জ্ঞান বাড়াতে পারবে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকিরাও বলবেন বিজ্ঞান সম্পর্কে। সাহিত্যের শিক্ষক বলবেন, বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্য কিভাবে যুক্ত, সে কথা।

এই অনুষ্ঠানে একটি বিতর্ক সভারও আয়োজন করা হবে। সবাই যোগদান করবে সেই বিতর্কে।

উপস্থিত ক্ষেত্রে বক্তৃতাও ( extempore ) থাকবে অনুষ্ঠানে। তার বিষয় বস্তুও হবে বিজ্ঞান বিষয়ক তবে তাতে বিজ্ঞান নিয়ে কল্পনার ব্যাপারটি থাকবে বেশী।

বিজ্ঞান-ধাঁধাও থাকবে অনুষ্ঠানে। অর্থাৎ বিজ্ঞান নিয়ে ধাঁধার মতো প্রশ্নোত্তরের আসার। সব চাইতে বেশী প্রশ্নের উত্তর যে দিতে পারবে, তাকে আসরের সেরা বলে ঘোষণা করা হবে। এতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের আগ্রহেই বিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াশুনা ক'রে তৈরী করবে নিজেদের। যে কেউ এতে যোগ দিতে পারবে। তবে না জেনে কেউ উল্টো পাল্টা উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করতে পারবে না। সম্ভব হ'লে সরকারের প্রচার-বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে, অনুষ্ঠান শেষে বিজ্ঞান-বিষয়ক চলচিত্রও ছাত্রছাত্রীদের দেখানো যেতে পারে।

সুতরাং সবশেষে বলা যায়, বিজ্ঞান দিবস উৎযাপন স্কুলের একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। যথাযোগ্যভাবে যদি এই অনুষ্ঠানটি প্রতি বছর উদ্‌যাপিত হয় তবে তা ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান চেতনাকে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করবে।

# বিদ্যালয়ের কৃত্যালি

## প্রথম অধ্যায়

১। **বিদ্যালয় অলংকরণ : ( School Decoration ) :** আমাদের জীবনের সব চাইতে আনন্দের দিনগুলো আমরা বিদ্যালয়ে কাটিয়ে আসি।

ছাত্র-জীবনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়েই আমরা ভবিষ্যৎ জীবনের কাঠামো তৈরি করি। শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা—সবই সে সময়ে শিখি আমরা। কাজেই বিদ্যালয় জীবন আমাদের জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়। সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তিও মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় এই সময়। কাজেই বিদ্যালয় জীবনে সুন্দর এবং সুস্থভাবে তৈরি করতে হয় নিজেদের, নাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে কেবল দুঃখের মধ্যেই আমাদের দিন কাটাতে হয়।

বিদ্যালয় জীবন সুন্দর ক'রে তোলার প্রথম পদক্ষেপ হবে বিদ্যালয় ভবন এবং তার পরিবেশকে সুন্দর ক'রে তোলা। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ছাত্র-ছাত্রীদের মন পবিত্র হয়ে ওঠে। যেন মনে হয় 'আমাদের বিদ্যানিকেতন আমাদের গৌরবের ধন।' তারই জন্য বিদ্যালয়কে সাজিয়ে তোলা ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত কর্তব্য।

কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়কে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে তুলবে ?

এ ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নিতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের। তাঁরাই বিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে একটি দল তৈরি ক'রে দেবেন। সমস্ত বিদ্যালয় ভবনকে কিভাবে সাজানো হবে তা ঠিক করবেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তায়।

প্রথমে বিদ্যালয়ের একটি নক্সা এঁকে নিতে হবে। তারপর দেখতে হবে কোন জায়গাতে কি করলে বিদ্যালয় ভবনটি মনোরম হয়ে উঠবে। সব সময় মনে রাখতে হবে, অতিরিক্ত সজ্জা সব সময়ই কুৎসিত হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং যতোটুকু সাজালে ভালো লাগে তার বাইরে সাজাবার লোভ সম্বরণ করতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের।

সেই নকশা অনুসারেই তারা ঠিক করবে হাতে আঁকা ছবি, মহাপুরুষদের ছবি, জীবনী, বাণী, বিখ্যাত বই-এর কাহিনীর ছবি, ফুলের গাছ ইত্যাদি কোথায় কোথায় টাঙানো হবে। বিদ্যালয়ে প্রবেশের মুখে দু'পাশে ফুলগাছ লাগাতে হবে। যদি বিদ্যালয়ে প্রয়োজন মতো জায়গা না পাওয়া যায় তবে দুটি কিংবা চারটি টবে গাছ লাগিয়ে সেগুলিকে সাজিয়ে রাখতে হবে।

বিদ্যালয়ে ঢোকবার পর প্রথম যে ঘরে এসে দাঁড়াবে, সে ঘরে মনীষীদের ছবি, বাণী আঁকা এবং লেখা থাকবে। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামমোহন,

প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মণীষীদের সবারই ছবি থাকতে পারে সে ঘরে। সেগুলো এমন-ভাবে টাঙানো থাকবে যাতে সেখানে ঢুকলেই আগে ঐগুলি চোখে পড়ে। সেই ঘরের একপাশে একটি বড়ো বোর্ডে বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-চাত্রীরা কোন্ বছর ভালো ফল করেছে তার পূর্ণ বিবরণ লেখা হবে।

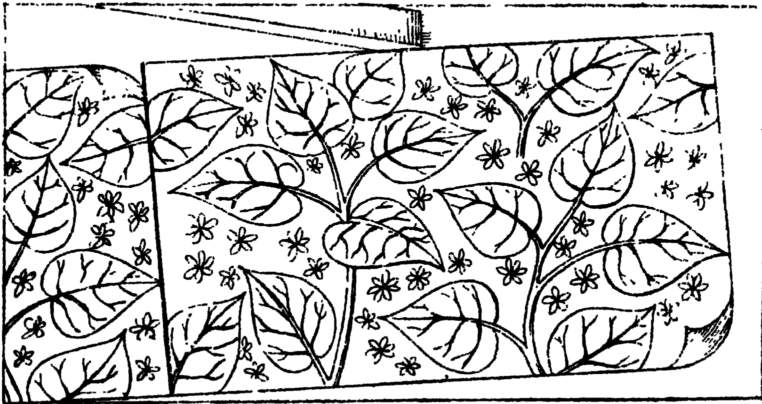
ঠিক সেই দেয়ালের বিপরীত দেয়ালে থাকবে পড়াশুনো ছাড়া অন্য বিষয়ে বিদ্যালয়ের যে সব ছাত্র বড়ো হয়েছে তাদের নামের তালিকা। এ সবই কিন্তু খুব স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্নভাবে লেখা হবে।

বিদ্যালয়ের ভেতরে প্রত্যেকটি ঘরের সামনের বারান্দায় টবে ফুলের গাছ রেখে দিতে হবে। যে সময় যে ফুল হয়, সেই ফুলগাছ লাগালেই ভালো হয়।

শ্রেণীকক্ষের দরজার ওপর মহাপুরুষদের ছবি এবং বাণী দিয়ে সাজাতে হবে। মহৎ ব্যক্তির ছবি এবং তাঁদের বাণী যদি সব সময় ছাত্র-ছাত্রীদের চোখের সামনে থাকে তাহলে তাদের অজান্তেই মনের গভীরে সে সব দাগ কেটে যায় এবং ভবিষ্যতে যে কোনো কাজের সময় তাঁদের সেই সব বাণী তাদের পথ দেখায়।

এছাড়া, যদি সম্ভব হয়, নীচু শ্রেণীর নীচু কক্ষের ভেতরের দেয়ালে মহাপুরুষদের জীবনের ধারাবাহিক ছবি, রামায়ণ, মহাভারতের টুকরো গল্পের ধারাবাহিক ছবিও টাঙানো যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে রঙিন কাগজের ফুলমালা তৈরী করিয়ে শ্রেণী



শ্রেণীকক্ষের দেওয়াল অলংকরণ

কক্ষের দেয়ালগুলোকে সাজানো হবে। পাশাপাশি দুটি শ্রেণীর বাইরের দেয়ালের মাঝখানেও রঙিন কাগজ দিয়ে সুন্দর কিছু ডিজাইন তৈরি ক'রে টাঙিয়ে দেবে।

বিদ্যালয়ে যদি হল ঘর থাকে, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা আলপনা এঁকে রাখবে বড়ো ক'রে। মঞ্চ থাকলে তার খাড়াই জায়গাতেও যেমন আলপনা দেখতে ভালো লাগবে সেখানে তেমনি আলপনা এঁকে রাখবে।

খোলামেলা দেয়ালে দেয়াল-পত্রিকা টাঙাতে হবে। দেয়াল-পত্রিকা স্কুল সজ্জার একটি অপরিহার্য বিষয়। ছবি এঁকে রঙ দিয়ে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে যে জায়গাটিতে সাজানো হবে যেন সে জায়গাটি সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

এই সব কাজ করবার পরে আরও একটি দায়িত্ব থাকবে ছাত্র-ছাত্রীদের। এজন্য শিক্ষকশিক্ষিকারা তাদের মধ্য থেকে আরও একটি দল তৈরি করবেন। এই দলের কাজ হবে যে সমস্ত বোর্ড, ছবি, ফুলগাছ ইত্যাদি সাজানো হলো সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা। প্রতিদিন বোর্ড এবং ছবিগুলো পরিষ্কার করা। ফুলগাছ-গুলোকে জল সেচন ক'রে সতেজ রাখা।

এইভাবে নিজের বিদ্যালয়কে সাজিয়ে তুললে ছাত্র-ছাত্রীরা যে আনন্দ অনুভব করবে, শিক্ষাগ্রহণ তাতে আরো সহজ, আরো আনন্দময় হয়ে উঠবে।

## ২। চার্ট, আদর্শ, পোষ্টার ও সময়রেখা

শিক্ষা গ্রহণ তখনই আনন্দময় হয়ে ওঠে যখন একমাত্র পাঠ্য বই-ই শিক্ষার অঙ্গ হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ যখন পাঠ্য বই-এর বিষয়বস্তু অনেকভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছয়, তখনই তা তাদের আকর্ষণীয় এবং আনন্দময় হয়ে ওঠে।

অনেকভাবে বলতে গেলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চার্ট, মডেল, সময়পঞ্জী ইত্যাদিকে বোঝায়। এগুলি পাঠ্য বিষয়কে শুধু সহজবোধ্য ভাবেই প্রকাশ করতে পারে তা নয়, এগুলির মধ্য দিয়েবিষয়বস্তু সবসময় চোখের সামনেও থাকে বলে দেখা, পড়া এবং শোনার মধ্যে সংযোগ ঘটে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে স্থায়ী- ভাবে পাঠ্যবিষয় থেকে যায়।

প্রত্যেকটি বিষয়েরই এমনি চার্ট, মডেল, সময়পঞ্জী হতে পারে। ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা, ইংরাজী ইত্যাদি সব বিষয়ের ওপরই সেজন্যে চার্ট, মডেল, সময়-পঞ্জী ইত্যাদি তৈরী করতে হবে। এগুলি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে বিভিন্ন শ্রেণীতে এগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করা যায়। কারণ একই জিনিস দু'তিনটি তৈরী না ক'রে অনেক রকমের আরো বেশী চার্ট তৈরী করা উচিত।

এগুলো কিন্তু ছাত্রছাত্রীরাই তৈরী করবে। শুধু তৈরীর সময় বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের সাহায্য করবেন। চার্ট বা মডেলটিকে যথাযথ ক'রে

তুলবার জন্য চাই নির্ভরযোগ্য বই, ছবি, এবং অভিজ্ঞতা। তা না হলে ভুল জিনিস ছাত্রছাত্রীদের চোখের সামনে থাকলে তা যে ক্ষতিসাধন করবে তা বলাই বাহুল্য।

এসব তৈরী ছাড়াও আরো কতগুলো কাজ আছে।

প্রথমতঃ চার্ট, মডেল বা সময়পঞ্জী কেমন হবে তা ঠিক ক'রে সেই অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করতে হবে বিভিন্ন শ্রেণী থেকে।

দ্বিতীয়তঃ চার্ট বা মডেল তৈরীর জন্য যে জিনিসপত্র প্রয়োজন, তা ছাত্রছাত্রীরা সম্ভবমত বাড়ী থেকেই নিয়ে আসবে। তাতে সেগুলোর প্রতি মনোযোগ থাকবে বেশী। সেগুলোর প্রতি মনোযোগ থেকে পাঠ্যবিষয়ের ওপরও মনোযোগ আসবে।

তৃতীয়তঃ বলা হবে যারা নিখুঁত মডেল, চার্ট এবং সময়পঞ্জী তৈরী করবে তাদের তো পুরস্কার দেয়া হবেই, তাদের সেই মডেলটি বিশেষভাবে রেখে দেয়া হবে বিত্যালয়ে। এমনভাবে রাখা হবে, যাতে বাইরের সবাই সেটি দেখতে পায়। বিত্যালয়ের প্রদর্শনীতেও রাখা হবে সেই মডেলটি।

এবার ভূগোলের একটি মডেল তৈরীর বিষয় আলোচনা করা যাক।

ভূগোলের ক্লাসে এস্কিমোদের জীবনযাত্রা বোঝানো হচ্ছে। এস্কিমোদের বাড়ি তৈরী হয় বরফ দিয়ে। তারা যাতায়াত করে স্লেজে করে—এইসব মুখে ব'লে বোঝানোর সাথে সাথে যদি একটা ইগলুর মডেল, স্লেজগাড়ির মডেল ছাত্রছাত্রীরা তৈরী করে অথবা দেখে তাহলে তাদের পক্ষে বিষয়টি সহজ হয়ে উঠবে।

এরজন্য ছাত্রছাত্রীরা বরফ তৈরী করতে তুলা আনবে, বোর্ড কেটে তৈরী করবে স্লেজ। বল্গা হরিণ এবং এস্কিমোদের ছবি এঁকে কেটে নেবে। তারপর আঠা দিয়ে বড়ো একটি কাঠের ট্রের ওপর ছবি দেখে সাজিয়ে দেবে জিনিষগুলো। আস্তে আস্তে তৈরী হয়ে উঠবে ইগলু, স্লেজ এস্কিমোদের চেহারা। পড়াটুকু হয়ে উঠবে আনন্দময়।

ইতিহাসে অসংখ্য সাল, তারিখ, যুদ্ধ, রাজার রাজত্বলাভ, রাজ্যচ্যুতি আর বিদ্রোহ বিপ্লব স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা লাভ ইত্যাদির ছড়াছড়ি। সাল তারিখ, রাজ্যসীমা ইত্যাদি মনে রাখা সত্যিই কষ্টকর। এই সাল তারিখ, যুদ্ধ ইত্যাদির ঘটনাকে যদি সময়পঞ্জীর সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে সাজানো যায় তাহলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তা বোঝা এবং মনে রাখা সহজ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সময়-পঞ্জী এইভাবে সাজাতে হবে :

| | |
|---|---|
| জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা | ১৮৮৫ সাল |
| বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন | ১৯০৫-১০ ,, |
| প্রথম অসহযোগ আন্দোলন | ১৯২০ ,, |
| দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন | ১৯৩০ ,, |
| দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ | ১৯৩৯ ,, |
| আগষ্ট আন্দোলন | ১৯৪২ ,, |
| আজাদ হিন্দ ফৌজ | ১৯৪২ ,, |
| স্বাধীন ভারত | ১৯৪৭ ,, |
| প্রজাতন্ত্রী ভারত | ১৯৫০ ,, |

বিজ্ঞান পাঠের সময়ও চার্ট বিশেষ প্রয়োজনীয়। ধরা যাক, উদ্ভিদ সম্পর্কে পড়ানো হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা একটি উদ্ভিদ মূলসুদ্ধ নিয়ে এসে তা দেখে বড়ো কাগজে হুবহু সেটি আঁকবে। শিক্ষকশিক্ষিকারা সাহায্যে করবেন সে ব্যাপারে। তারপর নিজেরাই তার বিভিন্ন অংশ লিখবে, অংশ বিশেষকে তীর চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত ক'রে। ১, ২, ৩ এইভাবে বিভিন্ন অংশকে চিহ্নিত ক'রে সেইভাবেও বিভিন্ন অংশের নাম লিখতে পারে। তাতে যেমন হাতে কলমে শিক্ষা হবে, তেমনি সেটি চোখের সামনে থাকবার ফলে ভবিষ্যতেও আর ভুল হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কোনো রচনা পড়বার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তির ধারাবাহিক একটা বিবরণ পরপর সাজিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই চার্ট করবে। চার্ট তৈরী করতে গিয়ে তাদের জানতে হবে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি কি কি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ছাত্রদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যই সেই-ভাবে জানা ব'লে চার্ট তৈরীর মধ্যদিয়ে তারা যথাযথভাবে শিক্ষালাভ করবে।

এইভাবে চার্ট, মডেল, সময় পঞ্জী ইত্যাদি তৈরী করার ফলে বিভিন্নদিকে তাদের যে আগ্রহ তৈরী হবে, সেই আগ্রহই তাদের ভবিষ্যতের নূতন কিছু করার দিকে এগিয়ে দেবে ; সামাজিক উন্নতির বীজও সেইখানেই নিহিত রয়েছে।

মডেল চার্ট ইত্যাদি ছাড়াও আর একটি জিনিসের প্রয়োজন আছে তা হলো পোষ্টার। পোষ্টার লেখা একটি শিল্প। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ পোষ্টার লিখে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া যায়। পোষ্টারে যথাসম্ভব সংক্ষেপে অনেক কিছু প্রকাশ করা প্রয়োজন। সুন্দর ক'রে ছবি আঁকতে হয়। কিভাবে কিভাবে রঙ সাজাতে হয় তাও জানতে হয় তাদের। ফলে ছাত্রছাত্রীরা অনাবশ্যক সব কিছুকে ছেঁটে ফেলতে শিক্ষা পায়। সৌন্দর্যবোধ তৈরী হয়। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে পাড়ায় নিজেদের সাংস্কৃতিক সংস্থায় এগুলো ক'রে তারা সমাজকেও সুন্দর ক'রে গড়ে তুলতে পারে। ভবিষ্যতে সামাজিক জীবনে এসবের প্রয়োজন সর্বাধিক।

৩। **আবহাওয়া ইস্তাহার**—কোন স্থানের কোন দিনের বৃষ্টিপাত, বায়ুর তাপ, চাপ, বায়ুর গতি, আর্দ্রতা, শুষ্কতা এসবের মিলিত অবস্থা সে স্থানের সেদিনের **আবহাওয়া** নির্দেশ করে।

**বিভিন্ন ঋতুর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ**—আমাদের দেশে বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতি বিভিন্ন রূপ ধরে। এ পরিবর্তনকে অনায়াসেই তোমরা পর্যবেক্ষণের দ্বারা লিপিবদ্ধ করতে পার। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে প্রতিদিনই আবহাওয়ার কিছু না কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। যে কোনদিন বায়ুর সর্বোচ্চ ও সর্ব নিম্ন উষ্ণতা কত, বায়ুর চাপ কিরূপ, বায়ুর গতি কোন দিকে, বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপ, আকাশের অবস্থা কিরূপ, বৃষ্টিপাত কতখানি—এ সমস্ত সংবাদ জানলে তবেই সেদিনকার আবহাওয়ার কথা জানতে পারবে। আবহাওয়ার বিষয় জানতে হলে থার্মোমিটার, বৃষ্টিমান যন্ত্র, বায়ুপতাকা প্রভৃতির ব্যবহারও শিখতে হবে।

দীর্ঘদিন ধরে আবহাওয়ার বিষয় পর্যবেক্ষণ করলে তবেই আবহাওয়ার পূর্বাভাষ সম্বন্ধে কিছুটা নির্ভুল অনুমান করা যায়। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ অনেক সময় আমাদিগকে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

**থার্মোমিটার**—থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর উষ্ণতার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। **গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ** তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করে সারা-দিনের মধ্যে কখন তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশী হল এবং কখনই বা সবচেয়ে কম হল তা জানা যায়। এভাবে দৈনিক গড় তাপ থেকে সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক গড় তাপ নির্ণয় করা যেতে পারে।

**চাপমান যন্ত্র**—ব্যারোমিটার বা চাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর চাপ নির্ণয় করা যায়।

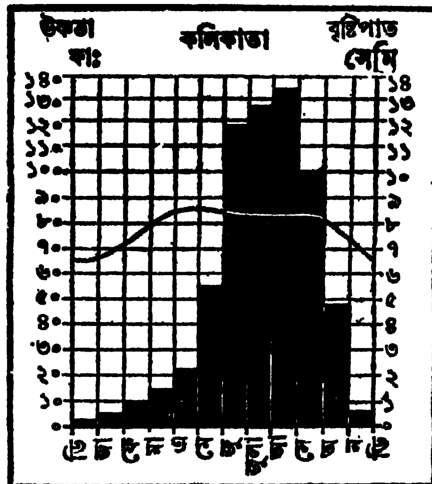
**বৃষ্টিমাপক যন্ত্র**—বৎসরের কোন স্থানে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হল তা মাপবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে বৃষ্টিমাপক যন্ত্র বলে। প্রত্যেক দিন কত সে. মি. বৃষ্টিপাত হচ্ছে তা একটা কাগজে তারিখ দিয়ে লিখে রেখে দিতে হবে। এভাবে একমাস যাবৎ প্রত্যেক দিনের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যোগ করে সেই যোগফলকে মাসের দিন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে দৈনিক গড় বৃষ্টিপাত পাওয়া যাবে। এভাবে মাসিক এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পাওয়া যাবে।

আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের ফল কিভাবে কাগজে লিখতে হয় তার একটা নমুনা দেওয়া হল।

স্থান : কলিকাতা

| স্থান কলিকাতা | জা | ফে | মা | এ | মে | জু | জুলা | আ | সে | অ | ন | ডি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উচ্চতা ফা | ৬৭ | ৭১ | ৮০ | ৮৫ | ৮৬ | ৮৫ | ৮৪ | ৮৩ | ৮৩ | ৮১ | ৭৩ | ৬৭ |
| বৃষ্টিপাত সেমি | ০·৪ | ১·০ | ১·৪ | ২·২ | ৫·৬ | ১১.৯ | ১২·৭ | ১৩·৪ | ১০·০ | ৪·৯ | ০·৬ | ০·২ |

উপরি লিখিত হিসেবের উপর নির্ভর করে ছক কাগজের উপর রেখা দ্বারা তাপের হ্রাসবৃদ্ধি এবং কাল দাগ ( স্তম্ভ ) দ্বারা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিম্নলিখিতভাবে দেখান যায়।




ছক কাগজে কিভাবে লেখচিত্র তৈরা করতে হবে তা জানা দরকার। ছক কাগজে লম্বা এবং আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দাগ কাটা থাকে। আড়াআড়ি দাগের উপর মাসের নাম এবং লম্বালম্বিভাবে যে লাইনগুলো আছে তার দ্বারা তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখাতে হবে। লাইন দিয়ে তাপমাত্রা এবং স্তম্ভ দিয়ে বৃষ্টিপাত দেখাতে হয়।

প্রায় প্রত্যেক বড় বড় শহরে সরকারী ব্যবস্থাপনায় নিকটবর্তী স্থানের প্রত্যেক দিনের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, আকাশের অবস্থা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং হাওয়া অফিস থেকে তা প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে আলিপুর এবং

দমদমে আঞ্চলিক হাওয়া অফিস আছে। এখান থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের প্রত্যেক দিনের আবহাওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া সংবাদপত্র এবং রেডিয়ো মারফত নিয়মিত আবহাওয়ার সংবাদ প্রচারিত হয়। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ঝড়বৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হয়। এর ফলে সতর্ক হওয়ার জন্য অনেক সময় দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি এড়ান সম্ভব হয়।

প্রতিদিনের আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে প্রতিমাসের আবহাওয়ার পরিবর্তনের পার্থক্যটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রখর সূর্যকিরণ, তাপমাত্রা অত্যন্ত গরম এবং বায়ুপ্রবাহের দিক সাধারণতঃ দক্ষিণ। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প—হয়তো কখনও দু'এক পশলা বৃষ্টিপাত হয়। কখনও বা আবার বৈকালের দিকে প্রচণ্ড কালবৈশাখী দেখা দেয়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দেখা দেয় মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ। বায়ুর আর্দ্রতা খুব বেশী, তাপমাত্রা কম, আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয়। অন্যান্য ঋতুতেও এরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করবে।

ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেক দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিম্বা রেডিও মারফত প্রচারিত আবহ—তথ্য লক্ষ্য করে বৃষ্টিপাত ও তাপের মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক গড় নির্ণয় করে ছক-কাগজে লিপিবদ্ধ করবে, এভাবে তাদের স্থানীয় জলবায়ু সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হবে। এভাবে অভ্যাস করলে নিজেদের দেশ, অন্য দেশ বা অন্য মহাদেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হবে।

৪। **সংবাদ সমাচার (News Bulletin) :** পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে অজস্র ঘটনা ঘটে চলেছে। কতো বিচিত্র সে সব ঘটনা। তার কোনোটি হয়তো সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়। কোনোটি আবার কেউ কোনদিন জানতেও পারে না। সমস্ত ব্যাপারটি ভাবলে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়।

ছাত্রছাত্রীদের ওপর আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ, সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আছে। সুতরাং বর্তমান পৃথিবীর এই ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তাদের বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ তারই ওপর নির্ভর ক'রে দেশ সম্পর্কে তারা তাদের ভাবনা-চিন্তা গ'ড়ে তুলবে। তা'ছাড়াও তারা জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চলেছে—কাজেই তাদের পক্ষে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রতি মুহূর্তে

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তার খবর রাখা একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য বিদ্যালয়ে বিশ্ব-সংবাদ পরিবেশনের বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। শুধু তাই নয়, এগুলো যাতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর চোখে পড়ে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। ছাত্রছাত্রীদের এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে কোন্ কোন্ সংবাদ সংগ্রহ করবে। এ ব্যাপারে তারা খানিকটা অসহায় বোধ করবে নিশ্চয়ই। কারণ অজস্র সংবাদের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় সংবাদটি কি হিসেবে তারা বেছে নেবে এটা তাদের কাছে মস্ত বড় সমস্যা নিশ্চয়ই।

এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমে দেখতে হবে কোন্ কোন্ সংবাদ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেগুলোকে প্রথমেই বেছে নিতে হবে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। কাজেই সংবাদপত্র থেকে এই সব খবরও সংগ্রহ করতে হবে। এই ধরণের সংবাদ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত সাময়িকপত্র থেকেও সংগ্রহ করতে হবে। বিজ্ঞানের পরেই রাজনৈতিক সংবাদের গুরুত্ব দিতে হবে। দেশবিদেশের রাজনৈতিক ঘটনা আমাদের রাজনৈতিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। কাজেই রাজনৈতিক সংবাদও সংগ্রহ করতে হবে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে। এরপরেই খেলাধূলা এবং পুরাতত্ব ও ঐতিহাসিক আবিষ্কারের সংবাদ স্থান পাবে সংবাদ-বোর্ডে। খেলাধূলা ছাত্রছাত্রীদের সবচাইতে বেশী আকর্ষণ করে। সুতরাং এই সংবাদ যতোটা সম্ভব দিতে হবে।

শুধু যদি বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়েই সংবাদ থাকে তাহলে ছাত্রছাত্রীদের সংবাদ পড়বার আগ্রহ কমে যাবে। সেজন্যে খেলাধূলার মত আকর্ষণীয় একটি বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন মজার খবরও সংগ্রহ করতে হবে।

একটি বড় বোর্ডে এই সংবাদগুলো সুন্দর করে সাজানোর জায়গা অসম্ভব সতর্ক ভাবে নির্বাচন করতে হবে। বিদ্যালয়ে সব চাইতে খোলামেলা জায়গা যেটি, যেখানে আলোর কোনো অভাব নেই, সেই জায়গাটিকেই বেছে নিতে হবে সংবাদ-গুলো টাঙাবার জায়গা হিসেবে। বিদ্যালয়ে ঢুকতেই যে জায়গা সবার চোখে পড়ে সে রকম জায়গা হলে আরো বেশী ভালো হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রত্যেকদিনই সংবাদ সংগ্রহ করে ঝুলিয়ে দিতে হবে কি না। এ ব্যাপারে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম থাকবে না। তবে সপ্তাহের নির্দিষ্ট ছুটির দিনে পুরোনো সংবাদ সরিয়ে ফেলে নূতন টাঙানো সুবিধাজনক। তাতে পড়া-

শুনার কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকবে না। আরেকটি কাজ করা যেতে পারে। প্রত্যেকদিনই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দু'একটি পুরোনো গুরুত্বহীন সংবাদের জায়গায় টাঙানো যেতে পারে। অথবা যে সংবাদের আর প্রয়োজন নেই সে সংবাদের জায়গায় নূতন সংবাদটি এঁটে রাখা যেতে পারে। তাতে প্রত্যেকদিনই বোর্ডটির আকর্ষণ থাকবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। তা নাহ'লে ছাত্র-ছাত্রীদের সংবাদ সংগ্রহের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে।

এই যে সংবাদগুলো টাঙানো হবে এগুলো যাতে নীচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী থেকে সুরু করে উঁচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী সবাই যাতে পড়তে পারে এবং বুঝতে পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সংবাদে অনেক সময় প্রয়োজনের বাইরেও অনেক কিছু বেশী লেখা থাকে। সেই সংবাদ থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশটুকুকে বাদ দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। সংবাদের সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকলে তাও কেটে আনা উচিত। হাতে লেখা সংবাদ টাঙাবার একটা ভালো দিক আছে, তাহলো, ছাত্রছাত্রীদের হাতের লেখা সুন্দর করবার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। 'আমার হাতের লেখা বোর্ডে থাকবে' —এই আনন্দের জন্যই ছাত্ররা হাতের লেখা সুন্দর করতে চাইবে।

সংবাদ সংগ্রহ এবং টাঙানোর ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্বও অনেকখানি। কোন সংবাদের কতখানি গুরুত্ব, কোন সংবাদকে কোথায় সাজাতে হবে—এসব ব্যাপারে ছাত্রদের প্রতি মুহূর্তে পরামর্শ দেবেন তাঁরা। এইজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সমিতি করবেন। তারা সংবাদ-বোর্ডটির সমস্ত কাজ করবে। তাদের মধ্যেও ভাগ থাকবে। কেউ খেলাধূলা, কেউ সাহিত্য, কেউ ছবি, কেউ রাজনৈতিক সংক্রান্ত সংবাদের জন্য উপ-সমিতিতে থাকবে। তারাই সংবাদ-বোর্ডটির জন্য সমস্ত কাজ করবে।

সবশেষে বলা যায়, সংবাদ সংগ্রহ করে সাজিয়ে দেবার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পায় তার মূল্য কোনো রকমেই অস্বীকার করা যায় না।

৫। **বিদ্যালয় সাফাই (School Cleaning) :** বিদ্যালয়কে শুধু মাত্র শিক্ষাদানের কেন্দ্র মনে করা ঠিক নয়। বিদ্যালয় এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার প্রভাব সমাজে অপরিসীম। কারণ এখানে ভবিষ্যৎ নাগরিক তার রুচি সৌন্দর্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, দেশের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার ক্ষমতা এবং অন্যান্য অজস্র বিষয় পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভ করে। সুতরাং বিদ্যালয়কে আমাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করতে হবে।

সেই কারণেই বিদ্যালয়ের পরিবেশকে রাখতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কারণ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ কখনও সৎ চিন্তা এবং সৎ শিক্ষার অনুকূল হতে পারে না।

কিন্তু কিভাবে এ কাজ হতে পারে? বলা যায়, ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই তাদের



পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখবে। নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নেবার মধ্যে গৌরব আছে। ছাত্রছাত্রীদের এই গৌরব উপলব্ধির সুযোগ পাবে।

শ্রেণীকক্ষ থেকেই শুরু করা যাক। ছাত্রছাত্রীরা কখনও শ্রেণীকক্ষে পেন্‌সিল কাটবে না। কাগজও ছিঁড়ে টুক্‌রো করে ফেলবে না শ্রেণীকক্ষে। তার জন্য প্রয়োজন হলে একটি ময়লা ফেলবার ঝুড়ি রাখবে ক্লাস ঘরের এককোণায়। সেটা প্রতিদিন সকালে এসে বাইরে ফেলে দিয়ে আসবে নিজেরাই।

শ্রেণীকক্ষে থুথু ইত্যাদিও কখনও ফেলবে না। ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজন হলে বাইরে চুনকালি রাখা একটি পাত্রে সেগুলো ফেলবে, যাতে তা বাতাসকে দূষিত করতে না পারে। চেয়ার টেবিল বেঞ্চিতে কখনও তার চক, পেনসিন অথবা কালির দাগ

দেবে না। ক্লাসে এসে একটা ঝাড়নি দিয়ে নিজেরাই সব পরিষ্কার করবে। ক্লাস ঘরকেও অমনিভাবে পরিষ্কার করবে। তবে প্রত্যেকদিন নয়, মাসে অন্ততঃ দুবার ক'রে।

বিদ্যালয় গৃহের দেয়াল পরিষ্কার রাখা ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম কর্তব্য। সেখানে কোন লেখা কেউ লিখলে সে লেখা সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলতে হবে। সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে দেয়ালে লেখা সঙ্গত কাজ নয়। তাতে বিদ্যালয় ভবন অপরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয়ের যে সব জিনিসপত্র, সবই ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব জিনিস বলে মনে করতে হবে। সুতরাং তারা তা নিয়মিত মুছে ধুয়ে পরিষ্কার করবে।

অনেক বিদ্যালয়েই বাগান থাকে। সেই বাগানকে সুন্দর ক'রে তুলবার ভার ছাত্রছাত্রীদেরই। তারা আগাছা পরিষ্কার করবে, জল দেবে, বেড়া থাকলে সেই বেড়ার উপর আগাছা উঠতে দেবে না। তাছাড়া ফুলগাছের শুকনো ডাল পাতা ইত্যাদি খসিয়ে দেবে গাছ থেকে। জমা করে রাখবে এক জায়গায়। তা পচে গিয়ে প্রয়োজনীয় সার হবে। বাগানের কাজে ব্যবহার করা যন্ত্রপাতিগুলোও কাজের শেষে তারা পরিষ্কার করে রাখবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় খেলাধুলার জিনিসপত্রগুলোও তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবে। সেগুলো যথাস্থানে রাখাটাও তাদের কর্তব্য।

শুধু বিদ্যালয়কে পরিচ্ছন্ন রাখলেই চলবে না। বিদ্যালয়ের চারদিকের পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের পাশে যদি অপরিচ্ছন্ন নর্দমা থাকে, আগাছার জঙ্গল থাকে, তবে তা ছাত্রছাত্রীরা পরিষ্কার করবে। শুধু তাই নয় সেখানে যাতে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি না হয়, তারজন্য সেসব জায়গায় ডি-ডি-টি, ফিনাইল প্রভৃতি ছিটিয়ে দিতে হবে।

এইভাবে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারলে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

## ৩। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

আমরা যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করি সে পরিবেশ সম্পর্কে জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের চারপাশে কি কি ফুল ফোটে, কি কি গাছ জন্মায়, কোন কোন পাখী আসে বিভিন্ন ঋতুতে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় কি অবস্থা হয় চতুর্দিকের —সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চয়ই জানবো। শুধু তাই নয় একটি বড়ো খাতায়

সুন্দর ক'রে এর সমস্ত বিষয় লিখতেও হবে। দেখতে হবে তুচ্ছতম কোনো বিষয়ও যেন বাদ পড়ে না যায়। এই খাতাটির নাম দেওয়া হবে 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতা।' ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ ক'রে এই 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতা' রাখবে। প্রত্যেক দিন সকালে বিকালে যখনই সময় পাবে তখনই তারা বেরিয়ে পড়বে খাতা সঙ্গে ক'রে, দেখবে আর লিখবে। খাতা ভ'রে তুলবে প্রকৃতির সংবাদে।

বিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের যিনি শিক্ষক বা শিক্ষিকা, তিনি এই খাতা নিয়মিত দেখবেন। নির্দেশ দেবেন ছাত্রছাত্রীদের। কোথায় কি ভাবে আরো লিখতে হবে, কোন জিনিষটি বাদ প'ড়ে গেছে, সব কিছু দেখিয়ে দেবেন তিনি।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতায় কেবল যা দেখেছি, তাই লিখলেই চলবে না। আরো কিছু কাজ করতে হবে। তাতে যেমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে খাতাটি, তেমনি আরো প্রামাণ্য হয়ে উঠবে।

ধরা যাক শরৎকাল সম্পর্কে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতায় লেখা হচ্ছে। লিখতে হবে শিশির সম্পর্কে সকালের গরম নয় ঠাণ্ডাও নয়—এই আবহাওয়া সম্পর্কে। তাপ কত ডিগ্রি তা লিখতে পারলে আরো ভালো হয়। আকাশের রঙ গাঢ় নীল —এবং আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, তাও লিখতে হবে। লেখার পাশে ছেঁড়া মেঘের ছবি এঁকে দিতে হবে। এমনি প্রাকৃতিক পরিচয় লিখে ফুল পাতার কথা লিখবে। শরতে শিউলি ফোটে—শিউলি ফুলকে সেই পাতায় এঁটে দিতে হবে। সেই সঙ্গে শিউলির পাতাকেও। কিন্তু কিভাবে রাখা হবে শিউলি ফুলকে,তার পাতাকে?

দু'টুকরো ব্লটিং পেপার নিতে হবে। তার মাঝখানে ফুল আর পাতাটিকে খুব সাবধানে রেখে চেপে রাখতে হবে। দু' চারদিন বাদে খুললেই দেখা যাবে শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে সেগুলো। ব্লটিং পেপার তার মধ্যের রসটুকু শুষে নিয়েছে। তখন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতায় সেগুলো লাগালে কোনো অসুবিধের কিছু থাকবে না।

এমনিভাবেই ফুল, পাতা, মরা প্রজাপতি, ফড়িং ইত্যাদি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতায় রাখবে ছাত্রছাত্রীরা—রাখবে পাখীর পালক। চড়ুই, শালিক, পায়রা ইত্যাদি। পাখীর পালক পেতে তো আর অসুবিধে নেই।

সমস্ত ছাত্রছাত্রীর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতা থেকেই তৈরী হতে পারে একটি শহর বা গ্রামের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের চমৎকার একটি বিবরণ। কারণ শহর বা গ্রামের সমস্ত অঞ্চল থেকেই ছাত্রছাত্রীরা আসে। সুতরাং সব অঞ্চলেরই বিবরণ পাওয়া যাবে এই সব প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতায়। ছাত্রছাত্রীদের দ্বারাই শিক্ষক শিক্ষিকারা

একটি বড়ো খাতায় এটি তৈরী করবেন। নতুন কেউ এলে এই খাতাটি থেকেই সে শহর বা গ্রামটি সম্পর্কে খুব সহজেই প্রকৃতি বিষয়ক সব কিছু জানতে পারবে।

## ৭। পাঠচক্র ও বিনোদাগার পরিচালনা

বিত্যালয়ের টিফিনের সময় ছাত্রছাত্রীদের কিছুটা খেলাধুলা, ছুটোছুটির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ সকালে বিদ্যালয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন দিতে হয় লেখাপড়ায়। চার পিরিয়ড় তাতেই তারা ব্যস্ত থাকে। সুতরাং তারপরে খানিকটা খেলাধূলা আনন্দ না হ'লে তারা আর পড়াশুনোয় মন দিতে পারে না। তবে সে খেলা রৌদ্রে পরিশ্রান্ত হয়ে করবে না। তাতে শারীরিক ক্লান্তিতে আর পড়তে ইচ্ছে করবে না।

এইজন্য তাদের থাকবে কমনরুম। সেখানে থাকবে ঘরের ভেতর যে যে খেলা (indoor games) সম্ভব সেগুলো, খেলাধূলার পত্রিকা, ধাঁধার বই ইত্যাদি যাতে কিছুসময়ের জন্য মনটা তাদের অন্যদিকে ফেরে অথচ তারা শ্রান্ত হয়েও না পড়ে।

খেলাগুলোর মধ্যে থাকবে, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, লুডো বাগাডলি ইত্যাদি। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা তাদের বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে খেলা বেছে নেবে। অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্র বা ছাত্রী ক্যারাম খেলবে—দশম শ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রী খেলবে টেনিস।

কমনরুমের জন্য একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন। তিনি টিফিনের সময় হঠাৎ কখনও বসে ছাত্রছাত্রীদের এই খেলাধূলা পর্যবেক্ষণ করবেন। কমনরুমের জন্য অবশ্য ছাত্রছালীদের এই খেলাধূলা পর্যবেক্ষণ করবেন। কমনরুমের জন্য অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে বেছে একটি সমিতি গঠন করবেন তিনি। তারা তাঁকে সাহায্য করবে সবসময়। তাদের কারো ওপর খেলা ঠিকমত চলছে কিনা, তা দেখার ভার থাকবে। কারো ওপর ভার থাকবে পত্রিকা ইত্যাদি ঠিকমতো ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা দেখার, কেউ দেখবে এসব নিয়ে কোথাও গোলমাল হচ্ছে কিনা। তাহলেই সুষ্ঠুভাবে চলবে common room বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে common room এ ধাঁধা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা থাকবে। তার জন্য পুরস্কারও দেওয়া হবে। সমস্ত ব্যাপারটি পরিচালনা করবে কমনরুমের জন্য নির্বাচিত ছাত্র সমিতি।

এইভাবে একটি বিত্যালয়ে চমৎকার একটি কমনরুম তৈরী ক'রে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারবে।

## ৮। বিদ্যালয়ের সারস্বতচক্র

ফলাফলেই বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি। তার কীর্তি, কর্মকাণ্ডের কৃতিত্বে। সেই কর্মযজ্ঞের হোতা ছাত্ররা। তাদের মধ্যে রয়েছে ভাবীকালের স্বপ্ন। তাই ছাত্রদের মধ্যে এত আশা উদ্দীপনা, এত প্রত্যাশা। তাদের মধ্যে সম্ভাবনাময় যে ভবিষ্যৎ রয়েছে, যে প্রবণতাগুলো প্রকাশের পথ খুঁজছে, তাদের জাগ্রত ও পরিচালিত করাই হ'বে বিদ্যালয়ের সারস্বতচক্রের কাজ। সে কাজের অধিকাংশই হ'বে পঠন-বহির্ভূত নানা কাজ যেমন—**নাটকাভিনয়, বিতর্ক সভা, বাগ্মিতার পরীক্ষা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা** এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতা।

প্রবণতা ও সামর্থ অনুসারে প্রতিটি ছাত্র যাতে কোন-না-কোন বিভাগীয় কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তাদের যোগ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন যাতে হয়, সেজন্য মাসে মাসে একটি সাধারণ-ছাত্র-সভা অথবা কোন প্রতিযোগিতার আয়োজন ও ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের কার কোন দিকে ঝোঁক, সেই সেই বিভাগের ছাত্রদের নামের তালিকা ঠিক করে দেবেন বিদ্যালয়ের **কেরিয়ার মাষ্টার।**

এই সব দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়, সেজন্য উৎসাহী শিক্ষকদের নিয়ে একটি সারস্বতচক্র গঠন করতে হবে। এই সমিতি ছটি শাখায় বিভক্ত হবে। তিনজন সভ্য নিয়ে যে উপসমিতি গঠিত হবে, তাদের কাজ হ'বে ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় নাটকাভিনয় ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করা।

এখন এই ছ'টি উপসমিতির করণীয় কাজ কি, সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক :—

১। **নাটকাভিনয় উপসমিতি :** এই সমিতি শিক্ষাবর্ষের তিনটি পর্বে কমপক্ষে তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করেন। অভিনয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ—যেমন সাজ পোষাক উপকরণ তৈরি, রূপসজ্জার ব্যবস্থা করা, মহলা দেওয়া, নিমন্ত্রণলিপি রচনা করা প্রভৃতি কাজ করবেন। ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের উপযোগী কয়েকটি ভালো নাটকের তালিকা এখানে দেওয়া গেল। যথা—রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান', সুনির্মল বসুর—আনন্দনাড়ু।

২। **বিতর্ক-উপসমিতি :** পনের দিন অন্তর বিতর্কসভা পরিচালনা করতে হবে যথাক্রমে প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও শেষ সপ্তাহের শনিবারে। তার আগে

বিতর্কে অংশ গ্রহণেচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের নাম তালিকা আলোচ্য বিষয়ের নাম প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে হ'বে। নমুনা স্বরূপ দু' একটা সম্ভাব্য বিতর্কমূলক বিষয়ের নামোল্লেখ করা গেল। যেমন—(ক) কৃত্যমুখী শিক্ষা বনাম মামুলী শিক্ষা (খ) ছাত্রদের কি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত? (গ) নব প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো না মন্দ? ইত্যাদি।

৩। **বাগ্মিতার পরীক্ষা:** বিতর্ক সভা ছাড়াও প্রতিদিন প্রার্থনা সভার অন্তে, অথবা জন্মতিথি উদযাপনের দিনে পালাক্রমে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে কিছু-না কিছু বলার সুযোগ দিতে হবে।

৪। **আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা:** বয়স অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের দু'টি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। যথা (ক) বালক বিভাগ—শ্রেণী সীমা হবে ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণী (খ) কিশোর বিভাগ—শ্রেণী সীমা—৮ম থেকে ১০ম মান। সরস্বতী পূজা ও নেতাজী দিবসে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার দিন ধার্য করা যেতে পারে। আবৃত্তিযোগ্য কবিতাবলী বাংলাভাষার শিক্ষকমহাশয় নির্বাচন করে দেবেন। এখানে কয়েকটি আবৃত্তিযোগ্য কবিতার নাম বিভাগ অনুসারে উল্লেখ করা গেল। **(ক) বিভাগের জন্য**—রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ', 'পণরক্ষা' নজরুলের 'লিচুচোর', কাঠবিড়ালি ও খুকু, সমব্যথী—রবীন্দ্রনাথ, অরুণ বরুণ কিরণমালা। **(খ) বিভাগের জন্য**—রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন', 'দুঃসময়', 'ঝুলন,' 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ', 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি', সুনির্মল বসুর—'সামিয়ানা', 'সবার আমি ছাত্র', সুকুমার রায়ের 'গোঁফ চুরি', যতীন বাগচীর—'অন্ধবধূ' প্রভৃতি।

৫। **চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা**—বিদ্যালয়ের মুক্তাঙ্গণে এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মডেল থেকে বা মন থেকে আঁকতে দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যালয়ের চিত্রকলার শিক্ষকমহাশয় এই প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক থাকবেন। এই প্রতিযোগিতাও পূর্বের ন্যায় (ক) ও (খ) দলে ভাগ করে নিয়ে পরিচালনা করতে হবে।

৬। **সঙ্গীত প্রতিযোগিতা:** এখানে দল ও গানের বিভাগ করে নিতে হবে। যেমন—রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক ও ক্লাসিক্যাল ইত্যাদি।

## ৯। প্রদীপণ (Model) ও বন্ধুরতার মানচিত্র প্রস্তুতকরণ

এই বিচিত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবরণ জানতে হলে এবং নদ, নদী, পর্বত, সমুদ্র, নগর, জলপ্রপাত প্রভৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে সর্বাঙ্গীণ জ্ঞানলাভ

করতে হলে দেশভ্রমণের প্রয়োজন। দেশভ্রমণ আবার অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়। তাই জনসাধারণের বিশেষতঃ ছাত্রদের সমগ্র পৃথিবীর মোটামুটি সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য নানারূপ চিত্রাঙ্কন, মডেল, মানচিত্র ও গ্লোব প্রভৃতির সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। ছোট দেশ বা প্রদেশ চিত্র দিয়ে দেখান যেতে পারে, কিন্তু একটি মহাদেশ বা মহাসমুদ্রের বিশদ বিবরণ চিত্র দিয়ে বুঝান সম্ভব নয়। তাই দেশের, মহাদেশের এবং পৃথিবীর মানচিত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়েছে।

এতে নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা ভূ-ভাগের বিভিন্ন অংশ, সমুদ্র, পর্বত, নদী প্রভৃতির আকৃতির পার্থক্য, পরস্পর দূরত্ব, আয়তন ও সীমা ঠিক রাখিয়া নক্‌শা আঁকা হয়। বিশেষ বিশেষ পরিমাপের দ্বারা এই চিত্র আঁকা হয় বলে একে **মানচিত্র** বলে।

কোন দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্বকে ছোট আকারে এঁকে দেখানকে স্কেল বলে। স্কেলে প্রতি সেণ্টিমিটারে ২৫,৫০ প্রভৃতি নির্দেশ করা হয়।

মানচিত্রে নানারূপ রঙের সাহায্যে এবং সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে পর্বত, নদী, মরুভূমি, সমভূমি প্রভৃতি দেখান হয়ে থাকে। মানচিত্রে ভূমির ঢাল ও উন্নতি **সমোন্নতি** রেখার দ্বারা নির্দেশ করা হয়। উচ্চতা যেখানে বেশী, সেখানে রেখাগুলি খুব ঘন ; যেখানে নিম্ন, সেখানকার রেখাগুলি দূরে দূরে অবস্থিত। **ক্রমলেখা** দ্বারাও উন্নতি নিরূপণ করা যায়। আবার প্লাষ্টার, মৃত্তিকা, রং প্রভৃতির দ্বারা কোন দেশের **মডেল** তৈরী করে পর্বত, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির আকার দেখান যায়। এরূপ মানচিত্রকে **রিলিফ ম্যাপ** বলে। তবে এতে পর্বতাদির উচ্চতা প্রভৃতি নির্ভুলভাবে দেখান যায় না। সাধারণ জ্ঞান মাত্র হতে পারে। আজকাল নদী, পর্বত, সমুদ্রস্রোত, জলবায়ু প্রভৃতি পৃথক পৃথক মানচিত্রে দেখান হয়। এতে প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। রাজনৈতিক মানচিত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমা নগর, রেলপথ ইত্যাদি দেখান হয়।

### মানচিত্রের সঙ্কেত চিহ্ন :—

গ্রামের নক্সা দেখে যেমন গ্রামের সব কিছুর অবস্থান জানা যায়, সেইরূপ মানচিত্র দেখে দেশের নদ নদী, পাহাড়-পর্বত, হ্রদ, মরুভূমি, রাস্তা, রেলপথ, শহর প্রভৃতির অবস্থান জানা যায়। ভূগোলে জ্ঞানলাভ করতে হলে মানচিত্র আঁকা শিখতে হয়।

রিলিফ ম্যাপ তৈরি করতে হলে বালি, কাদা, কাগজের মণ্ড ইত্যাদি দিয়ে করা যেতে পারে।

**বালি ঃ** রিলিফ ম্যাপ তৈরি করতে প্রাথমিক অবস্থায় বালি দিয়ে শিক্ষা করাই সহজ। বালি ভিজিয়ে নিয়ে কাজ করা যায়। মনে কর, তোমার জেলার কিংবা দেশের নমুনায় একখানা মানচিত্র তৈরি করতে হবে। প্রথমে একটি চওড়া তক্তা বা টিনের পাত নিয়ে তাতে সীমারেখা এঁকে নেবে। তারপর ঐ সীমারেখার মধ্যে পাতলা করে সমানভাবে কিছু বালি ফেলবে। কোন স্থানের কত উচ্চতা তা আগে জেনে রাখবে। সে অনুযায়ী উচ্চতানুসারে সর্বোচ্চ স্থানে বেশী বালি এবং তা থেকে নিম্ন স্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প বালি ফেলবে। উঁচু পাহাড় বা পর্বত থাকলে ওদের চূড়া শুক্‌নো বালি দিয়ে করলে একটু অসুবিধা হয়। এ সমস্ত স্থানে ভিজা বালি দিয়ে তৈরি করাই সুবিধাজনক। প্রথম অবস্থায় উঁচু জায়গা, চূড়া প্রভৃতি করতে কেবল আঙুলই ব্যবহার করবে।

**কাদা :** কিছু এঁটেল মাটি ভালভাবে গুঁড়ো করে তার সঙ্গে কিছু তুঁষ ও পাট ছোট ছোট করে কেটে মিশিয়ে নাও। এরপর জল মিশিয়ে ভাল করে ছেঁকে নাও। অল্প অল্প করে জল দেবে, একেবারে বেশী জল দিলে মাটি নরম হয়ে যেতে পারে। স্থায়ী রিলিফ ম্যাপ তৈরি করতে হলে মাটির সাথে গোবর মিশিয়ে নিলে ফাটবার আশঙ্কা থাকে না।

**কাগজের মণ্ড ঃ** প্রথমে নরম কাগজকে ছোট ছোট করে কেটে দু-তিন দিন জলে ভিজিয়ে রাখ। মাঝে মাঝে ঘেঁটে দাও যাতে টুকরোগুলো পাতে পাতে খসে যায়। তারপর বেশী জলটুকু ফেলে ঢেঁকি অথবা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কাদার মত কর। এইরূপে কাগজের মণ্ড তৈরি হবে। এখন ঐ মণ্ডের সঙ্গে লেই বা গঁদ মিশিয়ে দাও। কাগজের মণ্ড রিলিফ ম্যাপ তৈরির পক্ষে উৎকৃষ্ট উপকরণ।

**মোমমাটি বা প্লাস্‌টিসিন্ :** নিম্নলিখিত প্রণালীতে মোমমাটি তৈরি করে নিতে পারে। (ক) খড়িমাটি ১ কেজি, (খ) মোম ১২৫ গ্রাম, (গ) নারকেল তেল ১২৫ গ্রাম, (ঘ) মেটে সিঁদুর ১০ গ্রাম।

খড়ি মাটিকে ভালভাবে গুঁড়ো করে নেবে। মোম ও নারকেল তেল একটা পাত্রে জাল দেবে। যখন গলে খুব নরম হবে, তখন খড়িমাটি গুঁড়ো ও মেটে সিঁদুর ভাল করে মিশিয়ে নেবে। ঠাণ্ডা হলে ভাল করে পিষবে। যদি মোমমাটি শক্ত বা নরম করার দরকার হয় তবে মোম বা নারকেল তেল কম বা বেশী করে দেবে। মডেলের পক্ষে মোমমাটিই সবচেয়ে ভাল উপাদান।

**নমুনা তৈরির প্রণালী :—**

১। কাঠ বা পেষ্ট বোর্ডে তার সীমা রেখা আঁকবে।

২। সীমারেখার মধ্যে আঙুল দিয়ে কাদা, মণ্ড, বা মোমমাটি সমানভাবে বসাতে হবে।

৩। সীমারেখার বাইরে সমুদ্র থাকলে, তা সর্বাপেক্ষা নিম্ন হবে।

৪। উপত্যকা, মালভূমি ও পর্বত-পথ ইত্যাদি দেখাতে তৈরি বস্তু বেশী পরিমাণ টিপে বসাবে।

৫। পর্বতের উচ্চতানুসারে মাপকাঠি দিয়ে কম বা বেশী করে ঐ বস্তু বসাবে। পর্বত-চূড়া কাঠি দিয়ে ছেঁটে ঠিক করে দেবে। সূক্ষ্ম কাজগুলি কাটি দিয়ে করবে।

৬। নদীর উৎপত্তি স্থল হতে মোহনা পর্যন্ত কাঠির সরু ধার দিয়ে অল্প গর্ত করে দেখাবে। মোহনার দিকে ক্রমশঃ চওড়া হবে।

৭। হ্রদ থাকলে বাঁশের ছুরি দিয়ে কেটে নিচু করে দেবে।

৮। সীমা রেখার মধ্যে বিভিন্ন জায়গার উচ্চতা ঠিক রাখার জন্য ঐ সব জায়গা নির্দেশ স্বরূপ কতকগুলি পিন এঁটে নিতে পার। তারপর ঐ পিন আঁটা জায়গায় উচ্চতানুসারে মণ্ড বা কাদা লাগাবে।

৯। রঙের ব্যবহার মানচিত্র অনুযায়ী কর। কেবল যে সব পর্বত বারমাস তুষারে ঢাকা থাকে তার চূড়ায় সাদা রঙ দেবে। তারপর বার্নিশ করবে।

১০। কাগজের মণ্ড দিয়ে নমুনা তৈরি করলে, ভাল করে শুকিয়ে রঙ দেবে এবং নরম ব্রাস দিয়ে বার্নিস করবে।

## ১০। বিদ্যালয় পত্রিকা

বিদ্যালয় পত্রিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মানসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে। এই পত্রিকার মধ্য দিয়েই বিদ্যালয়ের সারা বছরের উৎসব, অগ্রগতি ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়।

শুধু তাই নয়, ছাত্রছাত্রীদের রচনাশক্তি, কল্পনার প্রসার ইত্যাদিও বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। সেই সঙ্গে তাদের আশা-আকাঙ্খাও রূপ পায় এই পত্রিকার মধ্যে দিয়েই।

সুতরাং বিদ্যালয় পত্রিকাটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা একটি বিরাট কর্তব্য। কিন্তু এই কর্তব্য কারো পক্ষে একা পালন করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীদেরও এই পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে নিশ্চয়ই আহ্বান করতে হবে কারণ সম্পাদনার ব্যাপারে তারা যুক্ত না থাকলে পত্রিকার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

পত্রিকার জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা যিনি থাকবেন ; তিনি বিভিন্ন শ্রেণী থেকে ছাত্রছাত্রীদের মনোনীত করে পত্রিকার কাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত করবেন। আরো একভাবে এই কাজটি করা যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীরাই নির্বাচন করবে তাদের প্রতিনিধি। নির্বাচন করবে ভোটের মাধ্যমে।

তারপর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাদের বিভিন্ন কাজের ভার দেবেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে একজন পত্রিকার ছাত্র/ছাত্রী সম্পাদক হবে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা তাকে মনোনীত করবেন। এ ব্যাপারেও ভোটের মধ্য দিয়ে নির্বাচন হতে পারে।

বিদ্যালয় পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও কতগুলো বিষয় অবশ্যই থাকবে। সে বিষয়গুলো হলো, মহাপুরুষের জীবনী, ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে তাদের নিজেদেরই রচনা, বিজ্ঞান, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশের অগ্রগতি ইত্যাদি।

পত্রিকা প্রকাশের জন্য নানাধরণের কাজ আছে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা সেই কাজগুলোকে সম্পাদক এবং সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন।

পত্রিকার প্রথম কাজ লেখা এবং আঁকা সংগ্রহ। ছাত্র/ছাত্রী সম্পাদক সদস্যদের সহায়তায় লেখা এবং আঁকা ছবি সংগ্রহ করবে বিভিন্ন শ্রেণী থেকে। সেগুলো সে নিজের কাছে রাখবে। তারপর গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আলাদা ক'রে সাজিয়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে পৌঁছে দেবে। তিনি লেখাগুলো মনোনয়ন ক'রে দেবার পর সম্পাদক সদস্যদের সাহায্য নিয়ে প্রেসে পাঠাবার জন্য বড় কাগজে সুন্দর করে লেখাগুলো কপি করে দেবে। ছাত্রছাত্রী সম্পাদক শিক্ষক/শিক্ষিকার সহায়তায় বিদ্যালয়ের সারা বছরের উৎসব, অগ্রগতি ইত্যাদির বিবরণ লিখবে। খেলাধূলা, ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে যারা ভারপ্রাপ্ত তাদের বিবরণ সংগ্রহ ক'রে নেবে সেই সঙ্গে।

প্রথবারের প্রুফ তারাই ভাগ ক'রে দেখে নেবে। ছাপার আগে শেষবারের মতো যে প্রুফ আসবে তা অবশ্য দেখবেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা। ছাপা ভালো কি মন্দ হচ্ছে, কি রকম হলে সাজানো ভালো হয়, সে সম্পর্কেও মতামত দেবে ছাত্রছাত্রীরা।

পত্রিকার মলাট আঁকতে হবে নিজেদেরই। এ বিষয়ে একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যেতে পারে। তারাই এই প্রতিযোগিতার আহ্বান করবে। ছাত্র/ছাত্রী সম্পাদক এবং সদস্যরাই বিচারকের কাজ করবে। সবচেয়ে ভালো ছবিটি দিয়েই হবে পত্রিকার মলাট। সেই-ই হবে বিজয়ীর পুরস্কার।

প্রকাশের পর সব চাইতে বড় কাজ পত্রিকা বিতরণ।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে থাকবে পত্রিকা। তিনি সদস্যদের দিয়ে প্রতিটি শ্রেণীতে প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর জন্য পাঠাবেন। তারা নাম লিখে নিয়ে পত্রিকা দেবে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পত্রিকা দেওয়া হয়ে গেলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং কিছু খ্যাতিমান সাহিত্যিক, শিল্পী এবং শিক্ষাবিদকে পত্রিকা দিয়ে আসবে ছাত্র-ছাত্রীরা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার দপ্তরেও পত্রিকা পাঠাতে হবে। কারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লেখা, ছবি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁরা তাঁদের অমূল্য মত দেবেন। সে মতা-মতগুলো ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য সাধনায় উদ্বুদ্ধ করবে নিশ্চয়ই।

সবশেষে বলা যায়, বিদ্যালয় পত্রিকা বিদ্যালয়ের অপরিহার্য একটি বিষয়।

## ১১। শ্রেণী পাঠাগার

পাঠাগার বিদ্যালয়ের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান পিপাসা মেটাবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাগার তাদের আনন্দের আশ্রয় হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে তারা পরিচিত হয়ে ওঠে পৃথিবীর সঙ্গে। সুতরাং বিদ্যালয়ের পাঠাগার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে স্বর্গের সঙ্গে তুলনীয়।

বিদ্যালয়ে একটি সাধারণ পাঠাগার এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে একটি ক'রে ছোট পাঠাগার তৈরী করা প্রয়োজন। প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের চেষ্টায় এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের চেষ্টায় এই পাঠাগার গ'ড়ে তুলবে। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই এই পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে তাদের কাজ করতে হবে শ্রেণী শিক্ষক-শিক্ষিকার ( Class teacher ) নির্দেশে।

প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্য থেকেই কয়েকজন নির্বাচন করবে পাঠাগার পরিচালনার জন্য। ভোটের মধ্য দিয়েই এই নির্বাচন হতে পারে। অথবা ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকেই যাতে পরিচালনার ব্যাপারে সুযোগ পায়, তার জন্য সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে কয়েকটি দলে ভাগ ক'রে একেক মাস একেক দলের ওপর পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। একেবারে নীচু শ্রেণীতে অবশ্য শিক্ষক শিক্ষিকারাই এই ভার নেবেন।

শ্রেণীকক্ষে একটি আলমারী থাকবে। বইগুলো থাকবে তার মধ্যে। বই নির্বাচন করা হবে শ্রেণী অনুসারে। অর্থাৎ যে শ্রেণী, সেই অনুযায়ী বই কেনা হবে।

সাধারণ পাঠাগার থেকে এ পাঠাগার কিছুটা অন্যরকম হবে—এখানে পাঠ্য বই এবং সে সম্পর্কে অন্যান্য বই বেশী থাকবে। যাতে পাঠ্যবিষয় ছাত্রছাত্রীরা আরো ভালো ক'রে জানতে ও বুঝতে পারে। সমস্ত বই এর তালিকা সহ একটি খাতা

থাকবে সেখানে। ছাত্রছাত্রীরাই লিখবে সেটি। আরও একটি খাতা থাকবে, যেখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর নাম থাকবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পাশে লেখা হবে কি সে নিয়েছে, কার কাছ থেকে নিয়েছে, কবে ফেরৎ দেবে। ফেরৎ দেবার সময়, তারিখ লিখে দেবে সে। সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন এই বই দেওয়া নেওয়া চলতে পারে। সাতদিনের বেশী কেউ বই রাখতে পারবে না। বই দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে কোন অসুবিধে বোধ করলে সোজা চলে যাবে সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থগারিকের কাছে। না হলে শ্রেণী শিক্ষক/শিক্ষিকারও সাহায্য নিতে পারে।

কোনো শিক্ষক/শিক্ষিকার অনুপস্থিতিতে বা অন্য কারণে কোনো ঘণ্টা ( Period ) ফাঁকা গেলে ছাত্ররা লাইব্রেরী থেকে সবাইকে বই দেবে। ফলে ঘন্টাটি তারা পড়াশুনোর মধ্য দিয়েই কাটাতে পারবে।

শ্রেণী কক্ষের পাঠাগার ছাত্রছাত্রীদের পরিচালনায় নিজেদের পাঠাগার। সুতরাং এর মধ্য দিয়ে তাদের দায়িত্ববোধ যেমন জেগে উঠবে, তেমনি বই সম্পর্কে মমতাও তৈরি হবে।

যে শ্রেণী কক্ষের পাঠাগার যতো সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হবে, সে শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর পক্ষে তা ততো গৌরবের।

## ১২। বিদ্যায়তনের সংগ্রহশালা

যা কিছু পুরানো, যা কিছু দুর্লভ, সব কিছুরই বিশেষ একটা মূল্য আছে। তা দেখবার জন্য আগ্রহ থাকে আমাদের। দেখবার জন্য ঘুরেও বেড়াই আমরা। আর তারই জন্য গড়ে ওঠে মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা।

মিউজিয়ম আমরা সবাই প্রায় দেখেছি। কলকাতার ভারতীয় যাদুঘর থেকে সুরু করে ব্যক্তিগত মিউজিয়মে—সবখানেই বিভিন্ন ধরণের জিনিষের সংগ্রহ আছে। কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে মিশরের ম্যামি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তুর কঙ্কাল, নানা দুর্লভ ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু থেকে সুরু করে প্রাচীনকালের লোকদের পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত পাবে। এসব দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই।

বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা ছোট্ট একটি মিউজিয়ম গড়ে তুলতে পারে। যা কিছু পাওয়া যাবে, তাই সেখানে সাজিয়ে রাখবে তারা, রক্ষণাবেক্ষণ করবে যত্নের সঙ্গে।

বিদ্যালয় মিউজিয়মে যদি অতি প্রাচীন বা দুর্লভ কিছু জিনিষ রাখা যায় তবে গৌরব বৃদ্ধি হবে মিউজিয়মটির। ছাত্রছাত্রীরা সে বিষয়ে চেষ্টা করবে। তাছাড়াও

নিজেদের বাড়ী থেকেও প্রাচীনকালের বিভিন্ন জিনিষ সংগ্রহ করবে। এই সংগ্র[illegible] থাকবে বিভিন্ন ধরণের পাথর, স্টাফ করা কীটপতঙ্গ, গাছপালার নমুনা, পাখী[illegible] পালক, ডাকটিকিট, বিভিন্ন দেশের পয়সা, বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি, পুতুল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিখ্যাত উৎপাদন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পোষাক-পরিচ্ছদ, যদি সম্ভব হয় পুতুল তৈরী করে পোষাক পরিয়ে দেওয়া, বিভিন্ন দেশের ঘরবাড়ীর মডেল ইত্যাদি।

মিউজিয়মটি একটি সুন্দর এবং সুরক্ষিত ঘরে করতে হবে। আলো বা তা[illegible] যেন সে ঘরে প্রচুর লাগে। ঘরের মধ্যে জিনিষগুলো রাখবার জন্য কিছু কাঁচের আসবাবপত্র চাই। তার মধ্যে থাকলে সহজে যেমন দেখা যাবে, তেমনি যত্নে থাকবে জিনিষগুলো। সংগৃহীত জিনিষগুলোকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী ভা[illegible] করতে হবে। অর্থাৎ যেখানে পাথর থাকবে, সেখানে কেবল পাথরই থাকবে— আলমারীর যে তাকটি পাখীর পালকের জন্য নির্দিষ্ট তাতে কেবল পাখীর পালক[illegible] থাকবে।

এর জন্যেও শিক্ষিক/শিক্ষিকারা ছাত্র ও ছাত্রীদের নিয়ে একটি সমিতি তৈরি করবেন। তাদের আবার ভাগ করবেন কয়েকটি দলে। বিভিন্ন দলের উপর দায়িত্ব থাকবে বিভিন্ন ধরণের জিনিষপত্র সংগ্রহ করবার। শিক্ষক/শিক্ষিকার[illegible] বিভিন্ন জিনিষের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেবেন ছাত্রছাত্রীদের। কি ক'রে সেগুলে[illegible] রক্ষা করতে হবে, তাও বুঝিয়ে দেবেন। সম্ভব হ'লে ছাত্রছাত্রীদের যাদুঘর দেখিয়ে আনবেন। এর ফলে তারা বুঝতে পারবে যাদুঘরের গুরুত্ব কতখানি।

মাঝে মাঝে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছোট ছোট দলে ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে পড়বে বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াতে এবং সেখান থেকে সংগ্রহ করবে আকর্ষণীয় দ্রব্য। বছরে একবার অন্ততঃ সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাদুঘর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। শহরের বা গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে হবে প্রদর্শনী দেখবার জন্য। তাতে তারা যেমন সে সব দেখে খুশী হবে, ছাত্রছাত্রীরাও উৎসাহিত হবে তেমনি। সেই প্রদর্শনীর শেষে একটি অনুষ্ঠান ক'রে ছাত্রছাত্রীরা মিউজিয়ম সম্পর্কে আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি করবে।

এইভাবেই ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে, পরিশ্রমে একটি সুন্দর মিউজিয়ম গড়ে উঠবে বিদ্যালয়ে।

---